ভগবান কাঁদছে

বিমল মিত্র

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ, ১৩৬৫
আগস্ট, ১৯৫৮

প্রতিষ্ঠাতা ঃ
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটিকুমার পাল

প্রকাশিকা ঃ
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতলে)
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রণে ঃ
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং হাউস
৬১/১/১ বি, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট
কলিকাতা-৪

ব্লক ঃ
বি, ডি, কনসার্ন

প্রচ্ছদ ঃ
অমিয় ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ মুদ্রণে ঃ
নিউ গয়া আর্ট প্রেস

ভগবান বলে কি কেউ আছে? যদি থাকে তো সে-ভগবান কি কাঁদে? আর ভগবান যদি সত্যিই কাঁদে তো সে-কান্না কি পৃথিবীর মানুষ শুনতে পায়? মানুষ যদি শুনতে পায়, তাহলে জহরলাল নেহরুই বা তা শুনতে পান না কেন? বল্লভভাই প্যাটেল শুনতে পান না কেন? কেন আবুল কালাম আজাদ শুনতে পান না? কেন বিধান রায়, অতুল্য ঘোষ শুনতে পান না? ইন্দিরা গান্ধীই বা শুনতে পান না কেন?

অথচ একলা দেবব্রত সরকার কেন শুনতে পায়? দেবব্রত সরকারের কাহিনীটা শুনতে-শুনতে বার-বার আমার মনে এই প্রশ্নটাই উদয় হচ্ছিল। সত্যিই তো দেবব্রত সরকার কী এমন লোক যে সে একলাই ভগবানের কান্না শুনতে পায়!

সব নদীই গঙ্গা নয়, সব পাহাড়ই হিমালয় নয়, সব মৃগই কস্তুরী মৃগ নয়, সব মানুষই দেবব্রত নয়।

দেবব্রত যদি অন্য মানুষের মতো হতো তাহলে তাকে নিয়ে গল্প লেখা সহজ হতো। অন্য মানুষের মতো দেবব্রতর দুটো পা, দুটো হাত ছিল। অন্য মানুষের মতো তারও একটা মাথা ছিল, একটা নাক ছিল, একটা কপাল ছিল। মানুষের যা-যা থাকলে লোকে একজনকে মানুষ বলে, তার সব-কিছুই ছিল।

তবু দেবব্রত সরকার ছিল এক অনন্য মানুষ।

অনন্য মানুষ বলে দেবব্রত সরকারকে নিয়ে গল্প লেখা বড় শক্ত। বিধাতা-পুরুষ তাকে সৃষ্টি করবার সময়ে বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। বিধাতা-পুরুষের ভাঁড়ারে, যা-যা মাল-মশলা ছিল সমস্ত কিছুই দেবব্রত সরকারের মধ্যে পুরে দিয়েছিলেন, কিন্তু অন্যমনস্ক

হওয়ার ফলেই হয়তো দেবব্রত যখন পৃথিবীতে এলো, তখন সে অনন্যসাধারণ হয়ে উঠলো।

একদিন এই দেবব্রত সরকার রাস্তা দিয়ে হেঁটে-হেঁটে চলেছে। তখন তার বয়েস কম। রাস্তা দিয়ে চলতে-চলতে তার নজরে পড়লো সবাই তার দিকে চেয়ে দেখছে।

সে কিছু বুঝতে পারল না। তার দিকে এত চেয়ে দেখবার কী আছে? এই রাস্তা দিয়ে তো সে রোজই যায়। কিন্তু এমন করে তো কেউ এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তার দিকে চেয়ে দেখে না।

চিরকাল সে যে-শার্ট পরে তাই-ই তো সে পরেছে। যে-ধুতি সে বরাবর পরে সেই ধুতিই তো পরেছে। তাহলে?

সে ভাবল যাক্ গে, মরুক গে! লোকে তাকে দেখলে তো বয়ে গেল। সে যদি কোনও অন্যায় করত তো তবু একটা কথা ছিল। কিন্তু সে তো জীবনে কোন অন্যায় করেনি। সিগ্রেট, বিড়ি, পান তো সে জীবনে কখনও খায়নি। মাথার চুলে কখনও তো চিরুনিও ছোঁয়ায়নি। তাহলে তার কিসের সঙ্কোচ?

কিন্তু না, তাকে দেখবার একটা অন্য কারণও ছিল।

সেটা ধরা পড়লো অনেক পরে। একটা বিশেষ কাজে তখন সে একজন বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছিল। বন্ধুর কাছে একটা বই ছিল। সে বলেছিল, তার বাড়িতে গেলে সে তাকে তা পড়তে দেবে। বইটা অশ্বিনীকুমার দত্তের লেখা 'ভক্তিযোগ'।

তখন এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় যাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল হাঁটা। এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় যেতে হাঁটা ছাড়া অন্য কোনও উপায় কেউ জানতও না। উপায় জানবার দরকারও হতো না কারো। বন্ধু তার সঙ্গে একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়তো। কথায়-কথায় একদিন বলেছিল যে, তার বাড়িতে তার বাবার একটা বই আছে। বইটার নাম 'ভক্তিযোগ'।

দেবব্রত বলেছিল, আমাকে একবার বইটা দিতে পারিস তুই?

বন্ধু বলেছিল, না ভাই, বাবা কাউকে বাড়ি থেকে বাইরে বই নিয়ে যেতে দেয় না। যদি কারো বই পড়তে ইচ্ছে করে তো আমাদের

বাড়িতে বসে বই পড়তে পারে, তাতে বাবার কোনও আপত্তি নেই।

তা সেই বই পড়বার জন্যেই দেবব্রত বঙ্কুদের বাড়িতে যাচ্ছিল। গ্রীষ্মকাল। চারদিকে টা-টা করছে রোদ্দুর। রাস্তা গরম হয়ে গিয়েছে। স্কুলেরও তখন গরমের ছুটি। দেবব্রত যখন বঙ্কুদের বাড়ি পৌঁছোল তখন দুপুর দুটো। সদর দরজার কড়া নাড়তেই বঙ্কু ভেতর থেকে দরজা খুলেই দেখে দেবব্রত।

—তুই? কী ব্যাপার রে?

দেবব্রত বললে, তুই যে সেই বইটা পড়তে দিবি বলেছিলি?

তখন বঙ্কুর মনে পড়লো কথাটা। বললে, আয়, ভেতরে আয়। কতোদিন আগে আমি বলেছিলুম, সে কথা এখনও তোর মনে আছে? আশ্চর্য ছেলে তো তুই—

সত্যিই আশ্চর্য হওয়ার মতো মানুষই ছিল বটে দেবব্রত। বঙ্কু বাবার বই-এর ভেতর থেকে অনেক কষ্টে খুঁজে বার করলে বইটা। তারপর সেটা দেবুকে দিলে। দেবব্রত সেটা নিয়ে পাশের একটা কাঠের বেঞ্চিতে বসে-বসে পাতা উল্টে-উল্টে দেখতে লাগলো। আর তারপর এক মনে ডুবে গেল বইটার ভেতরে।

বঙ্কু বললে, কী রে দেখতে পাচ্ছিস?

দেবব্রত কোনও উত্তর দিলে না। বঙ্কু আবার জিজ্ঞেস করলে, অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছিস? জানালাটা খুলে দেব?

তবু দেবুর তরফ থেকে কোনও উত্তর নেই।

বঙ্কু আবার বললে, কী রে, অতো কী পড়ছিস?

বলে দেবুর গায়ে ঠেলা মারতেই যেন প্রথম দেবুর হুঁশ হলো। বললে, কী?

বঙ্কু বললে, তুই এই অন্ধকারে পড়তে পারছিস? না, জানালাটা খুলে দেব?

দেবব্রত আবার বইটার মধ্যে চোখ রেখে বললে, দাঁড়া, দেখি কী লেখা আছে পাতাটাতে—

হঠাৎ বঙ্কু হৈ-হৈ করে হেসে উঠলো। হাসতে-হাসতে একেবারে গড়িয়ে পড়বার উপক্রম। তবু দেবব্রতর কোনও দিকে খেয়াল নেই।

একেবারে বইটা নিয়ে ধ্যানস্থ।

—এ কী করেছিস রে? এই দেবু, এ কী করেছিস?

এতক্ষণে যেন দেবুর ধ্যান ভাঙলো। বই-এর পাতা থেকে মুখ তুললো। বললে, কী? কী করেছি?

—এ কী জুতো পরে এসেছিস রে তুই? এ কী?

বন্ধু দেবব্রতর পায়ের ছ'পাটি জুতোর দিকে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে বললে, তোর জুতো জোড়ার দিকে চেয়ে দেখ—

দেবু এতক্ষণে তার পরে আসা জুতো জোড়ার দিকে নজর দিয়ে দেখলে। সত্যিই বাঁ পায়ের জুতোটা কালো রঙের আর ডান পায়ের জুতোটার রং সাদা। বন্ধু তখনও হো-হো করে হাসছে।

বললে, সত্যিই, তোর মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছে। তুই ডাক্তার দেখা। এ-রকম করে রাস্তা দিয়ে চললে কোনদিন যে তুই গাড়ি চাপা পড়বি রে। ছ'পায়ে ছ'রঙের জুতো পরবার সময়ে একবার তোর খেয়ালও হলো না যে কী পরছিস?

দেবু বললে, আমি তখন তোর বাড়িতে আসবার জন্যে এমন হাঁক-পাঁক করছি যে জুতোর দিকে অতো খেয়াল হয়নি, যাক্ গে, ওতে কী এমন এসে যায়! জুতো দিয়ে তো কেউ মানুষের বিচার করে না।

বন্ধু বললে, না, তুই দেখছি সত্যিই একটা পাগল! তোকে রাঁচির পাগলা-গারদে ভর্তি করে দেওয়া উচিত।

এ-কথায় কান না দিয়ে দেবব্রত যেমন বইটি পড়ছিল তেমনি আবার পড়ে যেতে লাগলো।

না, লিখতে-লিখতে আবার ভাবলাম এখান থেকে গল্পটা আরম্ভ করলে তো ঠিক জমবে না। দেবব্রত সরকার কোন রঙের জুতো কোন পায়ে

পরলো, তাতে পাঠকদের তো কিছু লাভ-লোকসানের হের-ফের হবে না। তাহলে অন্য জায়গা থেকে গল্পটা আরম্ভ করি।

এ-গল্প অন্য আরো অনেক চরিত্রদের আরো অনেক ঘটনা নিয়ে আরম্ভ করা যায়। শুধু দেবব্রত সরকার কেন, মিনতি দেবীকে নিয়েও তো গল্প আরম্ভ করা যায়। সাহাবুদ্দীনকে নিয়েও গল্প আরম্ভ করা যায়।

দেবব্রত সরকার তো সাধারণ একজন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। কিন্তু কেন যে তার মধ্যে এই বই পড়ার নেশা জন্ম নিয়েছিল, তা বাইরের কেউই জানতো না।

সেই তাকে নিয়ে গল্প আরম্ভ করলে তাই কেউ কোনও আকর্ষণই বোধ করবে না। তাহলে কী করি? মিনতি দেবীকে নিয়ে গল্প আরম্ভ করবো? কিংবা সাহাবুদ্দীনকে নিয়ে?

সত্যিই গল্প আরম্ভ করাটাই আজকাল বড়ো মুশকিলের কাজ হয়েছে! কারণ আমি এমন এক যুগে লেখক হয়েছি, যে-যুগে কোনও পাঠকেরই সময় নেই। তারা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজে-অকাজে ব্যস্ত। ভোরবেলা এমন একজন লোক চাই যে হরিণঘাটার দুধের 'বুথে' গিয়ে লাইন দেবে। আর আজকাল তো তেমন লোক পাওয়াই শক্ত। তারপরে বাজারে যেতে হবে দৈনন্দিন খাদ্য-সামগ্রী কেনা-কাটা করবার জন্যে। তার ওপর সপ্তাহে একদিন চাল-ডাল-তেল-চিনি কিনতে সরকারী রেশনের দোকানে যাওয়ার কাজ আছে। তারপরে আছে বাড়ির বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসার, আর যথা সময়ে তাদের নিয়ে আসার কাজ। যাদের টাকা-পয়সা আছে, তারা বাড়ির ছেলে-মেয়েদের আবার পাড়ার স্কুলে পড়াতে চান না। কেন না তাতে লোকে মনে করতে পারে যে তুমি গরীব লোক। কেউ চান না যে তিনি প্রতিবেশীদের চোখে গরীব বলে চিহ্নিত হোন্। ব্যাঙ্কে তোমার টাকা থাক আর না থাক, বাইরে তোমাকে অর্থবানের ভান করতেই হবে। এটা ইজ্জতের প্রশ্ন। আর আজকাল টাকাই ইজ্জত।

কথাটা যে হঠাৎ আমার মনে হলো তারও একটা কারণ আছে। সেই কারণটাই বলি।

হঠাৎ সেবার খবরের কাগজের পাতায় 'রিপাবলিক-ডে'তে প্রতি

বারের মতো উপাধি বিতরণের তালিকা ছাপা হলো। প্রথম-প্রথম সে তালিকা নিয়ে লোকে একটু আলোচনা করতো বটে, কিন্তু পরে আর তেমন তা আলোচিত হতো না। আর তখনই ওই উপাধিগুলো পাওয়ার জন্য লাখ-লাখ টাকাও খরচ করতে হতো না। বলতে গেলে ওটা তখন সম্মানের স্বীকৃতি হিসেবেই গণ্য হতো।

সেই সময়ে 'পদ্মশ্রী' প্রাপকদের তালিকায় হঠাৎ একজন মহিলার নাম উঠলো। মহিলাটির নাম ঝর্ণা দেবী।

রাস্তায় আমার বন্ধু সুপ্রভাতের সঙ্গে দেখা হওয়াতে সে বললে, দেখেছ, ঝর্ণা দেবী 'পদ্মশ্রী' উপাধি পেয়ে গেলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, দেখেছি, কিন্তু কে এই ঝর্ণা দেবী ?

বন্ধু বললে, সে কী, তুমি ঝর্ণা দেবীর নামও শোননি ?

স্বীকার করতেই হলো, না, শুনিনি—

জীবনে এত বড়-বড় বিখ্যাত লোকের নাম মনে রাখতে হয় যে, কোথায় কে কোন ব্যাপারে 'পদ্মশ্রী' উপাধি পেলো, তার নাম মনে রাখতে গেলে পাগল হয়ে যাবার উপক্রম হওয়াই স্বাভাবিক হবে।

সুপ্রভাত বললে, জানো ওই 'পদ্মশ্রী' পাওয়া উপলক্ষে ঝর্ণা দেবীকে আমরা সম্বর্ধনা জানাচ্ছি—

—কবে ?

সুপ্রভাত বললে, আসছে রবিবার। তুমি যাবে ঝর্ণা দেবীর নাচ দেখতে ?

বললাম, নাচের আমি কী-ই বা বুঝি। তবু যদি দেখার সুযোগ করে দাও তো যাবো।

—ঠিক আছে।

বলে সুপ্রভাত চলে গেল। আর ঠিক তার দু'দিন পরেই ডাকযোগে আমার নামে বাড়িতে একটা নিমন্ত্রণ-পত্র এসে হাজির হলো।

নাচের কিছু বুঝি না আমি। বলতে গেলে এক সাহিত্য ছাড়া আমি আর কিছুই তো বুঝি না। কোনও সাহিত্যের বই পড়লে সহজে বলে দিতে পারি বইটা ভালো না মন্দ। আর আজকাল তো সাহিত্য পড়া উঠেই গেছে। গল্প-উপন্যাসকেই তো আজকাল লোকে সাহিত্য

বলে মনে করে। আর ছাপানো বইকেই তো লোকে বাইবেল-গীতা-কোরান বলে ধরে নেয়। এখন তো রাজনীতি, খেলাধূলো আর ফুটবল-ক্রিকেট নিয়েই লোকে উন্মত্ত হয়ে থাকে। আমি ও তিনটেই বুঝি না এবং বোঝবার যোগ্য জিনিস বলেই মনে করি না।

আর নাচ?

ওটা যে একটা আর্ট তাও আমাকে বুঝিয়ে না দিলে আমি বুঝতে চেষ্টাও করিনি কখনও। যা হোক, ওই ঝর্ণা দেবী 'পদ্মশ্রী' উপাধি না পেলে আর তাকে সম্বর্ধনা দেওয়া না হলে, আমি ওর নাচ দেখতেও যেতাম না। আর ওই নাচ দেখতে না গেলে আমি এই গল্পও পেতাম না। আর ওই ঝর্ণা দেবীকে নিয়ে এই গল্পও লিখতে চেষ্টা করতাম না। আর কতকাল আগেকার সেই দেবব্রত সরকারকেও জানতে পারতাম না। জানতে পারতাম না আদর্শ পুরুষ কাকে বলে।

দেবব্রত সরকার 'পদ্মশ্রী', 'পদ্মভূষণ' প্রভৃতি উপাধি জীবনে কখনও পাননি। পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও কখনও করেননি। বলতে গেলে তাঁর অতুল ধন-সম্পত্তি বলতেও কিছু ছিল না। তাঁর নিজের বলতে যা ছিল তা হলো তাঁর চরিত্র। নিষ্কাম, নিরহঙ্কার, নির্লোভ এবং নির্ভীক চরিত্রের মানুষ বললেও তাঁর সম্বন্ধে যেন কম বলা হয়।

পৃথিবীতে সে এক অদ্ভুত যুগ তখন চলছে।

পাড়ায়-পাড়ায় ক্লাব বা সঙ্ঘ যেমন আজকাল দেশে গজিয়ে উঠেছে, তখনও তেমনি। তবে এখনকার পাড়ার ক্লাবগুলোতে যে-ধরনের কাজ-কর্ম চলে, তখন তা চলতো না। এখন লাউড্-স্পীকার বলতে যা বোঝায়, তখন তা আবিষ্কারও হয়নি। তাই ক্লাবের কাজ কর্মের রীতি-পদ্ধতির খবর বাইরের পাড়ার কোনও লোক জানতে পারতো না। তারা সবই ছিল নীরব কর্মী। নিঃশব্দে কাজকর্ম করাটাই ছিল তখনকার ছেলেদের ব্রত।

এই দেশটাও তখন ইংরেজরা ভাগ করে দিয়ে যায়নি। তাই তখন আমাদের দেশ বলতে বোঝাতো সমস্ত ইণ্ডিয়াটা। 'বঙ্গ আমার জননী আমার' বললে বোঝাতো পূর্ববঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত এলাকাটা।

সেই ছেলেবেলাতেই কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব মিলে দেবব্রতরা ঠিক

করলে যে, দেশটাকে ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীন করতে হলে মানুষকে আদর্শ-চরিত্র হতে হবে। অর্থাৎ এককথায় মানুষকে মানুষ হতে হবে। মানুষকে মানুষ হতে গেলে কী করতে হবে?

তাকে সৎ হতে হবে, তাকে মিতাহারী, মিতাচারী হতে হবে, মদ ও স্ত্রী-সংসর্গ পরিত্যাগ করতে হবে। আর তাকে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে।

দেবব্রতদের ক্লাবের নাম ছিল 'চরিত্র-গঠন শিবির'। এই চরিত্র-গঠন শিবিরের যিনি প্রধান তাঁর নাম ছিল সুলতান আহ্‌মেদ সাহেব।

সুলতান আহ্‌মেদ সাহেব বিড়ি, সিগারেট, মদ তো দূরের কথা পান পর্যন্ত খেতেন না। তাঁর নিজের সংসার বলতে ছিল শুধু এক মা। ছোটবেলাতেই তাঁর বাবা মারা গিয়েছিলেন। তখন থেকে ওই সুলতান আহ্‌মেদ সাহেবকে একজন হিন্দু জমিদার নিজের টাকায় লেখাপড়ার সুযোগ করে দেন। তারপর সেখানকার কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে সেই জমিদারবাবুর মায়ের নামে প্রতিষ্ঠা করা স্কুলেই মাস্টারির চাকরি পান। আর পাড়ার যতো হিন্দু-মুসলমান ছেলেদের নিয়ে ওই গ্রামেই 'চরিত্র-গঠন শিবির'-এর পত্তন করেন।

সেই শিবিরেই নাম লিখিয়েছিলেন দেবব্রত।

সুলতান আহ্‌মেদ সাহেব বলেছিলেন, তুমি যে এই শিবিরে ভর্তি হতে চাইছো, তাতে তোমার বাবার অনুমতি নিয়েছ তো?

দেবব্রত বলেছিল, হ্যাঁ স্যার

আহ্‌মেদ সাহেব জিজ্ঞেস করেছিলেন, এখানকার শিবিরের অনেক নিয়ম-কানুন আছে, তুমি তা ঠিক মতো পালন করতে পারবে তো?

দেবব্রত বলেছিল, হ্যাঁ স্যার। আপনি যা করতে বলবেন সব করবো।

সত্যিই সুলতান আহ্‌মেদ সাহেবের 'চরিত্র-গঠন শিবিরে'র নিয়ম-কানুনের বড় কড়াকড়ি ছিল। স্কুলের ছুটির পর বিকেল চারটে থেকে সমস্ত ছেলেদের লাইন বেঁধে দাঁড় করিয়ে ড্রিল করাতেন স্যার। কখনও স্ট্যাণ্ড্ ঈজ্, কখনও মার্চ, কখনও কুইক মার্চ, কখনও হল্ট্ আবার কখনও রাইট-টার্ন বা লেফ্‌ট্-টার্ন…

শুধু তাই-ই নয়। তার সঙ্গে প্রতিদিন কী-কী কাজ করলাম তারও উল্লেখ করে ডায়েরী লিখতে হবে। রোজকার করণীয় কাজের হিসেব-নিকেশ।

ডায়েরীর মাথায় প্রত্যেক দিনের তারিখ। তার নিচেয় লেখা -- (১) আজ ক'টা সত্য কথা বলেছি। (২) আজ ক'টা মিথ্যে কথা বলেছি। (৩) আজ স্কুলের পাঠ্যগ্রন্থের বাইরে অন্য কী-কী বই পড়েছি। (৪) আজ সকালবেলা কখন ঘুম থেকে উঠেছি। (৫) রাত্রে কখন বিছানায় ঘুমোতে গিয়েছি। (৬) আজ বাড়িতে বা বাড়ির বাইরে কার সঙ্গে কি'রকম ব্যবহার করেছি। (৭) আজ স্কুলে মাস্টারমশাইয়ের প্রশ্নের কি'রকম উত্তর দিয়েছি—

শিবিরের মেম্বার ছিল সব মিলিয়ে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জন। এই চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জন মেম্বারকে নিজের-নিজের ডায়েরী স্যারকে দিতে হতো। তিনি সেইদিনই সেগুলো দেখে নিচে নিজের সই দিয়ে প্রত্যেকের ডায়েরী ফেরত দিতেন।

সুলতান আহ্‌মেদ সাহেব বলতেন, তোমাদের সকলেরই চরিত্রের উন্নতি হচ্ছে, এটা লক্ষ্য করে আমি খুশী হয়েছি। আমি এই চরিত্র গঠনের ওপর এত গুরুত্ব দিচ্ছি কেন বলো তো?

উত্তরে একজন ছেলে বলেছিল, চরিত্র গঠন না হলে কোনও মানুষ, মানুষ হিসেবে বড়ো হতে পারে না।

আহ্‌মেদ সাহেব বলেছিল, ঠিক আছে, তুমি বলো তো?

আর একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, চরিত্র গঠন না হলে মানুষ জীবনে উন্নতি করতে পারে না।

—ঠিক আছে, এবার তুমি বলো তো?

আর একজন বললে, চরিত্রই হলো মানুষের জীবনের মেরুদণ্ড, চরিত্র গঠন করতে পারলে সেই মেরুদণ্ড মজবুত হয়।

—ঠিক আছে, এবার তুমি বলো।

এই রকম একজনের পর একজন দাঁড়িয়ে উঠে তাদের বক্তব্য বলে বসে পড়লো।

—তুমি? তুমি?

এবার দেবব্রতের পালা। দেবব্রত উঠে দাঁড়ালো। ভয়ে, উদ্বেগে, উত্তেজনায় এতক্ষণ সে ঘামছিল, কাঁপছিল, মনে-মনে ছটফট্ করছিল। তার মনে হচ্ছিল সে যেন তখুনি অজ্ঞান, অচৈতন্য হয়ে পড়ে যাবে।

কোনোও রকমে তার মুখ দিয়ে বেরোল, কোনও কিছু পাওয়ার আশায় নয়, কোনও কিছু লাভের আশায় নয়, কোনও কিছু ফলের আশায় নয়, চরিত্রের জন্যেই চরিত্র গঠন করা উচিত।

কথাটা কোনও রকমে বলেই দেবব্রত বসে পড়েছিল। মনে আছে তখনও সে থরথর করে কাঁপছে। সেদিন সুলতান আহ্‌মেদ কী বললেন, কী মন্তব্য করলেন, কার উত্তরটা ঠিক বলে ঘোষণা করলেন, তা আর সে শুনতে পেল না, তা আর সে জানতে পারলে না।

আর তারপর সেই রকম উদ্বেলিত শরীর-মন নিয়েই সে তার বাড়ি চলে গিয়ে পরের দিনের স্কুলের পড়া পড়তে আরম্ভ করে দিলে।

মা জিজ্ঞেস করলে, কী রে, আজ খাবি নে?

দেবব্রতর তখন চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে। বললে, আমার খুব ঘুম পাচ্ছে মা, আমি আর বসে থাকতে পারছি না।

বলে খানিকটা খেয়েই উঠে পড়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

কিন্তু আশ্চর্য, যার এতো ঘুম পাচ্ছিল, সে যখন বিছানায় গিয়ে শুলো, তখন আর তার ঘুম এলো না। সারা রাত জেগে-জেগে রাত কাবার করে দিলে। সমস্ত রাত তার মনে পড়তে লাগলো স্যারের কথা। সুলতান আহ্‌মেদ সাহেবের কথা। সেদিন বিকেলবেলা সবাই যখন ক্লাব থেকে বাড়ি চলে যাচ্ছিলো, তখন সেই দেবব্রতও বাড়ির দিকে রওনা দিতে শুরু করেছিল।

হঠাৎ স্যারের সঙ্গে দেখা। জায়গাটা নিরিবিলি। আকাশের পশ্চিম দিকটাতে অন্ধকার আস্তে-আস্তে আরো ঘন হয়ে আসছিল। স্যার বললেন, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে দেবব্রত—

দেবব্রত অবাক। বললে, বলুন স্যার, কী কথা?

আহ্‌মেদ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, আজকে তুমি আমার প্রশ্নের যে-জবাবটা দিলে, সেটা কোথা থেকে জানতে পারলে? কেউ কি তোমায় শিখিয়ে দিয়েছিল?

—হ্যাঁ স্যার।

—কে ?

দেবব্রত কী বলবে, তা বুঝতে পারছিল না। যাঁর কাছ থেকে কথাটা সে শুনেছিল, তিনি তাঁর নাম বলতে বারণ করে দিয়েছিলেন।

আহ্‌মেদ সাহেব আবার বললেন, কই, কে তিনি ? তাঁর নাম কী ?

দেবব্রত বললে, তিনি তাঁর নাম বলতে বারণ করে দিয়েছেন স্যার। তাঁর নাম আমি আপনাকে বলতে পারবো না।

এর পর আহ্‌মেদ সাহেব আর তাঁর নাম জানতে পীড়াপীড়ি করেননি। দেবব্রত'র কাছ থেকে কোনও জবাব না পেয়ে তিনি যেদিকে যাচ্ছিলেন সেই দিকেই চলতে লাগলেন। দেবব্রত শুধু যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেইখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই স্যারের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। আর যতক্ষণ স্যারকে দেখা গেল ততক্ষণ সেই দিকে চেয়ে-চেয়ে যখন আর তাঁকে দেখা গেল না, তখন সে আপন মনে অন্যমনস্কভাবে নিজেদের বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

একদিন যে ছেলে এই রকম মনের জোর দেখিয়েছে, সেই ছেলেই আবার কলকাতায় এসে বন্ধুদের বাড়িতে অশ্বিনী দত্তের লেখা 'ভক্তিযোগ' বইটা আছে শুনে দুপুর রোদে এ-পাড়া থেকে সে-পাড়া পর্যন্ত হেঁটে চলে গিয়েছিল। বইটা পড়বার জন্যে তার এত তাড়া ছিল যে, সে কোন্ পায়ে কোন্ রঙের জুতো পরেছে তারও খেয়াল ছিল না। এইজন্যেই বলেছি যে বিধাতা পুরুষ দেবব্রত সরকারকে সৃষ্টি করবার সময়ে হয়তো একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন, নইলে দেবব্রত সরকারের মতো এমন সৃষ্টিছাড়া মানুষকে তিনি কেমন করে সৃষ্টি করলেন ?

যে দেবব্রত সরকারের কথা আমি লিখছি, তাকে কিন্তু আমি জীবনে কখনও দেখিনি। এবং আগে কখনও তার নামও শুনিনি।

কথাটা তুললো সুপ্রভাত।

উপলক্ষটা হলো ঝর্ণা দেবীর 'পদ্মশ্রী' পাওয়া নিয়ে। এ-রকম প্রজাতন্ত্র-দিবসে কতো শত-শত পুরুষ মহিলা 'পদ্মশ্রী' 'পদ্মভূষণ' উপাধি পাচ্ছেন, সেই ভারত স্বাধীন হওয়ার কিছুদিন পর থেকেই। অন্য কাউকে নিয়ে সুপ্রভাত তো কখনও এত আলোচনা করেনি!

সেদিন ঝর্ণা দেবীর সম্বর্ধনা সভায় নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে আমি গিয়েছিলাম সেখানে।

সমস্ত সম্বর্ধনা সভায় যা-যা হয়ে থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাই-ই হলো। সেই মঙ্গলাচরণ, সেই বিশিষ্ট লোকদের মুখ থেকে একঘেয়ে আর নীরস গুরুগম্ভীর ভাষণ, আর ফুলের তোড়ার সমারোহ।

নাচ আমি বুঝি না। সবাই যে সব কিছু বোঝবার অধিকারী হবে, এমন কোনও আইনও নেই আর ধরা-বাঁধা নিয়মও নেই। নাচ না বুঝলেও নাচ দেখতে কোনও বাধা-নিষেধও নেই এবং হাততালি দিয়ে নাচ বোঝবার ভান করতেও কোনও আপত্তি নেই।

আর শুধু নাচই বা কেন, সব শিল্প কলা সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। চিত্র-শিল্পই কি সকলে বোঝে? তবু তো চিত্র-শিল্পের কতো সমালোচক পত্র-পত্রিকায় সে-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা লেখে।

আর সাহিত্য?

সাহিত্য বুঝতে তো কোনও বিদ্যা বা বুদ্ধির দরকারই হয় না। যিনি সাহিত্য-কানা মানুষ তিনিও সাহিত্যের বই লেখেন, এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার কলেজে-কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপনা আর গৃহ-শিক্ষকতা করে প্রচুর অর্থও উপার্জন করেন।

কিন্তু এই ঝর্ণা দেবীর সম্বর্ধনা সভায় একটা অদ্ভুত নতুন জিনিস লক্ষ্য করলাম, যা অন্য কোথাও কোনও সম্বর্ধনা সভায় দেখা যায় না।

সে হচ্ছে 'আল্‌তা-মাসি'।

কারো কি 'আল্‌তা-মাসি' নাম হয়?

সুপ্রভাত বললে, হ্যাঁ হয়। এই মহিলার নাম 'আল্‌তা-মাসি'—

জিজ্ঞেস করলাম, ও রকম অদ্ভুত নাম হলো কী করে ?

সুপ্রভাত বললে, ওঁর কাজ হচ্ছে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সধবা মেয়ে-বউদের আল্‌তা পরানো। সারা জীবন দিয়ে উনি ওই-ই করে আসছেন—ওঁর আসল নাম যে কী, তা কেউ-ই জানে না।

জিজ্ঞেস করলাম, তাতে ওঁর লাভ ?

সুপ্রভাত বললে, ওঁর লাভ কিছু নেই, এমনি একটা শখ ওঁর।

তা সেই ঝর্ণা দেবীর সম্বর্ধনা সভায় 'আল্‌তা-মাসি'কে সেই-ই প্রথম দেখলাম। বেশ লাল পাড় শাড়ি পরনে। ভেতরে সেমিজ। ঝর্ণা দেবী যখন ফুলের মালা পরে স্টেজের ওপর বসে আছেন, তখন আল্‌তা-মাসি তাঁর হাতে একটা বেতের সাজি নিয়ে সামনে এসে বসলেন। তারপর সাজি থেকে একটা শিশি বার করলেন। শিশি থেকে একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে কিছুটা আল্‌তা ঢেলে নিয়ে ঝর্ণা দেবীর দু' পায়ের চারিদিকে লাগিয়ে পায়ের মাঝখানে একটা টিপ বসিয়ে দিলেন। তারপর মাথার সিঁথিতেও লম্বা করে সিঁদুর লাগিয়ে দিতেই ঝর্ণা দেবী তাঁর হাতের ভ্যানিটি-ব্যাগ থেকে দশ-টাকার একটি নোট নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন।

সত্যিই সে এক অভিনব দৃশ্য! সবাই তাই দেখে হাততালি দিতে লাগলো। আর তারপর মঞ্চের ওপর পর্দা নেমে এল।

এর পর ঝর্ণা দেবীর নৃত্য শুরু হবে। তারই জন্যে ভেতরে-ভেতরে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। আর শুরু হলো ইন্টারভ্যাল। আর সমস্ত হল্-ঘরের আলো আবার জ্বলে উঠলো।

সুপ্রভাত পাশে এসে বসলো। জিজ্ঞেস করলে, কেমন দেখলে ?

বললাম, ভালোই তো দেখলাম। ঝর্ণা দেবীর বয়েস অনেক হয়ে গেছে, তবু শরীরে এখনও তো বয়েসের ছাপ পড়েনি—

সুপ্রভাত বললে, নাচও তো এক রকমের যোগ-ব্যায়াম। তাই বোধহয় যৌবন এখনও ধরে রাখতে পেরেছেন ঝর্ণা দেবী।

জিজ্ঞেস করলাম, ঝর্ণা দেবীর সঙ্গে তোমার আলাপ হলো কী করে ? আর আগে এত লোককেই তো 'পদ্মশ্রী' উপাধি দেওয়া হয়েছে, বেছে-বেছে ঝর্ণা দেবীকেই বা তোমরা সম্বর্ধনা দিতে গেলে কেন ?

সুপ্রভাত একটু হাসলো। যেন কীরকম রহস্যময় এক হাসি। সেই রকম হাসতে-হাসতেই বললে, এর একটা লম্বা ইতিহাস আছে ভাই।

বললাম, এর আবার ইতিহাস কী থাকতে পারে?

সুপ্রভাত বললে, সব জিনিসেরই যে একটা ইতিহাস থাকে, তা জানো না? আজকে যে ফুলটা ফুটলো, তার পেছনেও তো মাটি কোপানো সার দেওয়া, বীজ পোঁতা আর জল দেওয়ার একটা ইতিহাস লুকিয়ে থাকে—

বলে সুপ্রভাত সেই রকম রহস্যময় হাসি আবার হাসতে লাগলো।

বললাম,এই ঝর্ণা দেবীর জীবনের পেছনেও কি তাহলে একটা ইতিহাস আছে?

সুপ্রভাত বললে, বলছি তো আছে।

—কিন্তু সে ইতিহাসটা কী?

সুপ্রভাত বললে, সে সব পরে একদিন তোমাকে বলবো।

—আর ওই যাঁকে 'আলতা-মাসী' বলা হলো, ও-ই বা কে? সে-ইতিহাসে ওরই বা কীসের ভূমিকা?

সুপ্রভাত বললে, ওই 'আলতা-মাসী' হলো সেই ইতিহাসের 'বিবেক'। যাত্রাপালা-গানে দেখনি, মাঝে-মাঝে একজন লোক গেরুয়া-রঙের আলখাল্লা আর গেরুয়া-রঙের পাগড়ি পরে গান গাইতে-গাইতে আসরে ঢোকে। সে গানের মধ্যে দিয়ে পালার চরিত্রদের ব্যাখ্যা করে, পালার চরিত্রদের সাবধান করে দেয়, কখনও বা ভবিষ্যদ্বাণী করে, আবার কখনও বা চরম দুঃসময়ে নাটককে চড়া-পর্দায় তুলে দিয়ে গিয়ে একসময়ে অন্তর্ধান করে।

আমি তবু বুঝতে পারলাম না তার কথাগুলো। যেমন রহস্যময় লাগছিল তার হাসি, তেমনি রহস্যময় লাগছিল তার কথাগুলোও।

বললাম, আমি তো তোমার কথাগুলো কিছু বুঝতে পারছি না—

সুপ্রভাত বললে, পুরো কাহিনীটা যখন শুনবে তখন বুঝতে পারবে আমি কেন 'আলতা-মাসীকে' 'বিবেক' বলছি—

এর পর আবার সমস্ত অডিটোরিয়াম অন্ধকার হয়ে গেল আর সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হলো ঝর্ণা দেবীর 'সর্প-নৃত্য'।

সত্যিই আমার মনে হয় দেবব্রত সরকারের জীবনটা সাপের মতোই জটিল। আর শুধু জটিল নয়, সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ালও। সেই জন্যেই তো গোড়াতেই বলেছি সব নদীই গঙ্গা নয়, সব পাহাড়ই হিমালয় নয়, সব মৃগই কস্তুরী মৃগ নয়, আর সব মানুষই দেবব্রত সরকার নয়।

সে-সময়ে আমিও জন্মাইনি, আর আমার বন্ধু সুপ্রভাতও জন্মায়নি। আর সেই দেশও এখন আর সেই দেশ নেই। আগে এই দেশটা এক আর অবিভক্ত ছিল। ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা এই দেশটা ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়ে একে তিন-চার টুকরো করে, এর সর্বনাশ করে চলে গিয়েছিল। তার পঁচিশ বছর পরে আবার সেই চারটে টুকরো পাঁচ টুকরোয় পরিণত হয়েছিল।

আগে ঢাকা থেকে বা চট্টগ্রাম থেকে ট্রেনে চেপে বসলে একেবারে এক টিকিটে কলকাতায় এসে পৌঁছনো যেত। কিন্তু তার পরে তা আর সম্ভব হলো না।

কিন্তু যখন দেশ ভাগ হয়নি তখনই সেই তাদের 'চরিত্র-গঠন শিবিরে' সুলতান আহ্‌মেদ সাহেবের কাছে যা দেবব্রত শিখেছিল তাইতেই তার চরিত্র গঠন সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। জীবনে যা সে শিখেছিল তাই ভাঙিয়েই সে সারা জীবন কাটাতে পারতো। কিন্তু মুশকিল করে দিলে বিনয়দা। বিনয়দা মানে বিনয় বোস।

একদিন সকালে সবে মাত্র সে ঘুম থেকে উঠেছে তখন কানাই এসে তাকে ডাকলো। দেবব্রত জানালা দিয়ে তাকে দেখেই বললে, এ কী রে কানাই, তুই? তুই এত সকালে?

কানাই বললে, তুই একটু বাইরে আয়। বিনয়দা এসেছে, তোর সঙ্গে দেখা করতে চায়—

বিনয়দার আসা মানে ঢাকা থেকে আসা। বিনয়দাই ঢাকায় 'বেঙ্গল ভলান্‌টিয়ার্স' নামে একটা পার্টি তৈরী করেছিল। পার্টির বাইরের কোনও লোকই সে-কথা বিশেষ জানতো না।

তার অনেক আগে কানাই দেবব্রতকে বলেছিল বিনয়দার কথা। তার মুখে বিনয়দার অনেক কথা শুনে-শুনে দেবব্রত বলেছিল, তোর বিনয়দাকে একবার দেখাতে পারিস আমাকে?

কানাই বলেছিল, বিনয়দা তো নিজের পার্টির মেম্বার ছাড়া আর কা'রো সঙ্গে দেখা-টেখা করে না।

—কেন?

কানাই বলেছিল, কবে কে বিশ্বাসঘাতকতা করবে তা তো বলা যায় না।

দেবব্রত বলেছিল, কিন্তু নিজের পার্টির লোকরাও তো বিট্রে করতে পারে।

কানাই বলেছিল, না, তা করবে না।

—কেন? কেন করবে না?

—করলে তখন আর সে বেঁচে থাকবে না। বিনয়দা 'বেঙ্গল ভলানটিয়ার্সে'র মেম্বার করবার আগে তাকে শ্মশানে মা-কালীর সামনে নিয়ে গিয়ে নিজের আঙুল কেটে সেই রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়।

—সে প্রতিজ্ঞা যদি ভাঙে, তাহলে?

—প্রতিজ্ঞা ভাঙলে তার আর রক্ষে নেই। তাকে একদিন খুন হতেই হবে অন্য মেম্বারদের হাতে!

সেই কথা শোনার পর থেকেই দেবব্রত কেমন যেন একটা দুর্দম আকর্ষণ বোধ করতো বিনয়দাকে দেখবার জন্যে! দেখতে ইচ্ছে হতো কেমন সে মানুষটা, কী রকম তার চেহারা, কী রকম তার কথাবার্তা!

কানাই-এর কাছে বিনয়দা সম্বন্ধে অনেক কথাই হতো, কিন্তু সেই বিনয়দাকে দেখার সৌভাগ্য তার তখনও হয়নি।

দেবব্রত বলতো, তুই 'বেঙ্গল ভলান্‌টিয়ার্স'-এর মেম্বার?

কানাই বলতো, না রে, আমি মেম্বার হইনি—আমাকে বিনয়দা

ওদের ক্লাবের মেম্বার করেনি।

—কেন? তোর দোষটা কী?

কানাই বলতো, আমার এতগুলো ভাইবোন, তাই আমাকে মেম্বার করেনি বিনয়দা। বলেছে, তোকে মেম্বার হতে হবে না। দেশের কাজের চেয়ে তোর নিজের বাড়ির কাজের দিকে আগে বেশি নজর দিতে হবে।

দেবব্রত বলতো, কিন্তু আমার তো বাবা-মা ছাড়া আর কেউ নেই।

—হ্যাঁ, তাই তুই-ই একলা মেম্বার হতে পারিস। তোর মেম্বার হতে কোনও আপত্তি নেই।

এই রকম সব কথা হতো অনেকদিন আগে থেকে। কিন্তু দেবব্রত কোনও দিন সুযোগ পায়নি সেই বিনয়দাকে দেখার। শুধু তার নামই শুনেছে বরাবর।

তাই সেদিন যখন দেবব্রত শুনলো যে বিনয়দা এসেছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এল। দেখলে কানাই একলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

দেবব্রত বললে, কই রে, তোর বিনয়দা কই?

কানাই বললে, অতো চেঁচাসনি, কেউ শুনতে পাবে।

দেবব্রত গলা নামিয়ে দিয়ে ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলে, বিনয়দা কোথায়?

কানাই দেবব্রতকে একটা অন্ধকার ঝোপের কাছে নিয়ে গেল। বললে, এখানে কেউ আমাদের কথা শুনতে পাবে না। বিনয়দা এসেছে, তোর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

—কবে? কোথায়?

কানাই বললে, রাত্রির বেলা নদীর ধারে শ্মশানের কাছে।

—শ্মশানের কাছে? কেন? সেখানেও তো লোক থাকে।

কানাই বললে, না, এখানে আর ক'টা লোক রোজ-রোজ মরছে! শ্মশানের আশেপাশে অনেক ফাঁকা জায়গা পাওয়া যাবে।

তা তাই-ই হলো। সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা 'চরিত্র-গঠন শিবির'-এ গিয়ে ড্রিল করার পর দেবব্রত তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এল। তারপর

যখন রাত হলো বাবা-মা'র সঙ্গে সেও ঘুমোতে গেল। মা-বাবা দু'জনেই শুতে চলে গেলেন। কিন্তু দেবু বিছানায় ঘুমোতে গিয়েও ঘুমোতে পারলে না। আগে থেকে কথা বলা ছিল কানাই-এর সঙ্গে। সে এসে খুব আল্‌তো করে তার জানালায় একটা টোকা মারবে। সেই শব্দটা শোনবার জন্যেই সেদিন সে কান পেতে রইল।

যশোরের সরকার বাড়ির এক কালে খুব বোল্‌বোলা ছিল। আর সেই সঙ্গে খুব ইজ্জৎও ছিল তাদের বংশের। দু'তিন পুরুষ আগে তাদের অনেক জমিজমা আর বড়-বড় দালান কোঠা ছিল। কিন্তু সেই বংশে বাতি দেওয়ার জন্যে কেবল মুকুন্দ সরকার ছিল আর ছিল তার গৃহিণী। গৃহিণীও ছিল তার বাপ-মায়ের একমাত্র মেয়ে। যখন দেবব্রতর জন্ম হলো তখন ভারি আনন্দ হয়েছিল মুকুন্দবাবুর। মুকুন্দবাবুর শ্বশুর-শাশুড়ী দেবব্রত'র জন্ম হওয়া দেখে যেতে পারেননি। সেজন্যে যতদিন তাঁরা বেঁচে ছিলেন ততদিন মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখতেন। অনেক মন্দিরে গিয়ে তাঁরা পূজো দিতেন, অনেক দেব-দেবীর কাছে মানতও করতেন। আর শুধু যে যশোরের মন্দিরগুলোতেই পূজো দিতেন, তাই-ই নয়। যশোরের বাইরে যেখানেই যে-কোনও দেব-দেবীর বিগ্রহ আছে, মন্দির আছে, সেখানেই গিয়ে পূজো দিতেন। বাড়িতে যতো সাধু-সন্ত আসতো, তাদের সকলকেই খাইয়ে-দাইয়ে সেবা করে আশীর্বাদ চাইতেন।

আশীর্বাদ চাইলেই হয়তো পাওয়া যায়। কিন্তু ক'জন সেই আশীর্বাদের ফল জীবদ্দশায় ভোগ করার সৌভাগ্য অর্জন করে?

তাঁদের ভোগের সামগ্রীর অভাব ছিল না। অভাব ছিল শুধু পুত্র-সন্তানের। কিন্তু সে আশা তাঁদের জীবনে মিটলো না। পুত্র তাঁদের

হয়নি, হয়েছিল কন্যা-সন্তান। সেই কন্যা-সন্তানের নাম তিনি রেখেছিলেন—সুমতি।

যেদিন সুমতির জন্ম হলো সেদিন সুমতির মা কেঁদে ফেলেছিলেন।

কেন যে তিনি কেঁদেছিলেন তা বাইরের কেউ বুঝতে পারেনি বটে, কিন্তু বুঝেছিলেন সুমতির বাবা।

তিনি স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, ছেলে আর মেয়ে কি আলাদা জিনিস গো? দু'জনেই তো সন্তান।

স্ত্রী বলেছিলেন, কিন্তু মেয়ে তো বিয়ের পর পরের বাড়ি চলে যাবে—তখন? তখন তো আমাদের বাড়ি ফাঁকা হয়ে যাবে। তখন কার জন্যে সংসার করবো? আর তা ছাড়া বয়েস হলে কে আমাদের দেখাশোনাই বা করবে?

কিন্তু তারপর অনেক বছর কেটে গেল, কেটে গেল অনেক কাল। অনেক ধুলো জমলো চলমান সময়ের ওপর। সেই সুমতির একদিন বিয়েও হয়ে গেল। সে বিয়েতে অনেক ঘটাও হলো। যারা সে বিয়ে দেখেছে, তারা এখনও বলতে পারে সে-সব জাঁক-জমকের কথা।

আজ শেষ পর্যন্ত নাতির মুখ দেখবার সৌভাগ্য তাঁদের হয়নি। তাঁদের দু'জনের মৃত্যু হবার পরই জন্ম হয়েছিল দেবব্রত সরকারের। বাবা-মা'র মুখেই শুধু শুনেছে দিদিমা আর দাদামশাই-এর গল্প। তাঁদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী শুধু হয়েছে সে।

দেবব্রত সরকারের জন্ম হওয়া মানে যশোরের সরকার বংশের ইজ্জৎ ডবল হওয়া। সকলেই সেই সময়ে বুঝে গেল যে এ ছেলে অনেক ভাগ্যবান। সে যে শুধু পৈতৃক ধন-সম্পত্তিরই মালিক হবে তাই-ই নয়, মাতুল বংশের অগাধ ধন-সম্পত্তিরও মালিক হবে একদিন।

সুতরাং পাড়ার স্কুলে খেলার মাঠেও তাকে ঈর্ষা করবার লোকেরও অভাব হলো না। তারা সবাই শুনিয়ে-শুনিয়ে বলতে লাগলো, ভগবান যাকে দেয় তখন তাকে এমনি করেই দেয় গো—

শুধু যে অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক বলেই ঈর্ষা, তাই-ই নয়,

লেখাপড়াতেও এমন ছেলে যশোরের ইতিহাসে কখনও দেখা যায়নি। অন্য সব ছেলেদের বাপ-মায়েরা বলতে আরম্ভ করলে, ছেলে বটে মুকুন্দবাবুর, ছেলের মতো ছেলে।

দেবব্রত সরকারের আগে আরো অনেক ছেলে স্কুলের পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে।

কিন্তু তা বলে দেবু? দেবব্রত সরকার? তার মতো এত ভালো নম্বর পেয়ে আর কেউ তার আগে ফার্স্ট হয়েছে? কোনও শিক্ষক আগে অন্য কোনও ছাত্রকে পড়িয়ে এত আনন্দ পেয়েছে?

ভোরবেলা বেড়াতে বেরিয়েছেন মুকুন্দবাবু।

রাস্তায় সুলতান আহ্‌মেদ তাঁকে দেখতে পেয়েই সামনে এগিয়ে এলেন। বললেন, সরকারবাবু, আপনার ছেলে দেবু আমাদের যশোরের মুখ উজ্জ্বল করবে, দেখে নেবেন?

মুকুন্দবাবু বলতেন, ও তো সমস্ত দিনই কেবল বই মুখে দিয়ে থাকে, এটা কি ভালো?

আহ্‌মেদ সাহেব বললেন, তাতে ক্ষতি কী? এ যুগে তো অমন ছেলে দেখা যায় না। আপনি ওতে আপত্তি করবেন না। আমি বলছি ও একদিন অসাধারণ মানুষ হয়ে উঠবে।

—কিন্তু অতো পড়াশোনা করলে যদি চোখ খারাপ হয়ে যায়?

আহ্‌মেদ সাহেব বলতেন, সে আমি বলে দেব খন। আর আমি তো ওকে আমার 'চরিত্র-গঠন শিবিরে'র মেম্বার করে নিয়েছি। আর রোজ ডায়েরী লেখার প্র্যাকটিস্ করাচ্ছি ওকে দিয়ে। আমার শিবিরের সব ছেলেদের চেয়ে ও ভালো ফল করছে।

বরাবর এমনি চরিত্রের মানুষই হলো দেবু। এই দেবব্রত সরকার। তাই তো প্রথমেই বলেছি যে সব নদীই যেমন গঙ্গা নয়, সব পাহাড়ই যেমন হিমালয় নয়, সব মৃগই যেমন কস্তুরী মৃগ নয়, তেমনি সব মানুষই দেবব্রত সরকার নয়। দেবব্রত সরকারকে না বুঝলে সুপ্রভাতের এই গল্পও বোঝা যাবে না।

সেই ভোরবেলা কানাই-এর কাছে যখন দেবব্রত শুনলো যে তার বিনয়দা ঢাকা থেকে যশোরে এসেছে, তখন প্রথমে কী বলবে বুঝতে পারলে না। তারপরে জিজ্ঞেস করলে, আজ রাত্তিরে ?

কানাই বললে, হ্যাঁ, আজই রাত্তিরে—

—রাত্তিরে ক'টার সময় ?

কানাই বললে, এই ধর, রাত একটার সময়।

—রাত একটা ? তখন যদি বাবা-মা জানতে পারে ?

কানাই বললে, কী করে জানতে পারবে ? তুই বাড়ির পেছনের পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরে আসবি, আর তারপরে রাত দুটোর পর আবার ফিরে গিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকে আবার নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়বি। মাত্র তো এক ঘণ্টার ব্যাপার। এর মধ্যে অতো ভয় পাওয়ার কী আছে ?

কথাটা শুনে দেবব্রত খানিকক্ষণ চুপ করে ভাবতে লাগলো। বুঝতে পারলে না কী সে বলবে !

কানাই বললে, আমি বিনয়দাকে তোর কথা সব খুলে বলেছি। বলেছি যে তুই বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে, তোর কোনও ভাই-বোন নেই। তারপর তোর চরিত্র সম্বন্ধেও বলেছি। তোর লেখাপড়ায় ফার্স্ট হওয়ার কথা বলেছি, আর তারপর সুলতান সাহেবের চরিত্র-গঠন শিবিরে'র সবচেয়ে ভালো ছেলে হওয়ার কথাও বলে দিয়েছি।

দেবব্রত জিজ্ঞেস করলে, শুনে তোর বিনয়দা কী বললে ?

—বিনয়দা বললে, এই রকম ছেলেদেরই আমি 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'-এর জন্যে চাই। এদের দিয়েই আমাদের কাজ হবে।

দেবব্রত আবার জিজ্ঞেস করলে, কী কাজ রে ?

—সে সব বিনয়দাই তোকে খুলে বলবে। আমাকে কিছুই বলেনি, আমি যাই, কেউ আমাকে দেখে ফেলতে পারে।

তারপর চলে যাবার আগে আবার বললে, তা'হলে ওই কথাই রইলো, ঠিক রাত একটার সময়ে তোর এই জানালায় আস্তে-আস্তে টোকা দেব, মনে রাখিস।

কানাই চলে যাওয়ার পর দেবব্রত অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো, কেন তাকে কানাই-এর বিনয়দা ডেকেছে? তার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে?

দেবব্রতর মনে আছে, সেদিন তার বাবা তাকে দেখে বলেছিলেন, কী হলো, তোমার শরীরটা এত খারাপ দেখাচ্ছে কেন? রাত্তিরে ঘুম হয়নি নাকি?

দেবব্রত বললে, না।

—তাহলে? তাহলে আবার রাত জেগে বই পড়েছ নাকি?

—না।

বলে দেবব্রত বাবাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে তার নিজের ঘরের ভেতরে চলে গেল।

মুকুন্দবাবুর মনের উদ্বেগ একটু বাড়লো। একমাত্র ছেলে তাঁর। তার ভালো-মন্দের ওপর তাঁর নিজের বংশ আর দেবুর দাদামশাইয়ের বংশের সুনাম নির্ভর করছে। দেবু যদি বিগড়ে যায় তো সমাজের লোক সবাই যে ছি-ছি করবে।

মুকুন্দবাবু স্ত্রীকে বলতেন, ওগো, দেবুটার দিকে একবার দেখ তুমি, অতো রোগা হয়ে যাচ্ছে কেন? ও কি সারারাত জেগে পড়ে নাকি?

সুমতি দেবীরও ভাবনা ছিল ছেলেকে নিয়ে। তাঁর নিজের কোনও ভাই ছিল না বলে তাঁর বাবা-মার দু'জনের মনে খুবই কষ্ট ছিল। যখন দেবু জন্মালো, তখন তাঁরা তা দেখে যেতে পারেননি। তার আগেই তাঁরা চলে গিয়েছিলেন। তাঁর এত সাধের ছেলে বাবা-মা দেখতে পাননি বলে মনে দুঃখও ছিল খুব।

মুকুন্দবাবুর নিজের পৈতৃক জমি-জমা দেখবার সঙ্গে-সঙ্গে আবার শ্বশুরমশাইয়ের জমি-জমা দেখবার ভারও পড়লো তাঁর ঘাড়ে। তাঁর

অবর্তমানে আবার একদিন এইসব সম্পত্তি দেখাশোনা করবে দেবু। এই অবস্থায় দেবু যাতে মানুষ হয়, সেই চেষ্টাই করতেন মুকুন্দবাবু। তাই সব সময়ে তাকে চোখে-চোখে রাখতেন তিনি। কী খাচ্ছে, কেমন লেখাপড়া করছে, রাত জেগে-জেগে শরীর খারাপ করছে কিনা, সেই সব চিন্তাতেই তিনি ডুবে থাকতেন। পুকুরের টাটকা মাছ, ঘরের গরুর দুধ-ঘি-দই খাইয়ে-খাইয়ে তার স্বাস্থ্য ভালো করার চেষ্টা করতেন।

কিন্তু কারো স্বাস্থ্য কি কেউ ভালো করতে পারে, যদি সে নিজে চেষ্টা না করে ?

একদিন আহ্‌মেদ সাহেবের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে যেতেই জিজ্ঞেস করলেন, দেবুকে কেমন দেখছেন আহ্‌মেদ সাহেব ? আপনার কথা-টথা শোনে ?

সুলতান আহ্‌মেদ সাহেব বলেছিলেন, ওরকম ছেলে হয় না সরকারমশাই, অমন ছেলে যশোরে একজনও নেই -জীবনে ও খুব উন্নতি করবে একদিন। আমি খুবই কেয়ার নিচ্ছি।

মুকুন্দবাবু বলেছিলেন, স্বাস্থ্যটা দিন-দিন ওর খারাপ হয়ে যাচ্ছে বলে আমার খুব ভয় হয়। দিন-দিন ও রোগা হয়ে যাচ্ছে কেন ?

আহ্‌মেদ সাহেব বলেছিলেন, সামনে পরীক্ষা আসছে বলে হয়তো রাত জেগে-জেগে পড়ছে খুব, মুকুন্দবাবু বলেছিলেন, তা পড়ুক, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া কমিয়ে দিচ্ছে কেন ? আমার তো কোনও অভাব নেই। আমার সঙ্গে ও বলতে গেলে কথা বলাই কমিয়ে দিয়েছে। ও অতো কী ভাবে দিন রাত বলুন তো ?

একদিকে বাবার উৎকণ্ঠা, আর অন্যদিকে দেবব্রতর আরো অন্তর্মুখী হয়ে যাওয়া, এই টানা-পোড়েনের মধ্যেই দিন-দিন বাপ আর ছেলের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। তারপর সেই ব্যবধান আরো বেড়ে গেল, যেদিন রাত একটার সময় 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'-এর বিনয়দার সঙ্গে দেখা হলো।

সেদিন বিছানায় শুতে যাওয়ার পর আর ঘুমই এলো না। কেবল মনে পড়তে লাগলো কানাই-এর কথা। যদি কানাই তার সাড়া না পেয়ে ফিরে যায় ? যদি সে ক্লান্তিতে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে ?

না, ঠিক রাত একটার সময় তার বিছানার পাশে জানালায় মৃদু টোকা পড়লো।

দেবু তৈরিই ছিল। জানালার পাল্লা দুটো সামান্য খুলে ইঙ্গিতে বললে, আসছি—

শীতের কনকনে রাত। সে কলকাতার শীত নয়, যশোরের শীত। যশোরে যেমন গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম, তেমনি শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। একটা সোয়েটারের ওপর আলোয়ান চাপা দিলেও সে শীত কাটে না।

আগে থেকে সমস্তই প্ল্যান করা ছিল। ঘরের দরজাটা আস্তে-আস্তে ভেজিয়ে দিয়ে টিপি-টিপি পায়ে বাইরের বারান্দায় এলো সে। তারপর সেখানেও একটা দরজা পেরোতে হয়। সেই দরজাটায় কোনও রকম শব্দ হলেই পাশের ঘরের বাবা-মা টের পাবে। তাতে আবার তালা-চাবি লাগানো থাকে। চাবিটা থাকে আবার পাশের দেওয়ালের একটা 'তাকে'।

সমস্ত কাজটাই করতে হবে নিঃশব্দে। একটু শব্দ হলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে। তখন মা জেগে উঠেই ধরে ফেলবে ছেলের কাণ্ড।

বারান্দার তালাটাও খোলা হয়ে গেল নিঃশব্দে। কারো কোনও সাড়া-শব্দ নেই। তারপর দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিয়ে বেরোতে হবে উঠোনে। উঠোনের চার দিকে উঁচু দেওয়াল। সেই দেওয়াল যাতে নিঃশব্দে ডিঙোন যায়, তারও ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল আগের দিন। একটা মোটা কাঠের গুঁড়ি এনে রাখা হয়েছিল পাঁচিলের তলায়। তার ওপরে দাঁড়ালে পাঁচিলটা টপকাতে আর কোনও কষ্ট হয় না।

সেই প্ল্যান অনুযায়ী পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরে যেতে পারলে আর কোনও ভয় থাকে না।

বাইরে তখন কানাই মল্লিক উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠা নিয়ে দেবুর জন্যে অপেক্ষা করছিল। চারদিকে আম-বাগান। তখন আমের সময় নয়। আমের সময়ে আম-বাগানে সারা রাতই লোক-জন চলাচল করে। তারা গাছতলায় পড়ে থাকা আম কুড়োতে আসে।

—কী রে? কই, তোর বিনয়দা?

—চুপ কর! কেউ শুনতে পাবে। আমার পেছন-পেছন আয়।

কানাই-এর পেছনে-পেছনে চলতে-চলতে একটা বটগাছের কাছে আসতেই দেখতে পাওয়া গেল একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। কানাই তার কাছে গিয়ে নিচু গলায় বললে, এই যে বিনয়দা, এনেছি দেবুকে।

বিনয়দাকে অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।

তবু বিনয়দা জিজ্ঞেস করলে, কানাই বলছিল তুমি নাকি আমাদের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' দলে যোগ দিতে চাও?

দেবু বললে, হ্যাঁ।

—তোমাদের বাড়িতে কে কে আছেন?

দেবু বললে, আমি, আমার বাবা আর মা।

—এই তিন জন্ ছাড়া আর কেউ নেই?

—না।

—কিন্তু তুমি জানো তো আমাদের দলের কী কাজ?

—কানাই আমাকে সব বলেছে।

বিনয়দা আবার জিজ্ঞেস করলে, তুমি কি জানো যে আমাদের দলের কী উদ্দেশ্য?

—হ্যাঁ, ইংরেজদের মেরে তাড়ানো।

বিনয়দা বললে, না, শুধু ইংরেজদের মেরে তাড়ানো নয়। তাদের মেরে তাড়িয়ে দেশকে স্বাধীন করাও একটা কাজ আমাদের পার্টির। এ কাজ করতে গেলে প্রথমে নিজের চরিত্রটাকে গড়তে হবে। চরিত্র গড়ার জন্যে সব চেয়ে বড়ো দরকার সংযম। সংযম না করতে পারলে চরিত্র গঠন হবে না—আসলে চরিত্র অর্জন করবার জন্যেই চরিত্র গঠন করতে হবে।

দেবু চুপ করে রইল। কী বলবে তা বুঝতে পারলে না।

বিনয়দা আবার বলতে লাগলো, তোমার সম্বন্ধে অনেক লোকের কাছে অনেক কথা শুনেই আমি তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এই কানাইকে বলেছিলাম। আমার কথাতেই সে তোমাকে এখন এখানে ডেকে এনেছে।

দেবু বললে, আপনি যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন তাতেই আমি ধন্য হয়ে গেছি। আমাকে কী করতে হবে তাই আমাকে বলে দিন।

বিনয়দা বললে, আজকে তোমাকে কিছুই করতে হবে না। আমি যে কথাগুলো বললুম, সেই কথাগুলোই তুমি বাড়িতে গিয়ে ভাবো। ভেবে ঠিক করো যে কোনটা তোমার চরিত্রের স্ট্রং পয়েন্ট আর কোনটা তোমার চরিত্রের উইক্ পয়েন্ট। একবার আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করলে কিন্তু আর পেছতে পারবে না। তখন কিন্তু তোমার সর্বস্ব বিসর্জন দিতে হবে - বুঝলে?

দেবু মাথা নেড়ে বললে, হ্যাঁ, বুঝেছি।

বিনয়দা আবার জিজ্ঞেস করলে, আর একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি। তুমি পারবে কি না জানি না, তবু কি তুমি চেষ্টা করবে?

—বলুন স্যার, আমি পারতে চেষ্টা করবো।

বিনয়দা বললে, দেখ আগুনের শিখাকে যেমন ছুরি দিয়ে কাটা যায় না, তেমনি যা সত্যি তাকেও চিরকাল কখনও মিথ্যে বলে চালানো যায় না। যায় কি?

দেবু বললে, না।

—কথাটা তুমি কি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করো?

দেবু বললে, হ্যাঁ আগেও বিশ্বাস করেছি, এখনও বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতেও বরাবর বিশ্বাস করবো।

কথাটা শুনে বিনয়দার মুখ দিয়ে শুধু একটা শব্দ বেরলো, বাঃ—

সত্যিই এ-রকম ছেলে বোধহয় বিনয়দা জীবনে বেশি দেখেনি।

বললে, দেখ দেবু, দল বেঁধে দেশ স্বাধীন করা যায়, দল বেঁধে রাজনীতি করা যায়, দল বেঁধে ফুটবল বা ক্রিকেট খেলা যায়, দল বেঁধে থিয়েটার-নাটকও করা যায়—কিন্তু দল বেঁধে মানুষ হওয়া যায় না, চরিত্রবানও হওয়া যায় না। ওটা একলা করার কাজ। ওটা একলা-একলা করতে হয়। ওটা যাঁরা করতে পেরেছেন তাঁরা হতে পেরেছেন সক্রেটিস, তাঁরা হতে পেরেছেন যীশুখ্রীষ্ট, তাঁরা হতে পেরেছেন চৈতন্যদেব, তাঁরা হতে পেরেছেন বুদ্ধ—

দেবু চুপ করে কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল।

বিনয়দা তখনও বলে চলেছে, তাঁরা সবাই-ই একদিন সমাজ-সংসার বাপ-মা সবাইকে ছেড়ে একলা হয়ে গেছেন। প্রথমে তাঁরা কিন্তু

সবাই-ই ছিলেন সংসারের সঙ্গে জড়িয়ে, সংসারের একজন হয়ে, কিন্তু সত্যের জন্যে তাঁরা সবাই-ই পৃথক হয়ে গেছেন, একক হয়ে গেছেন। তাঁদের চলে যাওয়ার পর, তাঁদের অমর হওয়ার পর তাঁদের নামে নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, কিন্তু জীবদ্দশায় তাঁরা সবাই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে থেকে প্রতিষ্ঠান-ভুক্ত হয়েও তাঁরা ছিলেন প্রতিষ্ঠান-বিচ্ছিন্ন—

দেবুর মুখে তখনও কথা নেই। সে বিনয়দার কথাগুলো এক মনে শুনে যাচ্ছিল।

বিনয়দা আবার বললে, তবে কেন আমি আজ তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি? এসেছি এই জন্যে যে এই কানাই আমাকে অনেকবার তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছে। কানাই আমাকে বলেছে যে তুমি নাকি ঘরে থেকেও ঘর-ছাড়া, দলে থেকেও দল-ছাড়া।

দেবু বললে, কিন্তু সে জন্যে বাবা-মা'র কাছ থেকে আমাকে খুব বকুনি খেতে হয়। জানি না আমি ঠিক করি, না ভুল করি।

বিনয়দা বললে তুমি ঠিক করো কি ভুল করো তা ভাববার দরকার তোমার নেই। তুমি মনেপ্রাণে যেটাকে সত্য বলে জানো সেইটেই করে যাবে, তাতে কে কী বললো না-বললো তা তোমার বিচার করবার দরকার নেই।

দেবু বললে, আমার বিচার তো ভুলও হতে পারে?

বিনয়দা বললে, নিশ্চয় হতে পারে। সেটার জন্যে পৃথিবীর ভালো-ভালো বই পড়বে। সেগুলো পড়লেই বুঝতে পারবে, তুমি ভুল করছো না ঠিক করছো।

তারপর একটু থেমে বিনয়দা আবার বললে, তুমি স্বামী বিবেকানন্দর নাম শুনেছ?

—হ্যাঁ।

—তাঁর লেখা কোনো বই পড়েছ?

দেবু বললে, তাঁর জীবনী পড়েছি।

বিনয়দা বললে, তাঁর লেখা অনেক চিঠি আছে, সেগুলোও পড়ো। স্বামী বিবেকানন্দ একবার একটা চিঠিতে লিখেছেন কবি ভর্তৃহরির কথা। এই ভর্তৃহরি আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে

জন্মেছিলেন। পরে তিনি সংসার ছেড়ে শেষ জীবনে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি একটা কবিতায় লিখে গেছেন—কেউ তোমাকে বলবে সাধু, কেউ তোমাকে বলবে ভণ্ড, কেউ তোমাকে বলবে পণ্ডিত, কেউ আবার তোমাকে বলবে মূর্খ, কেউ তোমাকে বলবে জ্ঞানী, আবার কেউ তোমাকে বলবে নির্বোধ। কিন্তু তুমি কারো কথা শুনবে না। তুমি নিজে যে-পথটাকে সত্য পথ বলে মনে করবে, সেই পথটাই অনুসরণ করবে। কারোর কথা শুনবে না।

তারপর আর একটু থেমে আবার বলতে লাগলো বিনয়দা, তুমি তোমার জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করবার জন্যে কী করতে তৈরি, বলো? কী দিতে পারবে? কী ত্যাগ করতে পারবে, বলো?

দেবু সেদিন প্রশ্নটা শুনে কী উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না প্রথমে। অনেকক্ষণ ধরে মনে মনে ভাবতে লাগলো—সত্যিই সে কতোটুকু ত্যাগ করতে পারবে! জীবন?

বললে, আমি আমার জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করতে রাজি।

বিনয়দা বললে, জীবন তো ছোট জিনিস ভাই, জীবনের চেয়ে আরো অনেক দামী জিনিস আছে তোমার কাছে সেটা দিতে পারবে?

দেবু জিজ্ঞেস করলে, সেটা কী? জীবনের চেয়ে আরো দামী জিনিস কী আছে?

বিনয়দা বললে, ভক্তি—ভক্তি দিতে পারবে?

দেবু একটু ভেবে নিয়ে বললে, হ্যাঁ, ভক্তি দিতে পারবো—

—কিন্তু বেশ ভালো করে ভেবে দেখ। ভক্তি দেওয়া সহজ নয়। ভক্তি দিতে গেলে দরকার হলে বাবা-মা-সংসার-সমাজ সকলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করতে হতে পারে। তা কি পারবে? বেশ ভালো করে ভাবো—

দেবু বললে, আমি আমার জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে বাবা-মা-সংসার-সমাজ সব কিছু ত্যাগ করতে তৈরি।

—ঠিক আছে। আমি আজকের দিনটাও তোমাকে ভাবতে সময় দিচ্ছি, বেশ ভালো করে একটা দিন ভাবো, তারপর কাল জবাব দিও—

দেবু বললে, না, আজকেই আমি কথা দিচ্ছি, আমি আমার

জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে সব কিছু উৎসর্গ করতে রাজি।

বিনয়দা তবু রাজি হলো না। বললে, না, এভাবে রাজি হলে চলবে না, কাল তোমাকে এই সময়ে আমি শ্মশানে নিয়ে যাবো। সেখানে গিয়ে 'শ্মশানেশ্বরী'র পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

কথাগুলো বলে কানাইকে নিয়ে বিনয়দা চলে গেল। যাবার আগে কানাই কাছে এসে বললে, কালকে আবার আমি ওই রাত একটার সময় আসবো, ঠিক তৈরি থাকিস, আমি যাই।

তারপর দেবু আবার সেই রাতের অন্ধকারে বাড়ি ফিরে এলো। তখন রাত বোধহয় তিনটে। আবার সেই পাঁচিল টপ্‌কে নিজের শোবার ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে।

তারপর যতো রাজ্যের ভাবনা। আর তাও কি একটা ভাবনা? তার কেবল মনে হতে লাগলো মানুষ হয়ে বেঁচে থেকে সে কী করবে? চাকরি করবে? জমিদারী দেখবে? ডাক্তার হয়ে রোগী দেখে টাকা উপায় করবে? ইঞ্জিনীয়ার হবে? কিংবা জজ কি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে দেশের লোকদের শাসন করবে? কিংবা উকিল এ্যাডভোকেট হয়ে ন্যায় বিচার চাইবে? কিংবা আই-সি-এস?

আর নয়তো সন্ন্যাসী? সন্ন্যাসী হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমে ঢুকে গেরুয়া পরে শিব জ্ঞানে জীব সেবা?

কিংবা গৃহস্থ? স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সংসার?

সেও তো সকলেই করে। সেটাও তো এক রকমের পেশা। তার বাবা যা করছেন, তার পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহও তো তাই-ই করেছেন। তার দাদামশাইও তো সেই একই পেশা অবলম্বন করেছিলেন। নইলে সেই বা জন্মালো কেন? পূর্বপুরুষরা যা করে

এসেছেন সেও কি তাই-ই করবে ? তার বাইরে কি কোনো কাজ নেই ?

সংসার ত্যাগ করার প্রশ্ন আসে না। কারণ সেটা পলায়ন। কেন সে পালাবে ? কীসের ভয়ে ? কা'র ভয়ে !

হঠাৎ বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কার শব্দ শুনে সে ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। দরজা খুলতেই দেখলে সামনে বাবা দাঁড়িয়ে।

—কী হলো ? এত দেরী পর্যন্ত ঘুমোচ্ছিলে যে।

দেবু চুপ।

বাবা আবার বললে, তোমার চেহারাটা এত শুকনো-শুকনো দেখাচ্ছে কেন ? আবার রাত জেগে জেগে বই পড়েছ নাকি ?

তখনও দেবুর মুখে কোনও কথা নেই।

বাবা বলে যেতে লাগলো, এই তো সেদিন একজামিন হয়ে গেল। এখন একটু বিশ্রাম নাও। না ঘুমোলে তোমার শরীর তো খারাপ হয়ে যাবে—তখন ? তখন কী হবে ?

এ-কথারও কোনও জবাব দিলে না দেবু। তাড়াতাড়ি চোখ মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিলে।

মাও বললে, তুমি দরজা খুলছো না দেখে, আমাদের তো ভয় হয়ে গিয়েছিল। এবার থেকে তুমি ঘরের দরজা খুলে শোবে।

এ কথারও কোনো জবাব দিলে না দেবু। খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে লাগলো। স্কুলে গিয়েও কে কী বলছে, কে কী পড়াচ্ছে তা মাথায় ঢুকলো না।

সমস্তক্ষণ কেবল সেই আগের রাত্রের বিনয়দার কথা মনে পড়তে লাগলো। বিনয়দার বলা কথাগুলো কানের কাছে গুঞ্জন করতে লাগলো। জীবন বড়ো না ভক্তি বড়ো ? তুমি নিজের জীবনের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে ভক্তি দিতে পারবে, বাপ-মা-সমাজ-সংসার সব কিছু জলাঞ্জলি দিতে পারবে ?

—পারবো।

না, অতো তাড়াতাড়ি জবাব দেবার দরকার নেই। আরো চব্বিশ ঘণ্টা ভাবো। কাল সারাদিন ভাবো। তারপরে ভালো করে ভেবে

আবার কাল রাত একটার সময় আমি আবার আসবো। তখন শ্মশানেশ্বরীর পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, তুমি জীবনের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে জীবনের চেয়ে যা বড়ো তা উৎসর্গ করবে, ভক্তি দেবে।

কানাই এক ফাঁকে কাছে এলো। তারপর একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলে, কী রে দেবু, কাল তোর বাবা-মা কিছু জানতে পারেনি তো?

—না।

—ঘুম হয়েছিল তোর?

—না ভাই।

—কেন?

—মাথার মধ্যে কেবল ওই সব কথা তোলপাড় করছিল। ভাবতে ভাবতে কখন ভোর হয়ে গেছে, কখন সকাল হয়ে গেছে, টেরই পাইনি। শেষকালে বাবা দরজায় ধাক্কা দিতে খেয়াল হলো যে বেলা হয়ে গেছে। বাবা খুব বকারকি করেছে।

কানাই বললে, তাহলে আজ রাত্তির বেলা তোকে ডাকবো তো?

—হ্যাঁ, ডাকিস।

—শেষকালে যদি বাড়ির লোকেরা টের পায়।

দেবু বললে, না, কেউ টের পাবে না।

তারপর আবার জিজ্ঞেস করলে, বিনয়দা আছে তো?

কানাই বললে, হ্যাঁ, থাকবে না মানে? তোর সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই তো রয়ে গেল। নইলে চারদিকে বিনয়দার কতো কাজ, জানিস? একলা সমস্ত জেলায়-জেলায় ঘুরছে ওই পার্টির জন্যে। তোর মতো আরো অনেক ছেলেকে দলে টেনেছে। বিনয়দার ধ্যান-জ্ঞান সমস্ত কিছু পার্টি। দেশকে বিনয়দারা স্বাধীন করবেই।

—কী করে দেশকে স্বাধীন করবে?

—ইংরেজদের মেরে—

—ইংরেজদের কী করে মারবো?

—বন্দুক রিভলবার পিস্তল দিয়ে ইংরেজদের গুলি করে।

দেবু তো শুনে মহা-ভাবনায় পড়লো। সে-কাজ সে কী করে করবে? কে তাকে ও-সব দেবে? জিজ্ঞেস করলে, ও-সব জিনিস আমি কোথা থেকে পাবো? কে আমাকে ও-সব দেবে?

কানাই বললে, সব ওই বিনয়দাই দেবে!

—বিনয়দা ও-সব কোথা থেকে পাবে?

কানাই বললে, সে সব তুই ভাবিসনি, তার ব্যবস্থা বিনয়দার সব জানা।

দেবু বললে, আমার বড়ো ভয় করছে রে।

কানাই বললে, কেন? ভয় কীসের? কাকে ভয়? পুলিশকে?

দেবু বললে, না, পুলিশের ভয় আমার নেই।

—তাহলে?

—ভয় আমার বাবা-মা'কে। তারা জানতে পারলে কী হবে? আমি তো বাবা-মার একই ছেলে, আর তো তাদের কেউ নেই।

কানাই বললে, তাহলে? তাহলে আজকের দিনটা ভাব। ভেবে ঠিক কর, তুই বিনয়দার কথায় রাজি হবি কিনা। আমি বিনয়দাকে গিয়ে বলে আসবো দেবু প্রতিজ্ঞা করতে রাজি হচ্ছে না।

কথাগুলো বলে কানাই চলেই যাচ্ছিল। কিন্তু দেবু পেছন থেকে ডাকতে লাগলো, ওরে কানাই, শোন্ শোন্, শুনে যা— বলে কানাই-এর দিকে এগিয়ে গেল। কানাই ততক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

দেবু বললে, তুইও আমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা কর না।

কানাই বললে, আমার যে অনেক ভাই-বোন রয়েছে—আমাকে যে বিনয়দা দলে নেবে না। সকলের দায়-দায়িত্ব আমার একলার ঘাড়ে! বাবার বয়েস হয়েছে। আমার যদি কিছু হয় তাদের কে দেখবে?

কথাটা মিথ্যে নয়। দেবুর কোন দায়-দায়িত্ব নেই, তাই বিনয়দা তাকেই বিশেষ করে বেছে নিয়েছে।

তারপর দেবু আবার নিজের বাড়ির দিকে ফিরলো। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে মাথার ওপর ওই সব কথাই ঘুর-ঘুর করতে লাগলো। তাহলে কি হেরে যাবে?

স্কুল থেকে বাড়ি আসার পর কিছু খেয়ে নিয়েই আবার যেতে হবে

সুলতান আহ্মেদ সাহেবের 'চরিত্র-গঠন শিবিরে'। সেখানে ঘণ্টা দুইয়েক ড্রীল করে আবার বাড়ি আসা।

মুকুন্দবাবুর অনেক কাজ। সম্পত্তি থাকলেই কাজ থাকে। কোথায় কোন জমিটাতে কী চাষ করতে হবে তার আলোচনা করতে হয় হরবিলাসের সঙ্গে। হরবিলাস বিশ্বাস। অনেক কালের পুরোনো লোক। সেই-ই হচ্ছে মুকুন্দবাবুর গোমস্তা। লোকে হরবিলাস বিশ্বাসকে গোমস্তামশাই বলে ডাকে।

গোমস্তামশাই সকালবেলাই আসে মুকুন্দবাবুর চণ্ডীমণ্ডপে।

হরবিলাস আসতেই মুকুন্দবাবু জিজ্ঞেস করেন, কাল পশ্চিমের জমিতে চাষ হলো?

হরবিলাস বলে, সবটা হয়নি, বিঘে চারেক হয়েছে, আজকে আবার বাকিটায় চাষ হবে।

মুকুন্দবাবু জিজ্ঞেস করেন, আজ কি পুরো দিনটাই লাগবে নাকি আবার?

হরবিলাস বলে, আজকে দুপুর এস্তোক পশ্চিমের পুরো মাঠটায় চাষ শেষ হয়ে যাবে। তারপর ধরবে বিলের ধারটা—

কোথায় কোন জমিটা কখন চাষ করতে হবে, কোন জমিতে কী বুনতে হবে তার সমস্ত আলোচনা করে নেন দু'জনে। এ সব প্রতি-দিনের কাজ। আলোচনা শেষ করে হরবিলাস লম্বা-লম্বা পা ফেলে মাঠের দিকে পাড়ি দেয়।

দুপুরবেলা ক্ষেতের মানুষজনদের জন্যে খাবার যায়। সেই খাবার বয়ে নিয়ে যাবার জন্য বিধু আছে।

বিধু আসে দুপুরবেলা। বিধু সরকার। ভাত-তরকারি নিয়ে যায় গরুর গাড়ি করে।

রান্না-বান্না সব তৈরিই থাকে। মুকুন্দবাবুর স্ত্রী সে-সব তদারকি করে। লোকজনের অভাব নেই। মাইনে করা লোক সবাই। প্রতিদিন যেন ভোজ চলে বাড়িতে। ভোরবেলাই তারা রুটি তৈরি করে রাখে। মাথা পিছু আটটা করে রুটি। আর তার সঙ্গে যা-হোক কিছু একটা তরকারি কি ডাল। সেই খেয়েই তারা ক্ষেতের দিকে দৌড়োয়।

মুকুন্দবাবুর তখন কোনও দিকে খেয়াল থাকে না। ভেতর বাড়িতে যা কিছু কাজ হয় সে-সব দেখা-শোনার ভার গৃহিণীর ওপর।

দুপুরবেলাও তাই। অতগুলো লোকের ভাত তরকারির ব্যবস্থা করা কি সহজ কথা?

মুকুন্দবাবু তখন চণ্ডীমণ্ডপে জন-মজুরদের নিয়ে ব্যস্ত।

হরবিলাস তখন সেখানে থাকে। জনমজুররা আটখানা করে রুটি আর ডাল খেয়ে মাঠের দিকে দৌড়োয়। কে কোন্ মাঠে জন খাটবে তা ঠিক করে দেয় হরবিলাস। জন-মজুররা চলে যাবার পর হরবিলাসের সঙ্গে কর্তা আলোচনা চালান।

সমস্ত দিনের কাজের আগাম হিসেব ওখানে বসে-বসেই হয়ে যায়। সে আলোচনা শেষ হয়ে গেলেই হরবিলাস ক্ষেতের দিকে চলে যায়।

তখনকার মতো মুকুন্দবাবুর যতো ব্যস্ততা। তারপর তাঁর ছুটি। তখন তিনি ভেতরে যান। মানে ভেতর মহলে।

তখন গৃহিণীরও একটু অবসর।

কর্তা জিজ্ঞেস করেন, দেবু কোথায়? দেবু?

গৃহিণী বলেন, দেবু তো ওর ঘরে, পড়ছে—

দেবুর তখন পড়ানোর মাস্টারমশাই আসেন। ঘণ্টা খানেক থাকার পরই মাস্টারমশাই তাঁর বাড়িতে চলে যান।

দেখা হয়ে গেলেই মুকুন্দবাবু জিজ্ঞেস করেন, খোকা কেমন পড়ছে মাস্টার?

বরাবর একই উত্তর দেয় বেণীমাধব মাস্টার। বলে, খুব ভালো—

মুকুন্দবাবু আবার জিজ্ঞেস করেন, এবারও ফার্স্ট হবে তো?

বেণীমাধব মাস্টার বলে, আমি তো মনে করি ফার্স্ট হবে, তবে স্বাস্থ্যটা ভালো রাখা চাই।

—ওই তো, ওইটেই তো ও বোঝে না। আমি যতো বলি যে রাত জেগে অতো পড়াশোনা করো না, ততো রাত জেগে পড়ে। আর যতো বলি যে একটু দুধ-দই-টই খাও, তাও আমার কথা শোনে না।

বেণীমাধব মাস্টার বলে, কেন, শোনে না কেন?

—কে জানে? আমার সঙ্গে তো ও কথাও বলে না।

এও এক আশ্চর্য কাণ্ড! জীবনে যে সবচেয়ে আপন জন তার সঙ্গে কথা না বলার কারণটা কী?

সে কারণটা কেউ বোঝে না। বুঝবে কী করে? বোঝবার তো কথা নয়। কারণ মুকুন্দবাবু কিংবা বেণীমাধব মাস্টার—তাঁরা দু'জনই তো সাধারণ মানুষ। তাঁরা সাধারণ মানদণ্ড দিয়েই সব মানুষদের বিচার করেন। সবাই যে-রকম করে সংসার করেন, সেই রকম আচরণই তাঁরা সকলের কাছ থেকে আশা করেন। একটু ব্যতিক্রম হলেই তাঁরা তাকে অমানুষ বলে রায় দিয়ে দেন।

কিন্তু সব মানুষই কি এক রকমের?

বাইরেটা অবশ্য সকলের একই রকম। সকলেরই দুটো হাত, দুটো পা, দুটো চোখ। যা সব মানুষের আছে লোকে তাই দেখেই বলে দেয়, ওটা মানুষ! কিন্তু মন?

সৈন্যেরা যখন ইউনিফর্ম পরে মার্চ করে তখন বাইরে থেকে তাদের একই রকম দেখায়। এক রকমের টুপি, এক রকমের জুতো, এক রকমের জামা। বাইরে থেকে তাদের কোনও তফাৎ নেই।

কিন্তু ভেতরে?

মানুষের মনটার মতো দুর্জ্ঞেয় জিনিস সংসারে আর কিছু নেই। সেখানে যদি কেউ দৃষ্টিপাত করতো তো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত। তার জন্যেই মানুষ-চরিত্র নিয়ে এত কাব্য, এত গল্প, এত উপন্যাস, এত নাটক লেখা হয়েছে, লেখা হচ্ছে আর লেখা হবে। পৃথিবীতে যতদিন মানুষ থাকবে ততদিনই তা লেখা হবে, তবুও তার আবেদন কোনোদিন ফুরিয়ে যাবে না। সমুদ্রের জলের তলায় ডুব দিয়ে কেউ হয়তো তার তলও আবিষ্কার করতে পারে, হিমালয়ের চুড়োয় উঠে অনেকে তার উচ্চতাও মাপতে পারে। কিন্তু মানুষের মন?

মানুষের মন নিয়ে গবেষণা করে কেউ কোনোদিন বলতে পারবে না যে—'আমি এর শেষ কথা দেখিয়ে দিলাম। এর পরে আর নতুন কিছু বলবার নেই।'

বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলে গেছেন—"Science is what you know and philosophy is what you don't know."

সেই জন্যেই আইনস্টাইন যা যা বলে গেছেন তা আমরা সবাই বুঝে গেছি, কিন্তু মন সম্বন্ধে সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড যা বলে গেছেন তার সম্বন্ধে আমরা সবটুকু বুঝিনি, কারণ সেটা অনুমান, প্রমাণ নয়।

দেবব্রত সরকারও সেই রকম একজন মানুষ যাকে সুলতান আহ্‌মেদ সাহেবও বোঝেননি, বেণীমাধব মাস্টারও বোঝেননি, মুকুন্দ সরকারও বোঝেননি। এমন কি কানাই মল্লিক বা তার বিনয়দাও বোঝেননি। আর সবচেয়ে যে কাছের লোক সেই তাঁর স্ত্রী বা কন্যাও তাকে বোঝেনি।

লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চির আঁকা 'মোনালিসা' ছবিটা কি পৃথিবীর কেউ বুঝেছে ?

তাই এ গল্পের গোড়াতেই বলেছি যে দেবব্রত সরকারকে গড়বার সময় বোধহয় তার সৃষ্টিকর্তা একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন।

সেদিনও দেবু যথারীতি খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্রে নিজের ঘরে ঘুমোতে চলে গেল।

খাওয়ার সময় অন্যদিন তবু একটা-দুটো কথা বলে। মুকুন্দবাবু বা তার মা'র কথার দু'একটা জবাবও, হয়তো সামান্য হলেও, দেয়।

কিন্তু সেদিন সে আর কারো কথার জবাবও দিলে না। নিজেও কোনও কথা বললে না। নেহাৎ খেতে হয় বলেই যেন যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব খেয়ে নিয়েই হাত মুখ ধুয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়লো।

মুকুন্দবাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, দেবুর কি আজ রাগ হয়েছে নাকি ? ও যে আজ কোনও কথাই বললে না।

মা বললে, কী জানি, আমি কী করে জানবো ?

বাবা বললেন, দেবু যেন দিন দিন আরো বোবা হয়ে যাচ্ছে—

এ-সব এমন কিছু নতুন ঘটনা নয়। একটা মাত্র ছেলে, সেও যদি এ-রকম হয় তাহলে কার জন্যে বেঁচে থাকা? কার জন্যে সংসার করা?

দেবু তখন নিজের ঘরে গিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছে। রাত একটার সময়ে কানাই এসে তাকে ডাকবে। আর তারপর বিনয়দা তাকে নিয়ে শ্মশানে গিয়ে শ্মশানেশ্বরীর মন্দিরে কী সব প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেবে! সেই সব ভাবনাই সমস্ত মাথাটার মধ্যে কেমন তোলপাড় করতে লাগলো।

কানাই এসে ডাকবার আগে একটু ঘুমিয়ে নিলে ভালো হতো।

কিন্তু কোথায় ঘুম?

সেই যশোর জেলায় তখন সবাই ঘুমে অচেতন। একজন মানুষেরও সাড়া-শব্দ নেই। সবাই বেশ সুখে আছে। কারোর যেন কোনও দুঃখ নেই, কারোর যেন কোনও কষ্ট নেই, কেউই যেন অনাহারে নেই, কারোর যেন কোনও রোগ-শোক-তাপ কিছু নেই।

অথচ দেবুরই যেন যতো দায়। চারপাশে মানুষের এত দুঃখ-কষ্ট, এত শোক-তাপ, এত জ্বালা-যন্ত্রণা, এ সমস্ত কিছুর দায়-ভাগের বোঝা যেন একলা দেবুকেই বইতে হবে।

অথচ দেশের মানুষের সকলের পরবার মতো একটা আস্ত কাপড়ও নেই—এ তার নিজের দেখা দৃশ্য।

অনেকবার বাবাকে এ-সব কথা বলতে গিয়েও থেমে গিয়েছে। যদি সে কখনও স্বাধীন হয় তখন সে এর প্রতিকার করবে, তখন সে এর প্রতিবিধান করবে। তার আগে আর তার কিছু করবার নেই।

হঠাৎ জানালায় সেই মৃদু শব্দ।

সঙ্গে সঙ্গে দেবু বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে। গায়ে একটা জামা চড়িয়ে নিলে সে। তারপর ঠিক আগের রাতে যেমন ভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, তেমনি করেই বাইরে বেরিয়ে গেল।

—বিনয়দা এসেছে?

—হ্যাঁ, ওই যে—

তারপর কানাই তাকে নিয়ে গেল বিনয়দার কাছে।

তারপরে সেখান থেকে শ্মশান।

বিনয়দা তাকে জিজ্ঞেস করলে, তুমি কিছু ভেবেছ ?

দেবু বললে, হ্যাঁ, ভেবেছি—

—তুমি তাহলে আমার প্রস্তাবে রাজি ?

দেবু বললে, রাজি—

—ভক্তি দিতে পারবে তো ?

—হ্যাঁ, দেব।

বিনয়দা বললে, ঠিক আছে। এখনই তাহলে তোমাকে সেই কথাটা এখানকার শ্মশানেশ্বরীর মূর্তির পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। চলো—

তিনজনে তখন সেই শ্মশানের দিকে চলতে লাগলো। নির্জন রাস্তা। শুধু রাস্তাটাই নির্জন নয়, সমস্ত গ্রামটাই নির্জন। কারো মুখে কোনও কথা নেই। যেন সবাই একই উদ্দেশ্যে তখন আত্মমগ্ন।

চলতে চলতে দেবুর মনে হলো, সে যেন আর তখন নিজের মধ্যে নেই। তখন সে হারিয়ে গেছে। এই পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ-পীড়িত, সমস্ত অত্যাচারিত, সমস্ত অবহেলিত মানুষের মধ্যে একাত্ম হয়ে গেছে। সে তখন আর সে নেই, সে তখন অনন্ত হয়ে গিয়েছে, সে তখন হয়ে গিয়েছে অশেষ।

আধ কিলোমিটার দূরেই শ্মশানটা। সেখানে পৌঁছতে বেশি সময় লাগলো না। আর ঘটনাচক্রে শ্মশানটাও তখন নির্জন। শেষ শ্মশান-যাত্রীদের দলটা তখন সবেমাত্র সব কাজ শেষ করে বিদায় নিয়েছে।

শ্মশানেশ্বরীর মন্দিরটাও তখন নিস্তব্ধ। কেউই তখন সেখানে নেই। প্রদীপটা যারা জ্বালিয়ে দিয়েছিল তারা তখন আর নেই। কিন্তু প্রদীপটা তখনও জ্বলছে অল্প অল্প। আর একটু পরে সেটা নিভে যাবে।

বিনয়দা তখন পকেট থেকে একটা ধারালো ছুরি বার করেছে।

বিনয়দা দেবুর হাত ধরে টেনে কাছে নিয়ে গেল।

বললে, এই ছুরিটা নাও—

দেবু ছুরিটা হাতে নিতেই বিনয়দা বললে, ছুরিটা দিয়ে, নিজের বাঁ হাতটা কাটো—

দেবু ঠিক বুঝতে পারলে না কথাগুলো।

বিনয়দা বললে, কাটো—কাটো—

—কোন জায়গাটা কাটবো ?

বিনয়দা বললে, যেখানে ইচ্ছে কাটো। এমন করে কাটবে যাতে খুব রক্ত বেরোয়—

দেবু তবু বুঝতে পারলো না।

বিনয়দা বললে, বাঁ হাতের পাতাটাও কাটতে পারো।

দেবু ডান হাত দিয়ে ছুরিটা বসিয়ে দিলে বাঁ হাতের পাতার ওপর। বসাতেই খুব যন্ত্রণা হতে লাগলো! রক্ত পড়তে লাগলো ঝর-ঝর করে।

বিনয়দা একটা কঞ্চির কলম আর একটা কাগজ এগিয়ে দিলে।

বললে, এই কলম আর কাগজ নাও। ওই বাঁ হাতের রক্ত দিয়ে এই কাগজটাতে আমি যা বলছি তাই লেখ। লিখে নিচে নিজের নাম লিখবে।

দেবু তাই করার জন্য তৈরী হলো।

বিনয়দা বলতে লাগলো, 'আমি মায়ের কাছে বলি প্রদত্ত। আমি আমার জীবন দেশের জন্যে বলিদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রইলাম! দেশকে স্বাধীন করার জন্যে আমি সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকবো। বন্দেমাতরম্।'

দেবু সেই অন্ধকারের মধ্যেই কাগজটার ওপর মোটা-মোটা অক্ষরে কথাগুলো লিখতে লাগলো। লিখতে গিয়ে বাঁ হাতের পাতাটা ছুরি দিয়ে আরো বেশি করে কাটতে হলো, যাতে আরো বেশি রক্ত বেরোয়।

বিনয়দা আর কানাই—তারা দু'জনেই তখন একদৃষ্টে তার লেখা অক্ষরগুলো দেখতে লাগলো।

বিনয়দা বললে, এবার নিচে নিজের নাম সই করো।

দেবু তাই-ই করলে। মোটা-মোটা অক্ষরে নিজের নামটা লিখলে—শ্রীদেবব্রত সরকার।

লেখা হয়ে গেলে বিনয়দা বললে, এবার শ্মশানেশ্বরীর মূর্তির পায়ে হাত দাও।

দেবু তার কথামতো শ্মশানেশ্বরীর মূর্তির পায়ে হাত দিলে।

বিনয়দা বললে, এই যে-কথাগুলো লিখলে সেই কথাগুলো মায়ের পায়ে হাত রেখে মুখে বলো—

দেবু যা কাগজটাতে লিখেছিল সেইগুলোই উচ্চারণ করতে লাগলো, আমি মায়ের কাছে বলি-প্রদত্ত। আমি আমার জীবন দেশের জন্যে বলিদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রইলাম। দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে আমি সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকবো। বন্দেমাতরম্।

বিনয়দা বললে, ঠিক আছে, এইবার বাড়ি যাও। আজকে যে প্রতিজ্ঞা তুমি করলে সে-কথা কাউকেই কোনোদিন বলবে না। এমন কি তোমার বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন কাউকেই কোনও কথা বলবে না। যদি সম্ভব হয় তো তুমি ওই কাটার ওপর চুন বা টিংচার-আইওডিন লাগিয়ে দিও। নইলে পরে ঘা হতে পারে।

সমস্ত অনুষ্ঠানটি খুব কম সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। তারপরে কিছু লোক তখন শ্মশানের দিকে 'হরি বোল' দিতে দিতে আসছে। তারা এসে পৌছোবার আগেই দেবু কানাই বিনয়দা সবাই মিলে বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

সেদিনকার সেই ঘটনাটা যে দেবব্রত সরকারের জীবনে কতোখানি বিয়োগান্ত রূপ গ্রহণ করবে তা কি সে নিজেও কোনোদিন ভাবতে পেরেছিল?

সব মানুষই ছোটবেলা থেকে নিজের জন্যে চলবার মতো রাস্তা ঠিক করে নিয়ে একটা গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। সাধারণ বাঙালীদের শতকরা প্রায় নিরানব্বই জনের আকাঙ্ক্ষাই থাকে, শহরের মধ্যে একটা বাড়ির মালিক হওয়া। তার বেশি তারা কিছু

চায়ও না, আর চায় না বলেই তারা তাই কিছু পায়ও না। বাড়ি যদি বা তাদের একটা হয়ও তো সেখানেই থেমে গিয়ে তারা জীবনের ইতি টেনে দেয়। ইতি টেনে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ফেলে।

তার পরে যেটা চায়, সেটা হলো—টাকা।

এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। ব্যতিক্রম আছে বৈকি।

ব্যতিক্রম যাঁরা তাঁরা ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তাঁদের নাম উল্লেখ না করলেও সবাই-ই তাঁদের এক ডাকে চিনবেন।

কিন্তু এ-গল্পের নায়ক দেবব্রত সরকার। দেবব্রত সরকারের নাম কেউ-ই জানে না, কেউ কোনও দিন জানবেও না। তার নাম চিরকাল সকলের কাছে অজ্ঞাতই থেকে যাবে। এই চারদিকের কোটি-কোটি লোকের মধ্যে সে একজন বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম হলেও তার নাম চিরকালের বিস্মৃতির জঞ্জালে চাপা পড়ে যাবে।

কেন এমন হলো? সেই 'কেন'র উত্তর পেতে গেলে তার গল্পটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো শুনে যেতে হবে।

সুপ্রভাতও তাই বললে।

বললে, আমিও কি দেবব্রত সরকারকে চিনতুম? তার নামই শুনেছি, তাকে কোনওদিন দেখিওনি।

—কার কাছে শুনলে তার কথা?

সুপ্রভাত বললে, আমি আগে থেকে তা তোমাকে বলবো না। তাহলে গল্পের রসটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

—কেন?

সুপ্রভাত বললে, রামায়ণ পড়বার সময় যদি আগে থেকে তোমাকে বলে দেওয়া হয় যে, শেষকালে সীতার 'পাতাল প্রবেশ' হবে, তাহলে কি পুরো রামায়ণটা তুমি শুনবে? তুমি যদি সোজা তীর্থে পৌঁছে গিয়ে তীর্থের দেবতাকে দর্শন করে ফেলো, তাহলে কি তীর্থযাত্রার পুরো আনন্দটা পাবে?

বললাম, ঠিক আছে, তুমি যেমন করে ইচ্ছে বলো—

সুপ্রভাত আবার দেবব্রত সরকারের কথা বলতে লাগলো।

তখন ইংরেজ আমল। ১৬৯০ সালের ২৪শে আগষ্ট, দুপুর

বারোটার সময়ে যে লোকটা পাল তোলা জাহাজে করে এসে কলকাতার বাবুঘাটে নামলো তার নাম জোব চার্ণক।

এ-ঘটনা সবাই-ই জানে।

কিন্তু সেই ইংরেজরা কী করে এই ইণ্ডিয়াতে এসে আস্তে-আস্তে সমস্ত দেশটাকে ছলে-বলে-কৌশলে অধিকার করে বসলো, তা সবাই বলতে পারবে না। এই জন্যে বলতে পারবে না যে সবাই-ই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। ব্যস্ত নিজের টাকা উপার্জনের ধান্দায়, ব্যস্ত নিজের টাকা সুরক্ষিত রাখবার প্রচেষ্টায়, ব্যস্ত নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থার দুশ্চিন্তায়।

আর যারা দেশ সেবার কাজে ব্যস্ত তাদের যতোটা না দেশের স্বার্থ রক্ষার কাজে ব্যস্ততা, তার চেয়ে বেশি ব্যস্ততা নিজের সম্পত্তি রক্ষার চেষ্টায়।

এর নামই তো পলিটিক্স।

এই পলিটিক্সই হয়েছে এ-যুগের এক মহাপাপ। আগে পলিটিক্স ছিল দেশ-সেবা, আর এখন পলিটিক্স হয়ে গেছে স্বার্থ-সেবা। আগেকার আমলের বাপ-মায়েরা ছেলে রাজনীতি করছে শুনলে বলতো—ছেলেটা গোল্লায় গেছে।

এখনকার ছেলেরা রাজনীতি করলে বাপ-মায়েরা গর্ব করে বলে, আমার ছেলে পার্টি করে—পার্টির হোল্-টাইম ওয়ার্কার।

কিন্তু আমাদের দেবব্রত সরকার তো আজকালকার ছেলে নয়। সে-যুগের ছেলে। যে-যুগে ইণ্ডিয়া ছিল এক। ইণ্ডিয়া তখনও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়নি। তখনকার যুগে রাজনীতি করা ছিল গুরুজনদের চোখে অপরাধ। তখন গুরুজনদের বক্তব্য ছিল—কাজ কি বাপু ও-সবের মধ্যে গিয়ে? পূর্বপুরুষরা যা এতকাল ধরে করে এসেছে তাই-ই করে যাও। সংসারে সৎভাবে থেকে সময়মতো একটা সৌভাগ্যবতী মেয়েকে বিয়ে করো। তারপর সন্তানসন্ততি হলে তাদের মানুষ করে তোল। দেব ঋণ, ঋষি ঋণ, পিতৃ ঋণ শোধ করে একদিন স্বর্গে চলে যাও। তাতেই তোমার পূর্বপুরুষদের পরলোকগত আত্মারা তৃপ্তি লাভ করবেন।

এই ছিল তখনকার যুগের সমস্ত অভিভাবকদের প্রায় সকলেরই

কথা। এই কথা তাঁরা ছেলে-মেয়েদের শোনাতেন শেখাতেন এবং নিজেরাও সেই নিয়ম পালন করতেন।

কিন্তু হঠাৎ গোল বাধালো কিছু বেয়াড়া লোক।

সেই বেয়াড়া লোকরাই শুরু করলেন যতো বেয়াড়া কাণ্ড। তারাই বলে বেড়াতে লাগলো যে, আমাদের দেশের লোকরা পরদেশী ইংরেজদের গোলামি করছে। আমরা সবাই গোলাম আর আমাদের বাদশা হলো ইংরেজ। ইংরেজরা এখানে ব্যবসা করতে এসে আমাদের এখান থেকে তুলো, তামাক-পাতা, চামড়া, চাল-ডাল সব নিজেদের দেশে নিয়ে যাচ্ছে আর বিলেতে তৈরি কাপড়, ওষুধ, সিগারেট আমাদের এখানে ডবল্ দামে বেচছে। এর ফলে এখানকার গরীব লোক আরো গরীব হয়ে যাচ্ছে, আর ইংরেজ ব্যবসায়ীরা আরো বড়লোক হচ্ছে। আমাদের তাঁতীদের বুড়ো আঙুল কেটে দিয়ে তাদের কাপড় তৈরি করা বন্ধ করতে বাধ্য করেছে, আর তার ফলে তাদের দেশের ম্যান্‌চেস্টারের কলের তৈরি কাপড় কিনতে আমরা বাধ্য হচ্ছি।

এ-সব কথা তখন সব জায়গায় সবাই-ই বলাবলি করতো। কিছু-কিছু স্বদেশী মিটিংও হতো এখানে ওখানে।

লেকচার শুনতে-শুনতে দেবব্রতর শরীরের রক্ত গরম হয়ে উঠতো। হঠাৎ এক-একদিন সেই মিটিং-এর ওপর পুলিশের লাঠিও চলতো, সে লাঠির ঘায়ে অনেক লোক জখমও হতো।

বাবা বড়ো ভয় পেতেন ছেলের কথা ভেবে।

বলতেন, ও-সব মিটিং-এ লেকচার শুনতে যেও না যেন, বুঝলে ?

দেবু কোনও কথার জবাব দিত না।

বিশেষ করে সেই শ্মশানেশ্বরী ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়ে বিনয়দার সামনে প্রতিজ্ঞা করবার পর থেকে দেবু যেন আরো কেমন নির্বাক হয়ে গিয়েছিল।

মুকুন্দবাবু সারাদিন তাঁর জমি-জমা ক্ষেত-খামার নিয়েই থাকতেন। বিশেষ করে চাষ-আবাদের সময়ে। নিজেও তিনি অনেক সময়ে ক্ষেতে গিয়ে জন-মজুরদের কাজকর্ম তদারক করতেন। সব কাজ পরের ওপরে ছেড়ে দিলে চলে না।

অনেক বেলায় বাড়ি এসে খেতে বসে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতেন, খোকা আজকে পেট ভরে খেয়েছে ?

স্ত্রী বলতেন, হ্যাঁ।

মুকুন্দবাবু বলতেন, আজকাল আমি আর তেমন ওর দিকে দেখতে পারছি নে। এবার ছোলা কাটবার সময় এলো, এখন দিন-ভর ক্ষেতেই পড়ে থাকতে হবে দেখছি।

স্ত্রী বলতেন, কেন, হরবিলাস তো রয়েছে।

মুকুন্দবাবু বলতেন, সে তো মাইনে করা লোক, আমি সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে মজুররা যেমন কাজ করবে, তেমন কি আর হরবিলাস থাকলে করবে ?

তা সত্যি! কথাতেই তো আছে যে, মনিব গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর।

এদিকে যখন এই অবস্থা, ওদিকে সুলতান সাহেব তখন দেবুকে নিয়ে পড়েছেন। কত রকমের বই তিনি দেবুকে পড়তে দেন। একদিন স্বামী বিবেকানন্দের লেখা বক্তৃতা সংকলন পড়তে দিলেন সুলতান সাহেব

বললেন, এই বইটা পড়ে আমাকে এসে বলবে কী বুঝলে ?

দেবু বইটা পড়তে নিয়ে গেল। সন্ধ্যেবেলাই পড়াতে আসেন বেণীমাধববাবু। দেবুর কেবল মনে হচ্ছিল কতক্ষণে মাস্টারমশাই চলে যাবেন। স্বামী বিবেকানন্দের নামই তখন শুনেছে সে। কিন্তু তাঁর কোনো রচনা সে পড়েনি। বেণীমাধববাবু পড়াতে-পড়াতে দেবুকে বললেন, তোমার কি ঘুম পাচ্ছে নাকি ? রাত্তিরে কি ভালো ঘুম হয়নি তোমার ?

দেবু বললে, আজ্ঞে না, হয়নি।

বেণীমাধববাবু বললেন, তাহলে আজ তুমি খেয়ে নিয়ে ঘুমোতে যাও, আমি চলি—

বলে মাস্টারমশাই চলে গেলেন। মাস্টারমশাই চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবু আবার বইটা খুলে পড়তে বসলো। পড়তে-পড়তে একেবারে তন্ময় হয়ে গেছে সে।

একটা জায়গায় স্বামী বিবেকানন্দ লিখছেন—The voice of Asia has been the voice of religion, the voice of Europe is the politics

তার মানে হলো—এশিয়ার বাণী হলো ধর্মের বাণী, আর ইয়োরোপের বাণী হচ্ছে রাজনীতির।

তারপরেই আবার তিনি লিখছেন—I do not mean to say that political and social improvements are not necessary. But what I mean is this that they are secondary here and religion is primary.

অর্থাৎ তার মানে এই নয় যে রাজনৈতিক আর সামাজিক উন্নতি আমাদের এখানে দরকার নেই। আসলে আমি বলতে চাই যে এখানে রাজনৈতিক আর সামাজিক উন্নতি পরে হলেও চলবে, কিন্তু এখানে আমাদের দেশে অগ্রাধিকার দিতে হবে ধর্মকে।

কথাটা পড়ে দেবু কেমন অবাক হয়ে গেল। তাহলে বিনয়দা যা বলে গেল, তা কি মিথ্যে? তাহলে কা'র কথা সে শুনবে? বিনয়দার কথা, না স্বামী বিবেকানন্দর কথা?

—এ কী? কী বই পড়ছো, দেখি?

বাবার গলা শুনে দেবু চমকে উঠলো। চেয়ে দেখে বাবা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

—সামনে তোমার পরীক্ষা, আর তুমি এখন এই সব বই পড়ছো? এ বই তো পরীক্ষার পরে পড়লেও চলবে।

দেবু কী বলবে বুঝে উঠতে পারলে না।

—কে তোমাকে দিয়েছে এ বই?

দেবু বললে, সুলতান আহ্‌মেদ সাহেব।

সুলতান সাহেবের নাম শুনে বাবা যেন একটু শান্ত হলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে, এ-সব বই পড়ে বেশি সময় নষ্ট করো না। আগে পরীক্ষা, তারপর এ-সব বই পড়ো—বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরের দিন স্কুলে গিয়ে কানাই-এর সঙ্গে দেখা হলো। তাকে একটু আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, বিনয়দা আছে, না চলে গেছে?

কানাই বললে, চলে গেছে—সেই রাত্তিরেই চলে গেছে।

—কোথায় গেছে ?

—সেই যেখান থেকে এসেছিল, সেখানেই চলে গেছে—ঢাকায়।

আশ্চর্য! দেবু তখনও সেই রাত্রের কথা ভুলতে পারেনি। তার মনের মধ্যে তখনও যে-তোলপাড় চলছে তা তো কানাই জানতে পারছে না, কেমন করে কানাইকে সে বোঝাবে যে দেবু সেই রাত থেকেই যেন অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত একেবারে অন্য মানুষ। যখনই সে শ্মশানেশ্বরীর পায়ে হাত দিয়ে সে নিজের জীবনকে বলিদানের প্রতিজ্ঞা করেছে, সেই মুহূর্তেই যেন সে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছে। তার বাবার দেওয়া 'দেবব্রত' নামটাই শুধু তার আছে, কিন্তু সমস্ত মানুষটা একেবারে অন্য রকম হয়ে গিয়েছে।

তারপরে সেই সাংঘাতিক খবরটা হঠাৎ তার কানে এলো। শুধু যে তার কানেই এল তা নয়। সেদিন পৃথিবীর সব মানুষের কানেই খবরটা গিয়ে পৌঁছুলো।

সেই তারিখটা হচ্ছে ১৯৩০ সালের ২৯শে আগস্ট।

আর সবাই সে তারিখটা ভুলে যেতে পারে, কিন্তু দেবু সেটা কখনও ভোলেনি, আর কখনও ভুলবেও না। খবরটা সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল লণ্ডনে, দিল্লীতে, কলকাতায়, সিলোনে, বর্মায় সর্বত্র। সবটাই তো তখন ইণ্ডিয়া, সবটাই তো তখন ভারতবর্ষ, সবটাই তো তখন একই দেশ।

দেবু যথারীতি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেছে। উঠে তার আগের দিনের কাজকর্মের হিসেবটা ডায়েরীতে লিখেছে। তারপর মা তাকে খাবার খেতে দিয়েছে। খাবারটা খেয়ে নিয়েই বই নিয়ে ক্লাসের পড়াটা পড়তে বসেছে।

ভেতর-বাড়িতে রোজকার মতো সেদিনও জন-মজুরদের কাজ-কর্ম শুরু হয়ে গেছে। তারা জল-খাবার খেয়ে কাজে বেরিয়ে গেছে। বিধু সরকার হিসেবের খাতা নিয়ে বসে গেছে রোজকার মতো তার নিজের জায়গায়। আর একটু পরেই গোমস্তা হরবিলাস বিশ্বাস এসে বলছে, কর্তামশাই, সব্বোনাশ হয়েছে—সব্বোনাশ হয়েছে—

মুকুন্দবাবু চমকে উঠেছেন। বললেন, কীসের সব্বোনাশ? কা'র সব্বোনাশ? কৈলাস খুড়ো মারা গেছে?

—আজ্ঞে না—

হরবিলাস তখনও হাঁফাচ্ছে। হাঁফাতে-হাঁফাতেই বললে, নারায়ণগঞ্জে পুলিশের বড়ো সাহেব খুন হয়ে গেছে।

—কেন? কে খুন করেছে?

—স্বদেশীরা।

এবার মুকুন্দবাবু হতবাক হয়ে গেলেন। নারায়ণগঞ্জের পুলিশের বড়ো সাহেব বড়ো অত্যাচার করতো এ-কথা সবাই-ই জানে। তাকে খুন করেছে স্বদেশীরা?

জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমাকে খবরটা দিলে?

—গ্রামের সবাই-ই তো বলছে, ঢাকা থেকে যারা যশোরে এসেছে তারাই বলেছে।

—কেউ ধরা পড়েছে?

হরবিলাস বললে, তা কেউ জানে না।

মুকুন্দবাবু খবরটা শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। ব্যাপারটা আর চুপ করে থাকার মতো নয়ও। এই সেদিন বরিশাল জেলায় দেবেন্দ্রবিজয় সেনগুপ্ত নামে একটা ছেলে একটা পোড়ো বাড়িতে লুকিয়ে-লুকিয়ে বোমা তৈরি করছিল। সেই সময়ে কেমন করে হঠাৎ একটা বোমা তার হাতের ওপরেই ফেটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সে খুন হয়ে যায়। রক্তে ভেসে যায় ঘরের মেঝে। সে খবরটাও পাড়ার লোকরা এসে মুকুন্দবাবুকে দিয়ে গিয়েছিল।

পাড়ার নীহার ঘোষালের কাছে খবরটা শুনে সেদিনও মুকুন্দবাবু চমকে উঠেছিলেন। তবু যেন খবরটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়নি তাঁর।

বলেছিলেন, খবরটা সত্যি?

নীহার বলেছিল, হ্যাঁ কাকা, সত্যি। আমি নিজের কানে সন্তোষদার কাছে শুনে এসেছি।

—কে সন্তোষদা?

—পশুপতি হালদারের জামাই। পশুপতি হালদারের মেয়ের যে

ওই বরিশাল জেলায় ‘ভোলা’তেই বিয়ে হয়েছে। সেই সন্তোষদা শ্বশুরবাড়িতে এসে সব কথা বলে গেছে।

নীহার বললে, ওখানে ‘নল্‌চিড়া’ বলে একটা গ্রাম আছে। সেখানে একটা পোড়ো বাড়িতে নাকি কয়েকজন ছেলে-ছোকরা মিলে হাত-বোমা তৈরি করছিল। সেই সময়ে ‘বলু’ বলে একটা ষোল বছরের ছেলের হাতে হাত-বোমাটা ফেটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দলের অন্য সব ছেলেরা গা-ঢাকা দিয়ে পালায় আর বলুও সেইখানে মারা যায়—পুলিশ খবর পেয়ে সেই বাড়িতে এসে দেখে একটা ছেলে মরে পড়ে আছে। খবর নিয়ে জানতে পারে বলু হচ্ছে ওখানকার এক বড়লোক জোতদারের ছেলে।

—তারপর ?

—তারপর আর কি। তখন নল্‌চিড়ার সব লোকের বাড়িতে বাড়িতে খানা-তল্লাশী চালিয়ে সকলের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে। সেই তখন থেকে গাঁয়ের কেউ আর সন্ধ্যের পর বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে না—সন্তোষদা তাই তার বউকে শ্বশুরবাড়িতে এনে রেখে দিয়ে গেছে।

—তারপর ?

নীহার বললে, পুলিশের ভয়ে এখন ছেলেদের বাবারা তাদের বাড়ির বাইরে যেতে দিচ্ছে না, বাড়িতে সবাই ছেলেদের নজর-বন্দী করে রাখছে।

মনে আছে সেদিন মুকুন্দবাবু নীহারকে বলেছিলেন, জানো নীহার, এ সব কিছুর জন্যে আর কেউ নয়, ওই গান্ধী বেটাই দায়ী। শুনেছি গান্ধী নাকি বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে এসেছে। আমি বলি তুই যাদের খেয়ে যাদের কাছে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছিস, তুই তাদেরই বিরুদ্ধে নেমকহারামী করছিস? এই কি তোর এত লেখা-পড়ার ফল রে? যারা তোকে এত লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুললে, তুই সেই তাদেরই বিরুদ্ধে সবাইকে উস্‌কে দিচ্ছিস?

নীহার আর কী বলবে। চুপ করে কথাগুলো শুনে গিয়েছিল।

মুকুন্দবাবু আরো বলেছিলেন, এই আমি তোমাকে বলে রাখলুম

নীহার, তুমি আমার কথাগুলো মনে রেখো, ওই গান্ধী বেটাই যতো নষ্টের গোড়া। ওই লোকটাই একদিন এই দেশটার সব্বোনাশ করবে —এই আমি তোমাকে আজ বলে গেলুম—

নীহার আর কিছু কথা বলেনি সেদিন। কিন্তু মুকুন্দবাবুর মুখ দিয়ে তখন খই ফুটছিল। তিনি বলেছিলেন—তোমাদের বয়েস কম, তোমরা এখন অনেকদিন বাঁচবে, কিন্তু আমি তো চলে যাবো। যাবার আগে তোমাকে বলে যাই, ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করে কেউ কোনওদিন বাঁচেনি, আর কেউ কোনওদিন বাঁচবেও না। এই যে জার্মানী ইংরেজদের বিরুদ্ধে এত বড় লড়াইটা করলো, লাখ-লাখ লোক প্রাণ দিলে, কিন্তু তাতে কী জার্মানী জিততে পারলো? বলো না, তুমি চুপ করে রইলে কেন? আমি কী কিছু অন্যায় কথা বলছি?

একটু থেমে মুকুন্দবাবু আবার বলেছিলেন, ইংরেজদের কামান আছে, বন্দুক আছে, সৈন্য-সামন্ত আছে, সব কিছু আছে। আর তোদের কী আছে শুনি যে তুই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিস। তুই ব্যারিস্টারি পড়ে পাশ করেছিস, তা তুই কোর্টে গিয়ে মামলা-মোকর্দমা করে সংসার-ধর্ম কর না। তাতে তোরও ভালো হবে, দেশের ছেলে-ছোকরাদেরও ভালো হবে। তা নয়, একটা লেংটি পরে চরকা কেটে কী হবে? কলা হবে, কচু হবে!

এ-সব কথা বহুদিন আগের। তারপরে কতো কাণ্ড পৃথিবীতে ঘটে গেছে। নদীর কতো জল গিয়ে সমুদ্রে মিশেছে। তারও শেষ নেই। তার হিসেবও কেউ রাখেনি।

কিন্তু এতদিন পরে আবার হরবিলাসের কাছে ঢাকার ঘটনাটা শুনে মুকুন্দবাবু কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। আবার সেই খুনোখুনির ব্যাপার! বরিশাল জেলার 'ভোলা' গ্রামে যে ছেলেটা বোমা তৈরি করতে গিয়ে মারা গেল, এবার তাদের দলই কি আবার ঢাকায় তাদের কেরামতি দেখালো নাকি!

মুকুন্দবাবু চমকে উঠলেন। এর পেছনে আর কেউ নেই, একমাত্র গান্ধী ছাড়া।

বললেন, জানো হরবিলাস, আমি তোমাকে আগেই বলে দিয়েছি,

ওই আমাদের ব্যারিস্টার গান্ধীটাই হলো যতো নষ্টের মূল। গান্ধীই ছেলেগুলোকে নষ্ট করে ছাড়বে, ছেলেগুলোর মাথা খাবে, আমি নীহারকে তাই-ই বলেছি।

তারপর একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করলেন, তা খবরটা কার কাছে শুনলে? তোমার কৈলাশ খুড়োর কাছে নাকি?

হরবিলাস যা বললে তা খুবই ভয়ংকর ব্যাপার।

ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে পুলিশের কর্তা নারায়ণগঞ্জে আর একজন পুলিশের বড়কর্তাকে দেখতে গিয়েছিল। সঙ্গে ছিল আর একজন পুলিশের কর্তা। হঠাৎ পঞ্চাশ ফুট দূব থেকে কে একজন রিভলবার থেকে গুলি মারলে বড়ো সাহেবকে লক্ষ্য করে, আর সঙ্গে-সঙ্গে সাহেব মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তারপরই মৃত্যু।

—সে কী? কবে?

—আজ্ঞে, কাল।

মুকুন্দবাবুর মাথাটা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগলো। তাহলে বাঙালীদের কী হবে?

আর শুধু বাঙালীই নাকি, সারা দেশে তো এই রকমই কাণ্ড চলছে। কোথায় কানপুর, কোথায় পাঞ্জাব, কোথায় পুনা, সব জায়গাতেই তো কালোরা সাহেবদের মারছে। এই দাঙ্গা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামবে? কী করে থামবে?

মুকুন্দবাবু বললেন, যাক্ গে, সব গোল্লায় যাক, আমি আর ভাবতে পারি নে। আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি, আমার তো তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, আমি তো কেবল আমার ছেলেটার কথা ভাবি। তার জন্যেই আমার যতো ভাবনা—যাক্ গে, আজকে কী তাহলে পশ্চিমের মাঠে কাজ শুরু করবে?

হরবিলাসই মুকুন্দবাবুর ভরসা। হরবিলাস যতোদিন কাজ করতে পারবে ততোদিনই মুকুন্দবাবু মাথা সোজা করে থাকতে পারবেন। তারপর? তারপরের কথা আর তিনি ভাববেন না। তখন দেবু যা পারে করবে আর না পারে তো সব কিছুই গোল্লায় যাবে।

খানিক পরে হরবিলাসও চলে গেল। মুকুন্দবাবুও তৈরি হতে

লাগলেন তাঁর দৈনন্দিন কাজের ধান্দায়। রোজই তাঁর কাজের চাপ থাকে, কাজের মধ্যে ডুবে থাকলেই তিনি মুক্তি পান।

পরের দিন স্কুলে যেতেই কানাই কাছে এল।

গলাটা নামিয়ে বললে, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে রে দেবু—

—আমার সঙ্গে? কী কথা?

—পরে বলবো। খুব জরুরী কথা!

বলে অন্য দিকে চলে গেল।

দেবুর মনে হলো কী এমন কথা যা সকলের সামনে বলা যায় না!

কিন্তু তারপরে আর কানাই-এর পাত্তা পাওয়া গেল না। কোথায় য সে গেল তা আর কেউ বলতে পারলে না।

যখন স্কুল বন্ধ হওয়ার সময় হলো তখন কানাই কাছে এলো।

দেবু বললে, কী রে, কোথায় ছিলিস্ তুই?

কানাই বললে, খুব ঝামেলায় পড়েছি রে—

—কীসের ঝামেলা?

—সে পরে বলবো।

দেবু বললে, পরে বললে চলবে না, এখনই বল্ তুই!

তবু কানাই বলতে রাজি হলো না।

তার সেই এক কথা, সে পরে বলবো।

—কেন? পরে বলবি কেন?

কানাই-এর দু'চোখে কেমন একটা ভয়ের ছবি ফুটে উঠলো। বললে, নারে, খুব ঝামেলা রয়েছে। আমার মনটা খুব খারাপ।

—কেন?

কানাই বললে, সে তোকে পরে বলবো।

—আবার পরে কেন ?

— এখন এখানে কেউ শুনতে পাবে। তোকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলবো।

দেবুর তখন আর দেরি সইছে না। সারাদিন কানাই আর ক্লাসেই এলো না। সে যে কী নিয়ে এত ব্যস্ত, তাও দেবু বুঝতে পারলে না। কীসের ঝামেলা তার ?

তারপর যখন স্কুলের ছুটি হলো, তখন দেবু বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েও বাড়ির দিকে যেতে পারলে না। যখন ছেলেদের ভিড় একটু পাতলা হয়ে এল তখন দেখলে দূর থেকে কানাই দৌড়তে দৌড়তে আসছে।

কাছে আসতেই দেবু জিজ্ঞেস করলে, কীরে, তোর ব্যাপারটা কী ?

কানাই বললে, বলছি, আগে বল্ তুই কাউকে বলবি না ?

দেবু বললে, না, কথা দিচ্ছি কাউকে কিছু বলবো না।

কানাই বললে, ঢাকাতে কী হয়েছে জানিস ?

—না।

—ঢাকা পুলিশের আই-জি লোম্যান সাহেব পিস্তলের গুলিতে খুন হয়েছে।

—সে কী ? কে খুন করলে ?

—বিনয়দা !

—বিনয়দা ?

কানাই বললে, কথাটা শোনার পর সারাদেশে হই-চই পড়ে গিয়েছে। তারপর একটু থেমে বললে, কাউকে যেন এ-সম্বন্ধে কিছু বলিসনি !

— কিন্তু কী করে মারলে রে বিনয়দা ?

কানাই বললে, পিস্তল দিয়ে। খবরের কাগজে নাকি সব বেরিয়েছে, পঞ্চাশ ফুট দূর থেকে ঠিক মানুষটাকে মারা কি সোজা ?

দেবু জিজ্ঞেস করলে, কখন মারলে ? সকালে না বিকেলে ?

—আরে সকাল ন'টা পনেরো মিনিটের সময়।

—কী করে বিনয়দা খবর পেলে যে পুলিশের কর্তা ওই সময়ে

মিট্‌ফোর্ড হাসপাতালে আসবে ?

কানাই বললে, আরে বিনয়দা তো একলা নয়, ওদের দলে তো আরো অনেক ছেলেরা আছে, তারাও তো সবাই তোর মতো ঠাকুরকে ছুঁয়ে দেশের কাজ করবার জন্যে প্রতিজ্ঞা করেছে—তারাই খবর এনে দিয়েছিল লোম্যান সাহেব আর হাডসন্ সাহেব দু'জনেই ওই দিন ওই সময়ে ওই হাসপাতালে আসবে—

—তারপর ?

—তারপর বিনয়দা দু'হাতে দু'টো পিস্তল নিয়ে তক্কে-তক্কে ছিল। যেই লোম্যান হাডসন্ সাহেবের সঙ্গে গল্প করতে-করতে হাসপাতালের বাগানে এসে ঢুকেছে, তখ্‌খুনি বিনয়দা দু'হাতে দু'টো পিস্তল নিয়ে গুলি ছুঁড়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে লোম্যান সাহেবের বুকে দু'টো গুলি লাগতেই একেবারে মাটিতে পড়ে গেল, আর হাডসন্ সাহেবের গায়েও লাগলো তিনটে গুলি।

—লোম্যান সাহেবটা কে ?

কানাই বললে, লোম্যান হচ্ছে ঢাকার পুলিশের ইন্‌স্পেকটার জেনারেল, আর হাডসন্ হচ্ছে ঢাকার পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট।

—তারপর ?

—তারপর শুনলাম আজ সকাল ন'টা পনেরো মিনিটে মারা গেছে। অনেক চেষ্টা করেও নাকি তাকে বাঁচানো গেল না।

দেবু জিজ্ঞেস করলে, আর বিনয়দা ?

কানাই বললে, শুনলুম একজন ঠিকেদার সেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব ঘটনাটা দেখছিল। সে বিনয়দার পেছন-পেছন দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেললে। কিন্তু ফিজিক্যাল-একসারসাইজ করা মানুষ বিনয়দার সঙ্গে বুড়ো পারবে কেন ? বিনয়দা এক হ্যাঁচ্‌কা টানে লোকটার হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গেছে।

তারপর একটু থেমে কানাই আবার বললে, এ-সব কথা যেন কাউকে বলিসনি তুই।

দেবু বললে, আমি তো প্রতিজ্ঞাই করেছি যে জীবনে কখনও কাউকে এ-সব কথা বলবো না।

—না, কাউকে বলিসনি। সে তোর বাবা হোক আর মা-ই হোক, কাউকেই কখনও তুই বলিসনি যেন।

জিজ্ঞেস করলাম, তারপর ?

সুপ্রভাত দেখলাম সবই জানে। শুধু যে দেবব্রত সরকারকে চেনে তাই-ই নয়, সে-যুগের দেশের সমস্ত ইতিহাসটাই জানে। কেমন করে কী অবস্থার মধ্যে দেবব্রতর চরিত্রটা গড়ে উঠেছিল, কোন অবস্থার মধ্যে সে জন্মেছিল, কাকে আদর্শ করে সে বড়ো হয়ে উঠেছিল, সমস্তই তার জানা ছিল।

মাঝে-মাঝে দেবব্রত কলকাতায় আসতো তার দূরসম্পর্কের এক কাকার বাড়িতে। দূরসম্পর্ক হলেও আপন কাকার মতো। কাকা ছিলেন একটা স্কুলের হেডমাস্টার। কাকীমা মারা গেছেন। সংসারে বলতে গেলে তিনি একলাই। গোলকেন্দু সরকারের নাম বললেই সবাই এক ডাকে তাঁকে চিনতে পারবে।

সবাই বলবে, ও, আমাদের হেডমাস্টারমশাই-এর কথা বলছেন? এখান দিয়ে সোজা চলে যান, সোজা গিয়ে প্রথম ডান দিকে গিয়ে চার নম্বর বাড়িটাই হলো হেডমাস্টারমশাই-এর বাড়ি। সেই বাড়ির সদর দরজায় পৌঁছে কড়া নাড়বেন, কড়া নাড়লেই দেখবেন একজন লোক বাইরে আসবে। সে হলো ওঁর চাকর গোষ্ঠ। তাকেই মাস্টারমশাই-এর কথা বলবেন। সে আপনাকে বসতে বলবে।

গরমের ছুটিই হোক আর পুজোর ছুটিই হোক দেবব্রত স্কুলের ছুটি হলেই সোজা চলে আসতো এই কাকার বাড়ি। এখানে এসে কিছুদিন থাকতো আর ছুটি ফুরোলেই আবার চলে যেত তার নিজের দেশে দৌলতপুরে।

আসবার সময়ে দেবু দৌলতপুরের নলেন-গুড়ের পাটালি বা চাক-ভাঙা মধু নিয়ে আসতো কাকার জন্যে। সে-সব খাঁটি জিনিস কলকাতায় পাওয়া যেত না। গোষ্ঠ তাই-ই খেতে দিত কাকাকে। কাকার প্রাণ পড়ে থাকতো যশোরে। কিন্তু পেশা ছিল কলকাতায়। তাই স্ত্রীর মৃত্যুর পরেও তাঁর স্কুলের ছাত্রদের জন্যে তিনি কলকাতাতেই থেকে গিয়েছিলেন।

রিটায়ার করবার পর মুকুন্দবাবু চিঠি লিখেছিলেন কাকাকে। লিখেছিলেন, এখন আর কলকাতাতে থেকে কী হবে, তুমি এখানে চলে এসো। আমি একলা এত সম্পত্তি দেখাশোনা করতে পারছি না। তুমি এখানে এলে আমার ঝামেলা একটু কমবে। কলকাতায় সারা জীবন থেকে কী লাভ? এখানকার জল-হাওয়া ভালো। কলকাতার চেয়ে জিনিসপত্র এখানে অনেক সস্তা। সারা জীবনই তো তুমি পরিশ্রম করলে, এবার এখানে এলে তবু একটু বিশ্রাম হবে।

কিন্তু কাকা দেশে যেতে চাননি। বাবার চিঠির জবাবে লিখেছিলেন, আমার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে এখনও আমাকে এখানে আরো কিছুদিন থাকতে হবে। ছেলেদের মানুষ করে তোলা আমার জীবনের ব্রত। যতোদিন প্রাণে এক বিন্দু রক্ত আছে ততোদিন তাদের ভালোর জন্যে তা পাত করতে চাই। জীবনে আমার আর কোনও কামনা-বাসনা নেই।

এই গোলককাকার বাড়িতেই দেবুর সঙ্গে বঙ্কুর আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। শুধু বঙ্কু নয়, বঙ্কু ছাড়া আরো অনেক ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল তার। কিন্তু বঙ্কুর সঙ্গেই একটু ঘনিষ্ঠতাটা বেশি হয়েছিল তার।

বঙ্কু থাকতো একটু দূরে। বঙ্কুর সঙ্গে মেলামেশা করতে দেবুর বেশি ভালো লাগতো। বঙ্কু যখন পড়া শেষ করে বাড়ির দিকে যেত, তখন দেবুও তার সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত হেঁটে-হেঁটে গল্প করতে করতে যেত।

প্রথম যখন দেবু কলকাতায় এসেছিল তখন চারদিকে যা দেখতো তাই দেখেই অবাক হয়ে যেত। এখানকার ট্রাম, এখানকার দোতলা

বাস, এখানকার ইলেকট্রিক আলো, এখানকার কলের জল সমস্তই তার বিস্ময় উদ্রেক করতো। তারপর দেখতো এক অদ্ভুত জিনিস। দেখতো কী একটা সাদা রং-এর জিনিসের মুখে আগুন জ্বেলে দিয়ে তাতে টান দিত আর মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোত।

দেবু যখন প্রথম দৌলতপুর থেকে কলকাতায় এসেছিল তখন কাকাকে জিজ্ঞেস করেছিল, কাকা, ওই সাদা-সাদা জিনিসগুলো কী? মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোয়?

কাকা বলেছিল, ওর নাম সিগারেট, ও-সব বদমাইশ লোকেরা খায়। ওটা যেন কখনও খেও না তুমি!

—কেন, খেলে কী হয়?

—খেলে অসুখ হয়।

—ওটা তো সাহেবরাও খায়। তাহলে কি সাহেবরাও বদমাইশ?

কাকা বলেছিল, সাহেবরা ভালো লোক তা কে বললে তোমায়?

এর পরে যখন আরো বয়েস হয়েছে তখন বুঝেছে যে, ওই সাহেবরা সত্যিই বদমাইশ লোক। সে কথা দৌলতপুরের সুলতান সাহেব বলেছে, কানাইও বলেছে, বিনয়দাও বলেছে। সেই জন্যেই তো বিনয়দা ঢাকার পুলিশের সবচেয়ে বড়ো কর্তা লোম্যান সাহেবকে পিস্তলের গুলিতে মেরে ফেলেছে। সেই কথা ভেবেই তো বিনয়দার 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে'র ছেলেরা নিজেদের জীবন বলিদান দেবার প্রতিজ্ঞা করেছে।

ওই কাকার বাড়িতেই বঙ্কুর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে দেবু জানতে পেরেছিল যে তাদের বাড়িতে অনেক ভালো-ভালো বই আছে।

দেবু বলেছিল, আমাকে একটা বই পড়তে দিবি?

বঙ্কু বলেছিল, কী বই?

—অশ্বিনীকুমার দত্তের লেখা 'ভক্তিযোগ'।

বঙ্কু অশ্বিনীকুমার দত্তের নামও শোনেনি। বললে, আমি খুঁজে দেখবো, যদি থাকে তো তোকে পড়তে দেব।

তারপর একদিন এসে বললে, বইটা পেয়েছি রে, কিন্তু বাবা বই বাইরে নিয়ে যেতে আপত্তি করেছে। আমার বাড়িতে গিয়ে তুই পড়ে

আসতে পারিস।

সেই সূত্রেই দেবু বন্ধুদের বাড়ি গিয়েছিল। প্রথম দিনেই বন্ধু তার দু'পায়ে দু' রং-এর জুতো পরা দেখেই বুঝে গিয়েছিল দেবু কী ধরনের পাগল ছেলে। পাগল তো সংসারে হাজার-হাজার রকমের আছে। দেবব্রতর মতো পাগল বোধহয় কমই আছে।

ওই বন্ধুই একদিন সিগারেট খাচ্ছিল। সেদিকে দেবুর নজর পড়ে গিয়েছিল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, তুই সিগারেট খাস?

বন্ধু বলেছিল, হ্যাঁ, কারুর সামনে খাই না, লুকিয়ে-লুকিয়ে খাই।

দেবু বলেছিল, তাহলে এটা বুঝিস যে সিগারেট খাওয়াটা অন্যায়, নইলে লুকিয়ে-লুকিয়ে খাস কেন?

বন্ধু বলেছিল, ন্যায়-অন্যায় বুঝি না, খেতে ভালো লাগে তাই খাই।

দেবু বলেছিল, কিন্তু বদমাইশ লোকেরাই তো সিগারেট খায়।

—কে বলেছে?

—কে আবার বলবে, আমার কাকা বলেছে।

বন্ধু বলেছিল, দূর, বাজে কথা। আমি কতো বড়-বড় লোককে সিগারেট খেতে দেখেছি। আর তাছাড়া সাহেবরাও তো খায়:

দেবু বলেছিল, তা সাহেবরা কি ভালো লোক? সাহেবরা তো সবচেয়ে বদমাইশ!

—কী বলছিস তুই? সাহেবদের কতো টাকা বল্ দিকিনি! ওরা আমাদের চেয়ে হাজার গুণ বড়লোক। নইলে আমাদের দেশের তিরিশ কোটি লোককে এমন করে স্লেভ করে রেখে দিতে পারে?

এর পরে দেবু বন্ধুর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখলে।

বন্ধু বললে, সত্যিই তুই একটা আস্ত পাগল! নইলে সেদিন এক পায়ে সাদা জুতো আর এক পায়ে কালো জুতো কেউ পরে?

দেবু বললে, পাগল বলেই তো আমি সিগারেট খাই না। যা সবাই করে আমি তা করি না, কখনও করবোও না। ওই যে চাটগাঁয় মাস্টারদা সাহেবদের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ দিলে, ওই যে বিনয়দা, বাদলদা, দীনেশদা লোম্যান সিম্‌সন সাহেবকে খুন করে মরলো, ওরাও তাহলে পাগল। ওরা কেন প্রাণ দিলে? চাকরি নিয়ে বিয়ে-থা করে

সংসার করলেই পারতো। যেমন আর সবাই করে। তাহলে তো ওরাও পাগল। আমি তো পাগলই হতে চাইছি, কিন্তু পাগল হতে পারছি কই ?

এ-কথার পর বংকু আর কী বলবে, চুপ করে রইল !

দেবু বলেছিল, ঠিক আছে, সবাই সিগারেট খাচ্ছে তাই তুইও সিগারেট খা। সবাই চাকরি-বাকরি করে তুইও কর গিয়ে। সবাই সবাই বিয়ে-থা করে সংসার করে, তুইও তাই করিস গিয়ে। আমি ভাই সবাই যা করে তা করতে চাই না।

—তাহলে তুই বড় হয়ে জীবনে কী করবি ?

দেবু বলেছিল, আমি ? আমার কথা বলছিস ?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোর কথাই বলছি।

দেবু বলেছিল, আমি চেষ্টা করবো পাগল হতে।

—পাগল হতে ? বলছিস কী ?

দেবু বলেছিল, হ্যাঁ, কতো লোক তো কতো কী হয়েছে ! কেউ জজ হয়েছে, কেউ ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে, কেউ হাকিম হয়েছে, কেউ ব্যারিস্টার, এ্যাডভোকেট, উকিল হয়েছে, কেউ আই. সি এস, আই. পি. এস, আই এ. এস, প্রফেসার, টিচার হয়েছে, কেউ বা মহান্ত, সাধু, স্বামীজী হয়েছে, কেউ বা আবার হিমালয়ে গিয়ে বৈরাগী, বাবাজী, গুরুজী হয়ে আশ্রম খুলেছে, আবার কেউ বা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পী, কবি হয়েছে। একজন সে-সব কিছু না-ই বা হলো। আমি না-হয় পাগলই হলাম। সত্যিকারের পাগল হওয়াও তো শক্ত ! দেখিই না চেষ্টা করে আমি পাগল হতে পারি কিনা।

তারপর পৃথিবীতে কতো কাণ্ড হয়ে গেল। ১৯০১ সালে বুয়োর ওয়ার শেষ হওয়ার পর রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের যুদ্ধের তোড়জোড়

চলছে। পৃথিবীর সমস্ত লোক হাঁ করে অপেক্ষা করছে, কী হয়, কী হয়। তারা বলতে লাগলো, যদি এই যুদ্ধে জাপান হারে তো সমস্ত এশিয়া ভূখণ্ড য়ুরোপীয় শক্তিদের কব্জায় চলে যাবে। আর তারাই তখন সমস্ত এশিয়ার প্রভু হয়ে পূজো পাবে, শ্রদ্ধা পাবে, সম্মান পাবে। আর রাশিয়া যদি হারে তো এশিয়ার দেশগুলো নতুন সঞ্জীবনী শক্তি পেয়ে আবার নতুন করে বেঁচে উঠবে আর সব রকম সর্বনাশ থেকে তারা চিরকালের মতো রক্ষা পেয়ে যাবে।

যে-পত্রিকা এ ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিল তার নাম "দ্য কার্জন গেজেট", আর তার তারিখটা হলো ১৯০৪ সালের ১ ই ফেব্রুয়ারী।

আর ঠিক ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৪ সালেই সরকারিভাবে সেই জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ শুরু হলো। আর ঠিক সেই দিনই জাপানী টর্পেডো রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজগুলোর ওপর হামলা করে সেগুলো ডুবিয়ে দিলে আর পোর্ট-আর্থারের মতো অতো বড়ো বন্দরটার ওপরও হামলা করে সেটা গুঁড়ো করে দিলে।

সেদিন এশিয়ার সমস্ত ভূখণ্ডের মানুষ এই খবরে আশা পেলে, ভরসা পেলে, আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলে। তারা আনন্দে নেচে উঠলো। বিশেষ করে ইণ্ডিয়ার মানুষরা। তাহলে তো তাদের হতাশ হওয়ার আর কিছু নেই। ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৪ তারিখে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় লেখা হলো—'সমস্ত ভারতবাসী, বিশেষ করে সমস্ত বাঙালী সমাজ আজ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন জাপান এই যুদ্ধে জয়ী হয়, যেন সূর্য আবার আমাদের এই পূবের আকাশেই উদিত হয়।'

আর ঠিক তাই-ই হলো।

সেইদিন থেকেই বলতে গেলে পূবের আকাশে সূর্যোদয় শুরু হলো। আর এক-এক করে উদয় হতে লাগলো হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ সূর্যের। অরবিন্দ থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সূর্য সেন, আর তারপর মহাত্মা গান্ধী, সুভাষ বোস আর বিনয়-বাদল-দীনেশ আর সকলের শেষে এই গল্পের প্রাণ-পুরুষ দেবব্রত সরকার।

সেই দীর্ঘ তালিকায় সকলের নামই আছে, কিন্তু আমাদের দেবব্রত সরকারের নাম কোথাও নেই। দেবব্রত সরকারের নাম চিরকালের

মতো মুছে গেছে। শুধু জানে এক এই সুপ্রভাত।

কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা। পরের কথা পরে বলাই তো নিয়ম। তাহলে আগে বলছি কেন? তাই তার আগেকার কথাই আগে বলি—

দেবব্রত তখন স্কুল ছেড়ে কলেজে উঠেছে। কলেজ থেকে পাশও করে ফেলেছে। পাশ করার পরই একদিন বাবা তাকে ধরলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এবার কী করবে? কোন্ লাইনে যাবে? ডাক্তারি পড়বে তুমি? আমার মনে হয় তোমার পক্ষে ডাক্তারি পড়াটাই ভালো।

দেবব্রত বললে, না, ডাক্তারি পড়বো না আমি।

বাবা বললেন, না-না, ডাক্তারিই পড়ো তুমি। ওতে অনেক মানুষের উপকার করতে পারবে। আমাদের গ্রামে ভালো ডাক্তার তো নেই। আর তা ছাড়া ওতে তোমার আয়ও হবে অনেক।

দেবব্রত বললে, আমার যদি বেশি টাকা আয় হয় তো তাতে দেশের লোকের কী উপকার হবে?

বাবা বললেন, দেশের লোকের অসুখের সময় কেউ কোনও ডাক্তার পায় না। তাদের তুমি চিকিৎসা করতে পারবে।

দেবব্রত বললে, তাদের জন্যে তো সরকারি হাসপাতাল আছে। অসুখের সময়ে তারা সেখানে যাবে। তারা সেখানে বিনা পয়সায় ওষুধ পাবে, বিনা পয়সায় ডাক্তার পাবে।

বাবা বললেন, তুমি যদি তা-ই ভাবো তাহলে না হয় তুমি ডাক্তারি পাশ করে সরকারি হাসপাতালে চাকরিও নিতে পারো।

বাবার কথা শুনে দেবব্রতর মুখে কেমন একটা ঘৃণা-রাগ-বিতৃষ্ণার চিহ্ন ফুটে উঠলো।

কিন্তু তখনি নিজেকে সংযত করে নিলে। বললে, আমি খেতে না পেয়ে মরবো তবু ইংরেজদের দেওয়া চাকরি করবো না।

—কেন ইংরেজরাই তো আমাদের দেশের রাজা। তারাই তো আমাদের দেশের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। তাদের নুন খাচ্ছো আর তাদের চাকরি করতেই যতো দোষ? যার খাচ্ছো তাদেরই তুমি দোষ দিচ্ছ? ইংরেজরা অন্যায়টা কী করলে?

কথাগুলো শুনে দেবব্রতর সমস্ত শরীরটা রাগে-ঘৃণায়-ক্ষোভে রি-রি করে উঠলো। মনের সেই রকম ক্ষুব্ধ অবস্থাতেই উত্তেজিত হয়ে বললে, আপনি ইংরেজদের অন্যায়ের কথা তুলছেন? আপনি চোখে দেখতে পাচ্ছেন না ইংরেজরা কী অন্যায় করছে? ইংরেজরা কি কখনও আমাদের দেশে একটা ভালো কাজ করেছে? ইংরেজরা আমাদের দেশের লোকের মুখের ভাত কেড়ে নিয়ে নিজেরা আরাম করবার ব্যবস্থা করেনি? আমরা কী এমন দোষ করেছি যে, মুখে 'বন্দে মাতরম্' বললেই ইংরেজদের বন্দুকের গুলি খেয়ে মরতে হবে? ইংরেজরা আমাদের দেশের তাঁতিদের বুড়ো আঙুল কেটে দিয়ে কেন তাদের দেশের ম্যান্‌চেস্টারের কলের তৈরি ধুতি-শাড়ি পরতে বাধ্য করবে? তাতে তাদের দেশের লোকরা বেশি টাকা উপায় করে বড়লোক হতে পারে, কিন্তু তার জন্যে আমরা কেন না-খেতে পেয়ে মরবো? আমরা কি মানুষ নই? যে-নুন এক পয়সায় কিনতে পাওয়া যায়, তা কেন দশ পয়সা দিয়ে কিনতে হবে? কেন নুনের ওপর ইংরেজরা ট্যাক্স বসাবে? রেলগাড়িতে যে-কামরায় ইংরেজরা চড়বে সে-কামরায় আমরা কেন উঠতে পারবো না? কালো বলে কি আমরা মানুষ নই? আমরা কি গরু-ভেড়া-ছাগল? গায়ের চামড়া কালো বলে কি আমাদের রক্তের রংও কালো আর সাহেবদের গায়ের চামড়ার রং সাদা বলে কি তাদের রক্তের রংও সাদা?

মুকুন্দ সরকার তাঁর ছেলেকে চিনতেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি দেখে এসেছেন সে যেন দেশের অন্য ছেলেদের মতোন নয়, একটু অন্যরকম। বিলিতি কাপড় দেবু ছোটবেলা থেকেই কখনও পরেনি। খদ্দরের কাপড় জামা পরেই কাটিয়ে এসেছে। এখনও তাই আবার

কয়েক মাস ধরে সে চরকায় নিজের হাতে সুতোও কেটেছে। শুধু যে কাপড় জামা তা নয়। ঘড়িও বিলেতে তৈরি হয় বলে সে কখনও হাতে ঘড়িও পরেনি।

কিন্তু সামান্য ডাক্তারি পড়া নিয়ে কথা পাড়তে গিয়ে যে সে এমন রেগে যাবে তা মুকুন্দবাবু বুঝতে পারেননি। তবু বললেন, এতই যদি তোমার সাহেব লোকদের ওপর রাগ তা হলে তো তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে। তারা তো আর এ-দেশ ছেড়ে যাবে না কখনও—

দেবু বললে, কে বললে যাবে না?

বাবা বললেন, আমি বলছি যাবে না। এবার যদি আবার জার্মানীর সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধে তো তখন দেখো ইংরেজদের হাতে জার্মানীর কী হাল হয়—তখন দেখবে ইংরেজরা এ-দেশের ওপর আরো জেঁকে বসবে।

দেবু বললে, ইংরেজরা সে-যুদ্ধে জিতুক আর হারুক তাতে আমাদের কোনও মাথাব্যাথা নেই। একদিন-না-একদিন আমরা এদেশ থেকে ইংরেজদের মেরে তাড়াবোই তাড়াবো।

বাবা বললেন, তোমাদের হাতে বন্দুক আছে না পিস্তল আছে শুনি যে তোমরা তাদের মারবে? ওই তো চাটগাঁয় সূর্য সেন না কে একজন ছোকরা চেষ্টা করলো, তাতে কী ফল হলো? গোটাকতক পাগল শুধু মিছিমিছি প্রাণ দিলে পুলিশের বন্দুকের গুলিতে। হাজার-হাজার নিরীহ লোক জেলে গেল।

দেবু বললে, মিছিমিছি প্রাণ দিলে না সত্যি-সত্যি প্রাণ দিলে তার বিচার করবে ইতিহাস। আপনি আমি তার বিচার করবার কে?

—ইতিহাস মানে?

দেবু বললে, সে আপনি বুঝবেন না—

বাবা এবার রেগে গেলেন। বললেন, আমি বুঝবো না আর বুঝবে তোমাদের বুড়ো গান্ধীটা? ও বুড়োটা ব্যারিস্টারি পাশ করেছে বলে একেবারে মস্তো বোঝদার মানুষ হয়ে পড়েছে নাকি! ওই বুড়োটাই তো বলেছিল যে তার কথামতো চললে দশ বছরের মধ্যে সে স্বাধীনতা এনে দেবে। তা সে দিতে পারলে? ইংরেজরা এ-দেশ ছেড়ে চলে

গেল? স্বাধীনতা এল?

দেবু বললে, তা আপনারা কি তাঁর কথা পুরোপুরি মেনেছিলেন? কেউই কি মেনেছিল?

বাবা বললেন, আমরা তো পাগল নই যে তার কথা মানবো। তার কথা মেনে মিছিমিছি কয়েক হাজার ছেলে ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে দিয়ে বেকার হয়ে গেল। তাদের যে লোকসান হলো সে-লোকসানের ক্ষতিপূরণ কে দেবে? তুমিও তো তখন ইস্কুলের লেখা-পড়া বন্ধ করতে চেয়েছিলে। সেদিন যদি তুমি গান্ধীটার কথা শুনতে তাহলে কী সর্বনাশটা হতো বলো দিকিনি! আমিই তোমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেছিলুম, তাই তুমি আজকে মানুষ হলে। নইলে অন্য ছেলেদের মতো তুমিও তো গোল্লায় যেতে।

হঠাৎ মা ঘরে ঢুকে পড়লেন। মুকুন্দবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, কী হলো তোমাদের? খোকার সঙ্গে এত ঝগড়া করছো কেন? কী নিয়ে তক্কো হচ্ছে?

বাবা বললেন, সে তুমি বুঝবে না। ও বলছে ও ডাক্তারি পড়বে না।

মা ছেলের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেন রে, ডাক্তারি পড়বি না কেন?

মুকুন্দবাবু বললেন, ডাক্তার না হয়ে ও সূর্য সেন হবে, মাস্টারদা হবে, বিনয়-বাদল-দীনেশ হবে। হয়ে ইংরেজদের খুন করে তাদের সবাইকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। দেশ স্বাধীন করবে তোমার ছেলে।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত কাণ্ড, এত বাক-বিতণ্ডা সেই দেবব্রত হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো। বললে, না, আমি ও-কথা বলিনি, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন।

—আমি মিথ্যেবাদী? আমি মিথ্যে কথা বলেছি?

—হ্যাঁ, আমি ও-কথা বলিনি, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন—

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে। হঠাৎ নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে দরজায় খিল দিয়ে দিলে। আর কোনও কথার জবাব দিলে না সে।

বাইরে থেকে মা দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন।

—ওরে খোকা, খোকা, শোন্, আমার কথা শোন্…

তবু ভেতর থেকে দেবুর কোনও সাড়া-শব্দ নেই। তবু মা দরজায় গায়ে ধাক্কা দিতে দিতে ডাকতে লাগলেন, ওরে খোকা, রাগ করিস নে, শোন্, খোকা···

সব সংসারেই ছোটো-খাটো ব্যাপার নিয়ে মনোমালিন্য হয়, মতানৈক্য হয়, মত-বিরোধিতাও হয়। কিন্তু আবার কিছুদিন পরে তা মিটেও যায়। এই-ই নিয়ম। এই নিয়মেই তো এতদিন ধরে সব মানুষের সংসার চলে আসছে। হয়তো এই নিয়মেই আরো কোটি-কোটি বছর মানুষের সংসার চলে আসবে।

কিন্তু দেবব্রত তো সাধারণ মানুষ নয়। তাই ক্রমে ক্রমে মুকুন্দবাবু যে-ভয়টা দেবুর ছেলেবেলা থেকে করে আসছিলেন, তাই-ই সত্যি হলো। দেবব্রত সরকার সত্যিই তার নিজের মতো নিজের ইচ্ছে নিয়ে অনড়-অটল হয়ে রইলো। কারো কোনও উপরোধে বা অনুরোধে সে টললো না। কেউ তাকে টলাতে পারলে না। কেউ টলাতে পারবেও না।

যশোরের সে-সব দিনের কথাও সুপ্রভাত জানে।

'চরিত্র-গঠন শিবির' তখন উঠে যাওয়ারই কথা—কারণ তখন শুধু যে সুলতান আহ্মেদ সাহেব মারা গেছেন তাই-ই নয়, তখন ইণ্ডিয়ার সব শহরেই ওই 'চরিত্র-গঠন শিবিরে'র মতো সব প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠেছে। সবাই চাইছে যে ইণ্ডিয়াতে এমন সব ছেলে তৈরি হোক যারা চরিত্রের দিক থেকে আদর্শ হবে, যারা একদিন বড়ো হয়ে আদর্শের জন্যে জীবন দিতে পারবে।

বাড়িতে যিনি রোজ পড়াতে আসতেন সেই বেণীমাধববাবুও তখন চাকরি নিয়ে কোথায় চলে গেছেন। সুলতান আহ্মেদ সাহেবের অসমাপ্ত কাজটা তখন দেবব্রত সরকারের কাঁধে এসেছে।

মুকুন্দবাবুরও তখন বয়েস বেড়ে গেছে। তিনি তখন আর আগেকার মতো কাজ-কর্ম দেখতে পারেন না।

কলকাতা থেকে গোলকেন্দু সরকার প্রায়ই দাদাকে চিঠি লেখেন—এখন দেবু কী করছে? দেবু কি চাকরি-বাকরি কিছু করছে?

মুকুন্দবাবু সে-চিঠির উত্তরে লেখেন—আমার কোনও কথাই তো খোকা শুনলো না। ডাক্তারি পড়তে বললাম, তা-ও সে পড়লে না। এখানকার একটা স্কুলে ও পড়ায়, আর তারপর ছেলে-মেয়েদের বাড়িতে পড়ায়। তাদের কাছ থেকে কোনও টাকা-পয়সাও নেয় না। ওকে নিয়ে আমি যে কী করি তাই দিন-রাত ভাবি।

শুধু বাবা বা মা-ই নয়, দেবব্রতর সংস্পর্শে যারাই এসেছে তারাই সারাজীবন শুধু জ্বলে-পুড়েই মরেছে!

হরবিলাস তখনও আসতো। জিজ্ঞেস করতো, আজ কি বিলের ধারে জমিটাতে চাষ দেওয়াবো কর্তা?

মুকুন্দবাবুর তখন খুব শরীর খারাপ। শেষ জীবনটাতে তাঁর যে এমন অবস্থা হবে, তা তিনি কল্পনা করতে পারেননি। তিনি বলতেন, আমাকে আর ওসব কথা জিজ্ঞেস করো না হরবিলাস। তুমি যা পারো নিজেই করো গে—

হরবিলাস অবশ্য খুব বিশ্বাসী লোক। জন-মজুর খাটানোর কাজে সে খুব রপ্ত। সে জানে কোন্ মাসে কোন্ মাঠে কী ফসল বুনতে হবে, কী সার দিতে হবে, কবে জমিতে নিড়েন দিতে হবে, তা হরবিলাসের মতো মুকুন্দবাবুও জানতেন না।

—কী হলো, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে যে?

হরবিলাস বলতো, আপনি কিছু আদেশ না দিলে আমি যাই কী করে?

আচ্ছা, তুমি একবার ছোটবাবুর কাছে যাও না—

ছোটবাবু মানে দেবব্রত। হরবিলাস ছোটবাবুর ঘরে গিয়ে দেখে ঘরে কেউ নেই। ছোটবাবুকে না দেখতে পেয়ে হরবিলাস আবার ফিরে এল। বললে, না, ছোটবাবু তো ঘরে নেই কর্তা।

ঘরে নেই? এত সকালে খোকা আবার কোথায় গেল? তারপর

বিছানা থেকে উঠে ভেতর বাড়িতে গেলেন। গৃহিণী দেখতে পেয়ে বললেন, কী হলো? কী চাই?

মুকুন্দবাবু জিজ্ঞেস করলেন, খোকা কোথায় গেল? তুমি জানো কিছু?

গৃহিণী বললেন, সে তো বাড়িতে নেই।

—বাড়িতে নেই? কোথায় গেল?

—সে তো কাল রাত্তির থেকেই নেই—আমাকে বলে গেছে সে।

মুকুন্দবাবু বললেন, তোমাকে বলে গেলেই হলো? আমি কি কেউ নই? তুমিও তো আমাকে কিছু বলোনি? কী বলে গেছে সে?

গৃহিণী বললেন, মুচিপাড়ায় কার বাড়িতে নাকি কলেরা হয়েছে, তাকেই দেখতে গেছে।

—মুচিপাড়ায়? মুচিপাড়ায় কোনও ভদ্দরলোক যায়? সেখানে ওকে কে যেতে বললে? আর গেলই যদি রাত্তিরে বাড়ি ফিরলো না কেন?

গৃহিণী আর কী-ই বা বলবেন।

মুকুন্দবাবু বললেন, তা তোমাকে না বলে আমাকে বলে গেলে কী হতো? তুমি বাড়ির কর্তা না আমি বাড়ির কর্তা? আমাকে বলে গেলে কী ক্ষতিটা হতো?

মুকুন্দবাবু এরপর আর সেখানে দাঁড়ালেন না। রাগে-অভিমানে-ক্ষোভে গজগজ করতে-করতে আবার নিজের ঘরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন।

হরবিলাস তখনও হুকুমের অপেক্ষায় একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে নজর পড়তেই বললেন, তা তুমি আবার ঠুঁটো জগন্নাথের মতো এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন? যাও তুমি কাজ করো গিয়ে।

—আজ্ঞে, আপনি আদেশ না দিলে ··

আমি? আমি আদেশ না দিলে তুমি এখানে হাত কোলে করে দাঁড়িয়ে থাকবে? কিন্তু আমি কে? বলো আমি কে?

হরবিলাস কোনও জবাব না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মুকুন্দবাবু গলাটা উঁচু করে বললেন, কথার জবাব দিচ্ছ না কেন?

তোমার কান কি কালা হয়ে গেল নাকি? বলো, আমি কে?

হরবিলাস বললে, আজ্ঞে, আপনিই তো এ-বাড়ির কর্তা। আপনার আদেশ না পেলে···

—না-না-না, আমি এ-বাড়ির কেউ নই। আমি এককালে এ-বাড়ির কর্তা ছিলুম, কিন্তু এখন আমি বুড়ো হয়ে গেছি, এখন আমি আর এ-বাড়ির কর্তা নই। তুমি তোমার মা-ঠাকরুণের কাছে যাও, এ-বাড়ির কর্তা এখন মা-ঠাকরুণ। তাঁর হুকুমেই এ-বাড়ির কাজ-কর্ম চলবে। আমি কেউ নই···যাও তুমি এখান থেকে, চলে যাও—

বলে মুকুন্দবাবু পাশ ফিরে অন্য দিকে মুখ ফিরে শুলেন।

হরবিলাস তখন আর কী করবে বুঝতে পারলে না। অনেকক্ষণ সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যখন দেখলে যে কর্তামশাই-এর তরফ থেকে কোনও সাড়া-শব্দ নেই তখন ভেতর বাড়িতে গেল।

চণ্ডীমণ্ডপের পাশ দিয়ে ভেতরে গেলেই উঠোন। উঠোনের মধ্যেই কুয়ো। সেই কুয়োর পাশে দাঁড়িয়ে তখন রাধু ঝি জল তুলছিল। তার পশ্চিম দিকে গোয়াল। গোয়ালের সব গরুদের নিয়ে রাখাল তখন চরাতে যাচ্ছে।

হরবিলাস উঠোনে গিয়ে ডাকলে, মা-ঠাকরুণ—

রাধু হরবিলাসকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলে, কাকে ডাকছো বিশ্বাসমশাই—

হরবিলাস বললে, মা-ঠাকরুণকে একবার আমার পেন্নাম দাও তো রাধু—

উত্তর দিকে রান্না-বাড়ি। রান্না-বাড়ির মাথার ওপর একটা কলকে ফুলের গাছ। গাছের ডালে একটা খাঁচা ঝুলছে। খাঁচার পাখিটা সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করতে আরম্ভ করলো—ও মা-ঠাকরুণ, মা-ঠাকরুণ—

ডাক শুনেই মা-ঠাকরুণ বেরিয়ে এলেন।

বললে, কী খবর হরবিলাস, কী বলছো? আমাকে ডাকছিলে?

হরবিলাস হাত দুটো নমস্কারের ভঙ্গী করে বললে, মা-ঠাকরুণ, আমি কর্তার কাছে কাজের আদেশ চাইতে গিয়েছিলাম, তা তিনি বললেন তিনি বাড়ির কর্তা নন, ছোটবাবুর কাছে যেতে বললেন। কিন্তু

ছোটবাবু তো বাড়িতে নেই। তিনি মা-ঠাকরুণের কাছে যেতে বললেন, তাই আমি আপনার কাছে কাজের আদেশ চাইতে এসেছি।

সব শুনে মা-ঠাকরুণ বললেন, না-না, উনিই বাড়ির কর্তা। আমি কেউ নই। তুমি কর্তার কাছেই যাও। উনি রাগ করে ও-কথা বলেছেন।

—না মা-ঠাকরুণ, উনি পাশ ফিরে মুখ ঘুরিয়ে শুলেন, আমার কথা শুনতে চাইলেন না।

সমস্ত আবহাওয়াটা যেন তখন বিষাক্ত হয়ে গিয়েছে।

হরবিলাস কী আর করবে, সে তখন নিজের বুদ্ধিমতো সোজা বিলের ধারের মাঠেই গিয়ে ক্ষেত-চাষীদের কাজ-কর্ম তদারক করতে লাগলো। বুঝতে পারলে, কর্তামশাই ছেলের ওপর রাগ করেই হরবিলাসের সঙ্গে এমন অসংগত ব্যবহার করলেন।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সে তখনও বাড়ি আসবার নাম করলে না। কোথায় মুচিপাড়ায় কার কলেরা হয়েছে সেইটেই তার বড়ো হলো। অথচ বাড়িতে যে এতগুলো লোক তার জন্যে ভাবছে সেদিকে তার জ্ঞান নেই।

কিন্তু মুকুন্দবাবুরও তো বয়েস হচ্ছে।

আগে তিনি ভাবতেন ছোটবেলায় সকলেই একটু বার-মুখী হয়। তখন সব ছেলেদেরই টান থাকে বাইরের দিকে। বাড়ির দিকে ততো মন দেয় না কেউই। তারপরে একটু বয়েস হলেই তারা আবার ঘরমুখী হয়ে যায়। তিনি ভেবেছিলেন দেবুরও তাই হবে।

কিন্তু না, উল্টোটা হলো।

দেবু যেন দিন-দিন ঘর থেকে বাইরের দিকেই মন দিচ্ছে বেশি। কোথায় কার অভাব, কে টাকা-পয়সার অভাবে সংসার চালাতে পারছে না, কার অসুখ-বিসুখ হয়েছে, সেই চিন্তাতেই সে বেশি সময় দেয়।

মুকুন্দবাবু একদিন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সারাদিন কোথায় থাকো?

দেবব্রত প্রথমে কোনও জবাব দেয়নি। নিজের ঘরের দিকেই চলে যাচ্ছিল।

কিন্তু মুকুন্দবাবু অতো সহজে তাকে ছাড়লেন না।

জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো কথার জবাব দিচ্ছ না যে ?

দেবব্রত বললে, অনেক কাজ ছিল—

কিন্তু মুকুন্দবাবু ছেলের ওই সংক্ষিপ্ত জবাবে খুশী হলেন না।

বললেন, দাঁড়াও, কোথায় যাচ্ছো। আমার কথার জবাব দিয়ে যাও।

দেবু একটু দাঁড়ালো। বললে, বলছি তো আমার অনেক কাজ ছিল।

মুকুন্দবাবু ছেলের সেই ছোট জবাবে খুশী হলেন না। বললেন, কাজ তো সকলেরই থাকে। আমারও আছে। তাহলে কাজের ছুতোয় কি আমি বাড়ি ছেড়ে বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়াই ? সারাদিন কোথায় তুমি ঘোর ?

দেবু সেদিন একটা কড়া জবাব দিয়েছিল। বলেছিল, বাইরেটাও তো ঘর।

মুকুন্দবাবু ছেলের কথাটা বুঝতে পারলেন না। বললেন, তার মানে ? তার মানেটা কী ? বাইরেও তোমার ঘর, মানে ?

দেবু বললে, আমি বাইরের লোকদের, দেশের লোকদের, সমাজের লোকদের পর মনে করি নে।

এই জবাবটার মানেও বুঝতে পারলেন না মুকুন্দবাবু। তিনি তো সারা জীবনভোর ঘরকে ঘর মনে করেন, আর বাইরেটাকে বাইরে মনে করে আসছেন। এ ছেলে আবার এই নতুন কথাটা কোথা থেকে শিখলে ? বললে, তোমার কথাটা বুঝতে পারলুম না। একটু সোজা করে বলো।

দেবু বললে, আমি শক্ত কথা কিছু বলিনি। আমি বলতে চাই শরীরের সমস্ত অঙ্গ যদি সবল না হয় তাহলে শরীরকে সুস্থ থাকা বলা চলে না। আমার হাত দুটো দুর্বল রইল আর পা দুটো সবল রইল, তেমন অবস্থাকে কি শরীর ভালো থাকা বলে ? তেমনি আমরা ভদ্রলোকের পাড়ার মানুষরা বড়লোক রইলাম আর মুসলমান বা মুচি পাড়ার লোকরা খেতে-পরতে পেলো না, সেটা দেশের পক্ষে সুস্থতার লক্ষণ নয়। দেশের সকল মানুষের, সব জাত, সব সম্প্রদায়ের অবস্থা ভালো হলেই তবে দেশের পক্ষে ভালো। এইটেই আমি বিশ্বাস করি, এই শিক্ষাই আমি এতকাল পেয়ে এসেছি—

ছেলের কথা শুনে মুকুন্দবাবু স্তম্ভিত হয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন আর তাঁর হুঁশ রইল না যে তিনি কোথায় আছেন বা তিনি কে, কার সঙ্গে এতক্ষণ তিনি কথা কইলেন?

পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যার শেষ নেই আর সে-সংখ্যা দিন-দিন বেড়েই চলেছে। তাদের সকলের সমস্যারও শেষ নেই। হয়তো যতো রকমের মানুষ, ততো রকমের সমস্যা। এত সমস্যার সমাধান করবে এমন মহাপুরুষ আজো জন্মায়নি, হয়তো বা কোনও কালে জন্মাবেও না। কিন্তু সেদিন মুকুন্দবাবুর মনে হয়েছিল তাঁর মতো সমস্যা বুঝি পৃথিবীর কোনও মানুষের নেই। সেইদিন থেকেই সংসারে থেকেও তিনি সংসারত্যাগী হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কীসের অভাব? একদিন তিনি ভেবেছিলেন সংসারে টাকা থাকলেই বুঝি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তাঁর তো পৈতৃক সম্পত্তি অঢেল। এমনকি বেয়াই-এর অগাধ সম্পত্তিও তিনি পেয়ে গেছেন। আর তাঁর ভাবনা কী? এখন এত টাকার মালিক হওয়ার পর তাঁর অধঃস্তন চতুর্দশ পুরুষ পরম নিশ্চিন্তে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে! তাতে তাঁর কোনও দুশ্চিন্তা ছিল না। বিশেষ করে যখন তাঁর একটি মাত্র সন্তান। একটি মেয়ে পর্যন্ত নেই যে তার বিয়েতে গোছা-গোছা টাকা বরবাদ হয়ে যাবে।

এই সব কথা ভেবেই তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। তারপর তাঁর একমাত্র ছেলে যখন আবার লেখাপড়ায় রত্ন হলো, প্রত্যেক বছর পরীক্ষায় প্রথম হতে লাগলো, স্বাস্থ্যের দিক থেকেও যে পাড়ার গৌরব হয়ে উঠলো, বেণীমাধব মাস্টারও যখন তাঁর ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উজ্জ্বল আস্থার কথা জানালেন, এমন কি 'চরিত্র-গঠন-শিবিরে'র সুলতান আহ্‌মেদ সাহেবও যখন তাঁর ছেলেকে মানুষ হিসেবে উচ্চ সার্টিফিকেট দিলেন, তখন আর তাঁর নিজের ছেলের সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই রইলো না। নিজেকে তিনি ভাগ্যবান পিতা হিসেবে গর্ববোধ করতে লাগলেন।

কিন্তু যতোই তাঁর ছেলে বড়ো হতে লাগলো, আর নিজের বয়েস যতো বাড়তে লাগলো, ততোই তিনি হতাশাগ্রস্ত হতে লাগলেন, ছেলে যখন ডাক্তার হতে চাইলো না, ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইলো না, চার্টার্ড

এ্যাকাউন্‌টেন্ট্‌ হতে চাইলো না, এমন কি ব্যারিস্টার হতেও চাইলো না, তখন তাঁর মনে হলো সব কিছু থেকেও তিনি সর্বহারা।

মাঝে-মাঝে গৃহিণীর সঙ্গে আলোচনা করতেন দেবুকে নিয়ে।

বলতেন, আমার ছেলে যে শেষজীবনে আমাকে এমন করে কষ্ট দেবে তা আমি ভাবতেও পারিনি। ওর জন্যে ভেবে-ভেবে রাত্তিরে আমার ভালো করে ঘুমও হয় না।

গৃহিণী সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, তুমি অতো ভাবো কেন? আমরা তো জীবনে কখনও কারো ক্ষতি করিনি। ভগবান আমাদের কেন কষ্ট দেবেন?

মুকুন্দবাবু বলতেন্‌, এত পুজো, এত মানত, এত সৎ পথে থেকে ভগবান আমাদের কী ভালোটা করলেন? দশটা নয়, বারোটা নয়, একটা মাত্র ছেলে, সেই তার এই দশা। একটা তরকারি দিয়ে খাওয়া, তাও যদি নুনে পোড়া হয়, তাহলে মনে কী রকম কষ্ট হয় বলো তো? তাহলে কার জন্যে সংসার করা? এই রকমই যদি চলে তো শেষকালে কার ওপর ভরসা করে আমি চলে যাবো?

গৃহিণী স্বামীর এ-সব কথার উত্তর দিতেন না। তিনি জানতেন এসব ব্যাপারে ভেবে কোনও লাভ নেই। তবু তিনি ভাবতেন। তবে পাঁচটা কাজের মধ্যে সমস্ত দিন ব্যস্ত থেকে ছেলের কথা আর মনে উদয় হতো না। আর উদয় হলেও তাকে আমল দিতেন না। নিজের মনেই তিনি ইষ্ট-দেবতাকে ডাকতেন। বলতেন, মা, তুমি আমার খোকাকে দেখো, তার যেন ভালো হয়।

তা যে মানুষ একদিন শ্মশানেশ্বরীর মাথায় হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে যে দেশের ভালোর জন্যে সে প্রাণ দেবে, তার ভালো কোন দেবতা করবে? তার জীবন তো মানুষের কল্যাণের জন্যে বলি-প্রদত্ত। সে তো প্রতিজ্ঞা করেছে, "আমি মায়ের কাছে বলিপ্রদত্ত। আমি আমার জীবন দেশের কল্যাণের জন্যে বলিদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রইলাম। দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে আমি সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকবো। বন্দে মাতরম্‌।"

এই জন্যেই আগে বলেছি যে তাকে তৈরি করবার সময় বিধাতা—

পুরুষ বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। নইলে সবাইকে সৃষ্টি করবার সময়ে একই ছাঁচে না গড়ে দেবব্রতকেই বা অন্য ছাঁচে গড়তে গেলেন কেন ?

এ-প্রশ্নের উত্তর কেউ কোনও দিনই দিতে পারেনি। বিশ্ব-সংসারে এখনও এ-প্রশ্ন আগেকার মতোই অনুত্তরিত রয়ে গেছে।

সত্যিই তো, কোটি-কোটি সংসারী মানুষের মধ্যে কেনই বা একজন মানুষ অনন্য হয়, একজন মানুষ অসাধারণ হয়, একজন মানুষ দল-ছাড়া হয়, একজন মানুষ সংসার-বৈরাগী হয়, একজন মানুষ ব্যতিক্রম হয়ে, অমর হয়ে সব মানবজাতির উদাহরণ হয়ে যায়।

দেবব্রত তো তাও হলো না। সবাই তো তাকে ভুলেও গেল। বিশ্ব-সংসারের মানুষ তো তাদের স্মৃতির জগৎ থেকে তাকে নির্বাসিতই করে দিল চিরকালের মতো। অথচ এমন তো হওয়ার কথা ছিল না।

সেদিনও সবাই পড়তে এসেছিল দেবব্রতর কাছে।

কেদার এসেছিল, ললিত এসেছিল, মিনতি এসেছিল, শম্ভু এসেছিল, হাসনু এসেছিল, কমলা এসেছিল, সাহাবুদ্দীন এসেছিল। যেমন সবাই রোজ আসতো তেমনিই এসেছিল। সেই সময়েই সবাই আসতো, দেবব্রতর কাছ থেকে ক্লাশের পড়া জেনে নিতে আসতো নিয়ম করে।

কিন্তু এসে শুনলো দেবব্রতবাবু বাড়িতে নেই।

—কোথায় গেছে ?

—মুচিপাড়ায়।

রাধু ঝি দেবব্রতবাবুদের বাড়ির পুরনো কাজের লোক, অন্যদিন দেবব্রতবাবু বাড়িতে থাকেন। কারোর জলতেষ্টা পেলে ওই রাধুই কুয়ো থেকে খাবার জল তুলে দেয়।

আবার ছাত্র-ছাত্রীরা কেউ-কেউ আসবার সময়ে বাগানের আম নিয়ে এসে দেবব্রতবাবুকে উপহার দেয়। বলে, এই আম খাবেন মাস্টারমশাই, আমাদের বাগানের গাছের আম।

শুধু আম বা কাঁঠাল বা শাক-সবজীই নয়, অনেকে আবার পুকুরের মাছও পাঠিয়ে দেয় বাড়িতে।

আবার কেউ-কেউ পূজো বা ঈদের সময় মিষ্টিও দিয়ে যায় বাড়িতে। দেবব্রত অনেক সময়ে জানতেও পারে না কে কোন্ জিনিসটা পাঠিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ খেতে বসে জিজ্ঞেস করে মা'কে—এটা কি তুমি রেঁধেছ মা? এ পটলের তরকারিটা? খেতে খুব ভালো হয়েছে তো!

মা বলে, না রে, ওটা মিনতি দিয়ে গেছে! ওদের ক্ষেতের পটল। মিনতি বলে গিয়েছিল ওর মা রান্না করেছে, তাই তোকে খেতে পাঠিয়েছে।

দেবব্রত রাগ করে, বলে, কেন এ-সব জিনিস তুমি নাও বলো তো মা? আমি তো ও-সব নেওয়া পছন্দ করি না। ওরা কি ধার শোধ করতে চাইছে?

—ধার শোধ করার কথা বলছিস কেন? কীসের ধার?

দেবব্রত বলে, আমি ওদের পড়িয়ে টাকা নিই না বলে এইভাবে জিনিস-পত্র দিয়ে শোধ-বোধ করতে চাইছে। আমি ওদের পড়িয়ে টাকা নিই নে কেন? টাকা নিই নে এই জন্যে যে আমি দেখেছি ওদের মধ্যে প্রতিভা আছে। আমি সাহায্য করলে হয়তো ওদের মধ্যে কেউ-না-কেউ সত্যিকারের মানুষ হতে পারবে। বিদ্যে দান করে টাকা নিতে নেই, তা জানো না?

মা বলে, তোর মনে এত প্যাঁচ?

দেবব্রত বলে, প্যাঁচ নয় মা। সমস্ত দেশে যা কিছু সর্বনাশ হচ্ছে তার পেছনে রয়েছে এই টাকার ষড়যন্ত্র। আমি এর বিরুদ্ধে লড়তে চাইছি, আর তোমরা সবাই এই ষড়যন্ত্রে তাদের সাহায্য করছো। তার জন্যেই আমার আপত্তি, নইলে আর কিছু নয়।

মা বলে, তা কেন হবে? ওদের ক্ষেতে নতুন পটল উঠেছে তাই দিয়েছে। ওরা অতো কিছু ভেবে-চিন্তে দেয়নি।

দেবব্রত বলে, না দিলেই ভালো।

আর শুধু মিনতি বা কমলা বা কেদার, শম্ভু, সাহাবুদ্দীন নয়, সকলের সঙ্গেই দেবব্রতর এই একই সম্পর্ক। যারা শিক্ষা দেবে বা যারা শিক্ষা গ্রহণ করবে, তাদের দু'দলের মধ্যেই একটা সৌহার্দ্যের সম্পর্ক থাকলে তবেই দু'পক্ষের ভালো হয়। আর যেখানেই লেনদেনের সম্পর্ক থাকে সেখানে একটা বাণিজ্যের গন্ধ থাকে বলে পরিণামে সর্বনাশ ডেকে আনে।

সেদিনও একে-একে সবাই এসেছিল।

সবাইয়েরই এক প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের জবাব পেয়েও যখন কোনও সমাধানের সূত্র পাওয়া গেল না, তখন তারা আর কী করবে? রোজ-রোজ তো এমন হয় না। মানুষের জীবনে এ-রকম হঠাৎ জরুরী কাজ পড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

সবাই আস্তে-আস্তে বাড়ির দিকে পা বাড়াতে লাগলো। সোম, বুধ আর শুক্রবারই শুধু এই রকম পড়ান দেবব্রতবাবু। সেদিন বুধবার, বুধবার যদি নষ্ট হয়ও তো আসছে শুক্রবার এলেই হয়।

সবাই চলে গেলেও শেষ পর্যন্ত রয়ে গেল মিনতি।

মিনতি বললে, তোমরা যাও, আমার বাড়ি বেশি দূরে নয়, আমি আরো কিছুক্ষণ মাস্টারমশাই-এর জন্যে অপেক্ষা করি।

সবাই চলে গেল।

সংসারের কাজ করতে মা এদিকে এসেছিলেন। মিনতিকে একলা বসে থাকতে দেখে ভেতরে ঢুকলেন। বললেন, কী মা, তুমি এখনও বসে আছো? আর কতোক্ষণ অপেক্ষা করবে দেবুর জন্যে?

মিনতি বললে, আমি আরো কিছুক্ষণ দেখি।

মা বললেন, কিন্তু রাধু তোমাকে কিছু বলেনি?

মিনতি বললে, বলেছে, তবু বসে আছি যদি এর মধ্যে তিনি এসে পড়েন।

মা বললেন, সে কাল রাত্তিরে চলে গেছে। যাওয়ার সময়ে বলে গেছে মুচিপাড়ায় কার নাকি কলেরা হয়েছে। কাল বাড়িতে খায়ওনি পর্যন্ত। আজ এখনও সে এলো না। তুমি আর কতোক্ষণ বসে

থাকবে মা ?

মিনতি বললে, বাড়িতে গিয়েও তো সেই বসেই থাকবো. তার চেয়ে এখানেই না হয় বসে থাকি।

মা বললেন, এত রাত হয়ে গেল, তুমি একলা-একলা বাড়ি ফিরবে কী করে ?

মিনতি বললে, বাবাকে বলা আছে, পড়ানোর পর বাবা আমাদের ঝি'কে পাঠিয়ে দেবেন আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

বলতে-বলতে হঠাৎ দেবব্রত আর সাহাবুদ্দীন ঘরে ঢুকলো।

তাদের দেখে মিনতি যেমন অবাক হয়ে গেছে, মা'ও তেমনি।

মা দেবুর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে, কী রে, সারারাত-সারাদিন কোথায় ছিলি ?

সাহাবুদ্দীন বললে, মাস্টারজীকে রাস্তায় আসতে দেখে আমি তাঁর সঙ্গে চলে এলুম।

মা বললে, বেশ করেছ বাবা।

দেবব্রত বললে, মা, পরাণকে বাঁচাতে পারলুম না। ক্ষিধের মুখে যা পেয়েছে তাই খেয়েছে। শুধু পরাণ নয়, আরো কয়েক জন মরবে, আমি দেখে এলুম।

—তা এত দেরি করলি কেন ? আর এদিকে তোর বাবাও ভাবছে, আর আমিও ভাবছি।

দেবু বললে, ওদের পাড়া কি এখেনে ? এমন একটা লোক কেউ নেই যে তোমাদের খবর দেব। তারপর ডিস্‌ট্রিক্ট্‌ বোর্ডের অফিসে গিয়ে আবার ব্লিচিং পাউডার আনিয়ে সব জায়গায় ছড়িয়ে দিলাম। চারদিকে মাছি ভন্‌-ভন্‌ করছে। গরু-ছাগল-মুরগী-ছেলে-মেয়ে সব একঘরে মানুষ হচ্ছে। এদের কলেরা হবে না তো কার হবে।

মা জিজ্ঞেস করলে, আর খাওয়া ? কী খেলি ?

দেবু বললে, খাবো আবার কী, ওরা মরছে রোগে ভুগে আর আমি তাদের ওই অবস্থায় ফেলে রেখে খাবো ? তাদের জীবনটা বড়ো হলো না আমার খাওয়াটা বড়ো ?

মা বললে, তাহলে ঘুম ?

দেবু বললে, কখন ঘুমোব ? সারাদিনটা তো শ্মশানেই কেটে গেল মড়া পোড়াতে গিয়ে !

মা বললে, এই করে করেই তুই নিজের শরীরটা নষ্ট করবি দেখছি। সারারাত-সারাদিন ঘুম নেই, খাওয়া নেই।

দেবু বললে, আমি আজ আর পড়াবো না তোমাদের। তোমাদের খুবই সময় নষ্ট হলো।

মিনতি বললে, তাতে আর কী হয়েছে, আগে তো আপনার শরীর।

দেবু বললে, এখন তোমরা বাড়ি যাবে কী করে ?

মিনতি বললে, আমার বাড়ি থেকে বাবা আসবে কিংবা ঝি, কেউ-না-কেউ আসবেই।

দেবু বললে, সে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে।

মিনতি বললে, না হয় আমি ততক্ষণ এখানেই বসে অপেক্ষা করবো।

সাহাবুদ্দীন বললে, চলো না, আমি তোমাকে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি—

দেবু বললে, আচ্ছা চলো, আমি তোমাকে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি—

বলে তখনই যেতে তৈরি হতে যাচ্ছিল। মা বললে, সে কী রে ? তুই সারারাত-সারাদিন না ঘুমিয়ে না খেয়ে আছিস, এখনি আবার বেরোবি ? তুই যে মারা পড়বি রে—

মিনতি বললে, হ্যাঁ, মাসিমা তো ঠিকই বলেছেন, আমার বাড়ি থেকে তো লোক আসবে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, আপনি কেন কষ্ট করবেন ?

সাহাবুদ্দীন বললে, না-না, আমি মিনতিকে নিয়ে যেতে পারি। আপনি কষ্ট করবেন না।

কিন্তু দেবব্রত তার নিজের সিদ্ধান্তে অটল। সে তার কর্তব্য করবেই। দেবব্রতকে সারা জীবনে কেউ কর্তব্যভ্রষ্ট করতে পারেনি। কেউ তাকে তার নিজের পথ থেকে বিপথে নিয়ে যেতে পারেনি। তার নিজের বাবা-মা'ই তার পথ থেকে তাকে বিচ্যুত করতে পারেননি, তা অন্য লোকের আর কথা কী।

মিনতির দিকে চেয়ে বললে, চলো, আমি তোমার বাড়িতে তোমাকে পৌঁছিয়ে দিই—

সাহাবুদ্দীন বললে, আমি তো যাচ্ছি মাস্টারজী, আপনি কেন আর কষ্ট করবেন ?

—না, আমিই যাবো, আমার কোনও কষ্ট হয় না এসব কাজে।

বলে চলতে আরম্ভ করলো। আগে-আগে মিনতি আর সাহাবুদ্দীনও চলতে লাগলো।

পেছনে মা দরজাটা বন্ধ করে ভেতর থেকে খিল দিয়ে দিলেন। চেঁচিয়ে ছেলেকে বললেন, দেরি করিসনি খোকা, তাড়াতাড়ি চলে আসিস।

১৯৪৭ সালের অনেক আগের কথা যারা জানে, তারাই কেবল বলতে পারে সে-সব কী দিনকাল ছিল। মানুষের চোখের সামনে তখন বড়ো বড়ো আদর্শ জ্বল-জ্বল করতো। সবচেয়ে বড়ো আদর্শ সামনে যিনি ছিলেন তাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর আশে-পাশে ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, গোখেল, তিলক, লাজপত রায়, গান্ধী, সুভাষ বোস, জে. এম্. সেনগুপ্ত। তাঁদের লেখা বই পড়ে যারা সাহস পেতো, আশা পেতো, আনন্দ পেতো, তারা আবার দেশের, গ্রামের, সমাজের ছেলে-মেয়েদের সেই সব জিনিস শেখাতে চাইতো। তারা চাইতো যে দেশের সমস্ত ছেলে-মেয়েরা যেন ওই সব আদর্শ মহাপুরুষদের লেখা বই থেকে ভালো ভালো উপদেশ শিখে নেয়। সেই সব আদর্শ সামনে রেখে তারা জীবন পরিচালনা করতে চেষ্টা করে।

যতক্ষণ তারা দেবব্রতর কাছে থাকতো, ততক্ষণ সেই একই কথা, সেই একই উপদেশ, সেই একই শিক্ষা। দেবব্রত বলতো, তোমরা ডায়েরী লিখছো তো রোজ ? ডায়েরী লিখলে তোমাদের সব কাজে নিয়মানুবর্তিতা শিখতে পারবে। যে মানুষ সব কাজ নিয়ম করে করে,

সে-ই মানুষের সমাজে মানুষ হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। প্রকৃতির দিকে তোমরা চেয়ে দেখ, দেখবে সেখানেও সব নিয়ম করে চলে। এই দেখ সূর্য, সূর্য ঠিক নিয়ম করে সকালে ওঠে বলেই পৃথিবীটা এখনও চলছে।

ছাত্ররা সবাই মাস্টারমশাই-এর কথা মন দিয়ে শুনতো বটে, কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষায় পাশ করা।

দেবব্রত সেটা বুঝতে পারতো। কিন্তু তবু তার মনে হতো যদি তাদের মধ্যে একজনও তার কথাগুলো মন দিয়ে নিজের জীবনে কাজে লাগায় তাহলেও তার পরিশ্রম সার্থক হবে।

দেবব্রত বলতো, দেখ একটা ফুলগাছে যতোগুলো কুঁড়ি হয়, তার সব কুঁড়িগুলোই কি ফুল হয়ে ফোটে? ফোটে না। কেন ফোটে না বলো তো? ফোটে না কেন?

ছাত্র-ছাত্রীরা কেউ তেমন ঠিক উত্তর দিতে পারতো না।

দেবব্রত এক-এক করে সকলকেই প্রশ্নটা করতো—বলো তো, ললিত, তুমি বলতে পারো কেন সব কুঁড়ি ফুল হয়ে ফোটে না?

—কমলা, তুমি?

কমলাও উত্তর দিতে পারতো না।

—সাহাবুদ্দীন, তুমি?

সাহাবুদ্দীন অনেকক্ষণ ভেবেও কোনও যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে পারতো না।

—আচ্ছা, মিনতি, তুমি? তুমি উত্তরটা দিতে পারবে?

প্রশ্নটা স্কুলের লেখাপড়ার বিষয়ভুক্ত নয়, তাই দেবব্রত বললে, যাক্ গে এ প্রশ্ন তো আর তোমাদের স্কুলের পরীক্ষায় আসবে না, তাই এ নিয়ে আর তোমাদের ভেবে সময় নষ্ট করতে হবে না। তোমরা এ প্রশ্নটা নিয়ে বাড়িতে গিয়ে ভেবো। যদি কোনও উত্তর ভেবে পাও, তো পরে আমাকে জানিও।

বলে আবার স্কুলের নিয়মিত পড়া পড়াতে শুরু করতো। এই-ই ছিল দেবব্রতর ছাত্র-ছাত্রী পড়ানোর রীতি। পাঠ্যবইয়ের অতিরিক্ত কিছু পড়ানো, কিছু ভাবানোই ছিল দেবব্রতর পড়ানোর বৈশিষ্ট্য।

সেদিন রাস্তায় যেতে-যেতে মিনতি হঠাৎ বলে উঠলো, মাস্টার-মশাই, আপনার সেদিনকার প্রশ্নটার উত্তর আমি ভেবে বার করেছি।

—পেয়েছ ? উত্তর পেয়েছ ?

—হ্যাঁ।

—বলো কী উত্তর ভেবে পেয়েছ ?

মিনতি বললে, সব কুঁড়ি ফুল হয় না এই জন্যে যে কুঁড়ি হচ্ছে প্রকৃতি-নির্ভর। কুঁড়ি প্রকৃতির শিকার হলেও কিছু-কিছু কুঁড়ি বিকৃতির শিকার হয়ে যায় বলে, সেগুলো ঠিকমতো ফুল হয়ে ফুটে উঠতে পারে না।

দেবব্রত মিনতির জবাব শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। বললে, বাঃ, তুমি কী করে এর উত্তরটা বলতে পারলে ? কেউ তোমাকে বলে দিয়েছে নাকি ? তোমার বাবাকে তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে নাকি ?

মিনতি বললে, না মাস্টারমশাই, আমি নিজেই মাথা খাটিয়ে উত্তরটা বার করেছি।

দেবব্রত সাহাবুদ্দীনকে লক্ষ্য করে বললে, দেখেছ সাহাবুদ্দীন, মিনতি কী চমৎকার উত্তরটা দিলে ! মিনতি এবার পরীক্ষাতে ফার্স্ট হবেই।

তারপর দেবব্রত নিজেই আবার বলতে লাগলো, আমরা যেমন সবাই মানুষ, তুমি-আমি-মিনতি, আমরা সবাই-ই তো মানুষ। আমাদের তিনজনেরই দু'টো করে হাত, দু'টো করে পা, দু'টো করে চোখ, কান আছে। মানুষের বিচার কিন্তু এই সব দিয়ে হবে না। দেখতে হবে কার বেশি মনুষ্যত্ব আছে। প্রকৃতির শিকার তো আমরা সবাই-ই। আমাদের মধ্যে আবার কেউ-কেউ বিকৃতিরও শিকার। কিন্তু আমরা কেউই সংস্কৃতির শিকার হতে পারিনি। পৃথিবীতে যারা সংস্কৃতির শিকার হতে পেরেছে, তারাই প্রকৃত অর্থে মানুষ। যারা একটা আদর্শের জন্যে আজীবন লড়াই করেছে, আদর্শের জন্যে দরকার হলে প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হয়নি, তারাই মানুষ। অসংখ্য কুঁড়ির মধ্যে তারাই শুধু ফুল হতে পেরেছে। বাকিরা সব কুঁড়ি। তারা একদিন শুকিয়ে মাটিতে ঝরে পড়ে হারিয়ে যাবে। বুঝলে ?

মিনতি চুপ করে কথাগুলো শুনছিল।

সাহাবুদ্দীন বললে, সেই ফুল কারা ?

দেবব্রত বললে, ইতিহাস খুঁজলেই তোমরা তাঁদের নাম পাবে। যেমন গ্রীসের মানুষ সোক্রেটিস, চায়নার মানুষ কন্‌ফুসিয়াস, ইণ্ডিয়ার মানুষ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, আরো অনেক ফুল আছে আমাদের দেশে। যেমন ধরো পাঞ্জাবের ভগৎ সিং শুকদেব, চন্দ্রশেখর আজাদ, আর ধরো আমাদের এই বাংলাদেশের বিনয়-বাদল-দীনেশ, যতীন দাস, সূর্য সেন, মেয়েদের মধ্যে প্রীতি ওয়াদেদার ··

কথা বলতে-বলতে দেবব্রত উত্তেজিত হয়ে উঠছিল।

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলো, ইতিহাস খুঁজলে তোমরা এমনি আরো অনেক লোকের নাম পাবে। মানুষ একদিন সকলের নামই ভুলে যাবে, কিন্তু ওই সব মানুষ অমর হয়ে থাকবেন।

কথাগুলো চলছিল তখন রাস্তায় যেতে-যেতে।

হঠাৎ দেখা গেল উল্‌টো দিক থেকে হেঁটে আসছেন পার্বতীবাবু। মিনতির বাবা পার্বতীচরণ ঘোষ।

—এই যে, আপনি আসছেন ? আমি মিনতিকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম—

হয় পার্বতীবাবু আর নয়তো তাঁদের বাড়ির ঝি, প্রতিদিন মিনতিকে নিতে আসে দেবব্রতদের বাড়ি থেকে।

পার্বতীবাবু বললেন, আজ যে এত তাড়াতাড়ি ?

দেবব্রত বললে, আজকে আমি এদের কাউকে পড়াতে পারিনি, তাই নিজেই মিনতিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছিলাম। অন্য সবাই আগেই চলে গেছে।

পার্বতীবাবু বললেন, কেন বাবা, তোমার শরীর খারাপ নাকি ?

—আজকে পরাণ মণ্ডল মারা গেল।

—কে পরাণ মণ্ডল ?

—মুচিপাড়ার পরাণ মণ্ডল। আমরা ওদের এমন গরীব করে রেখেছি যে ওরা জানেও না যে স্বাস্থ্য রক্ষের জন্যে কী করা উচিত, কী খাওয়া উচিত। আমরা ওদের লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা পর্যন্ত করিনি—

—মারা গেল কী করে ?

—কলেরাতে।

পার্বতীবাবু বললেন, ওরা যে-রকম নোংরা হয়ে থাকে, ওদের কলেরা হবে না তো কাদের কলেরা হবে বাবাজী? আমরা তো ওই জন্যেই ওদিকে মাড়াই না পর্যন্ত, উচিত শিক্ষাই হয়েছে ওদের।

—ওরা যে নোংরা, ওরা যে লেখাপড়া শেখেনি, তার জন্যে কি ওরাই দায়ী? আমরাও কি সমান দায়ী নই? এই আমরা যারা নিজেদের শিক্ষিত ভদ্রলোক বলি। গভর্মেন্টও ওদের দেখছে না, আমরাও ওদের দেখছি না, তাহলে কে ওদের দেখবে?

পার্বতীবাবু কম কথার লোক। কথাগুলো শুনে একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন, তুমি ঠিক কথাই বলেছ দেবু। আমাদের দৌলত-পুরে কি কোনও মানুষ আছে যে এ-সব কথা ভাববে! যারা ভাববার লোক ছিল তারা সবাই-ই বিদায় নিয়ে চলে গেছে।

—আমি ভাবছিলুম এবার আমিই ওদের ভার নেব। ওদের লেখাপড়া শেখাবো।

পার্বতীবাবু বললেন, তুমি উচিত কথাই বলেছ দেবু। আমি সেদিন মিনতির মা'কে তাই বলছিলুম যে, আমাদের এই দৌলতপুরে দেবুর মতো আর একটা ছেলে থাকলে, দেশের হাওয়া অন্যদিকে ঘুরে যেতো।

মিনতি কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললে, বাবা, মাস্টারমশাই কাল রাতে ঘুমোননি, খাননি, সেই অবস্থাতেই উনি চলে এসেছেন।

পার্বতীবাবু বলে উঠলেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক কথা। তুমি এবার বাড়ি যাও, আমি তো এসে গেছি, যাও বিশ্রাম করো গে যাও—

বলে মিনতিকে নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। সাহাবুদ্দীন তাদের সঙ্গে তার বাড়ির দিকে চলতে লাগলো।

যুগটা তখন সন্ধিকাল। ইণ্ডিয়ায় তখন একদিকে চলছে মহাত্মা গান্ধীর যুগ। অনেক দিন গান্ধীর কথায় দেশের লোক চরকা কেটেছে, খদ্দরের কাপড়-জামা পরলেই দেশে স্বাধীনতা আসবে, সে-কথা তারা বিশ্বাস করেছে। আর অন্যদিকে ?

অন্যদিকে তখন ছেলেরা বোমা-বন্দুকের ভরসায় গুপ্ত সমিতির সভ্য হয়েছে, আর বেছে-বেছে ইংরেজ কর্তাদের খুন করে বিদেশী রাজাকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।

ঢাকায় যেমন এফ. জে. লোম্যানকে খুন করা হয়েছে, তেমনি মেদিনীপুরের তিনজন ম্যাজিস্ট্রেটকেও পরপর খুন করা হয়েছে দেশকে স্বাধীন করবার তাগিদে। বাঙালীরা বিশ্বাস করে নিয়েছে যে, গান্ধীর দেখানো রাস্তায় দেশে কিছুতেই স্বাধীনতা আসবে না।

এরই মাঝখানে সুলতান আহ্মেদের মতোন লোকরা দেশের ছেলেদের চরিত্র-গঠনের প্রয়োজনীয়তা আর ব্রহ্মচর্যের ওপর আস্থা রেখে মানুষ গড়বার কাজে হাত লাগিয়েছে।

ঘটনাচক্রে দৌলতপুরের দেবব্রত এই শেষের দলের প্রভাবে পড়ে জীবনকে নতুন দিকে প্রবাহিত করবার চেষ্টা করে চলেছে। সে ভেবে দেখেছে মানুষের জীবনে ভোগের চেয়ে ত্যাগের মহিমাই বেশি কাম্য। সে আরো ভেবেছে তার একলার উন্নতির চেষ্টার চেয়ে সকলের উন্নতির চেষ্টাই দেশের পক্ষে মঙ্গলদায়ক। পাড়ার একজন মানুষের বাড়িতে আগুন লাগলে সকলের বাড়িতে আগুন লাগবার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং পাড়ার সকলে মিলে সেই একজনের বাড়ির আগুন নেভাবার দায়িত্ব নিতে হবে। যা সমষ্টির কল্যাণ করে, তাই-ই সকলের কাম্য হওয়া উচিত।

সেই সময়ে সুভাষ বোসই প্রথম বললেন, আমি বিদেশে গিয়ে দেখে এলুম যে শীঘ্রই যুদ্ধ আরম্ভ হতে চলেছে।

লোকে জিজ্ঞেস করল, কাদের সঙ্গে কাদের যুদ্ধ বাধবে ?

সুভাষ বোস বললেন, যাদের সঙ্গেই যাদের যুদ্ধ হোক, সেই যুদ্ধে ইংরেজরা জড়িয়ে পড়বে। আমাদের ভারতীয়দের উচিত সেই যুদ্ধের সুযোগ নেওয়া—

ওদিকে গান্ধী অহিংসা নীতির প্রবর্তক। তিনি বললেন, কারো বিপদের সুযোগ নিয়ে নিজেদের সুবিধে আদায় করাটা নৈতিকতার বিরোধী। তাতে আমার আস্থা নেই—

সেই বিবাদে কিছু লোক চলে গেল গান্ধীর দিকে আর কিছু লোক চলে এল সুভাষ বোসদের দলে। সংখ্যার দিক দিয়ে গান্ধীর দিকেই বেশি লোক সম্মতি দিলে। তারা চলে গেল গান্ধীর দিকে। কারণ সকলেই তাদের নিজেদের জীবনের নিরাপত্তা চায়। তারা শান্তির পক্ষপাতী। তারা বললে, গান্ধীর দলে থাকলে আমাদের কিছু হারাবার ভয় নেই, কোনো ঝুঁকি নেই। আমরা কিছু ত্যাগ না করেই স্বাধীনতা পেতে চাই।

কিন্তু সুভাষ বোসের বক্তব্য এই যে—কিছু না দিলে কিছু পাওয়া যায় না। সব দিলে সব পাওয়া যায়। আমরা যদি সেই যুদ্ধে আমাদের সর্বস্ব পণ করি, আমাদের নিজেদের বিলিয়ে দিই তো আমরা হয়তো মারা যাবো, কিন্তু দেশ তো থাকবে? তখনকার মানুষেরা তো স্বাধীন হবে। সেই আগামীকালে মানুষদের কথা ভেবেই এখন সেই যুদ্ধে ইংরেজদের বিপদের সুযোগ আমাদের নেওয়া উচিত—

গান্ধীর মত উল্‌টো। তিনি বললেন, দেশের স্বাধীনতা যদি আমরা চাই তো সেই শুভ কাজ সিদ্ধির জন্যে পথটাও শুভ হওয়া দরকার—

সুভাষ বোস বললেন, আমি সেকথা বিশ্বাস করি না। গীতাতেই আছে, "সর্বারম্ভাহি দোষেণ ধূমে অগ্নি যথাবৃতা।" আগুন জ্বাললেই চারদিক আলোময় হয়ে যায়। কিন্তু সেই আগুন জ্বালাতে গেলে শুরুতে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। তেমনি সব শুভ কাজের পেছনেই অশুভ লুকিয়ে থাকে। আমাদের দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্যে অশুভ পথের আশ্রয় নেওয়ার মধ্যেও তাই কোনও দোষ নেই। হিংসার পথ দিয়ে যদি স্বাধীনতা আসে তো সে-হিংসাতে দোষ কী?

এখন দেখার কথা, দেশের লোক কার কথা শুনবে? গান্ধীর কথা, না সুভাষ বোসের কথা?

যখন দেশের সব মানুষ এই নিয়ে তর্ক-বিতর্কে মশগুল তখন দেবব্রতর জীবনেও এক মহা দুর্যোগ নেমে এল।

মুকুন্দবাবু শেষের দিকে অসুস্থই হয়ে পড়েছিলেন। একে ছেলে ঠিক মনের মতো হয়নি, তার ওপর তিনি বুঝতে পারছিলেন যে তাঁরও পরমায়ু শেষ হয়ে আসছে।

গৃহিণী কাছে এলেই তিনি জিজ্ঞেস করতেন, খোকা কোথায়?

গৃহিণী বলতেন, ইস্কুলে গেছে।

তিনি কখনও শুনতেন ছেলে ইস্কুলে গেছে, আবার কখনও শুনতেন ছেলে তার 'চরিত্র-গঠন শিবির' সামলাতে গেছে। এই সব কাজ নিয়েই যদি সে ব্যস্ত থাকে তাহলে তাঁর ক্ষেত-খামার কে দেখে? একা হরবিলাসের ওপর ভার দিয়ে কী জমিদারি চলে? চলে না। মাঝখান থেকে যেটুকু সময় সে বাড়িতে থাকে, সেটুকু সময়েও সে ওই ছেলে-মেয়েদের পড়ানো নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আর নয়তো মুচিপাড়ায়, কুমোরপাড়ায় গিয়ে তাদের জ্ঞান দেয়। আরে তোকে জ্ঞান দেয় কে তার ঠিক নেই, তুই আবার ওদের জ্ঞান দিতে যাস! আর এদিকে বাপ যে অসুখে শুয়ে পড়ে আছে, সেদিকে তো তোর খেয়াল নেই। সে মানুষটা কেমন আছে তাও তো তুই একবার জিজ্ঞেস করতে আসিস নে। অনেক পাপ করলে তবে মানুষ এমন ছেলের বাপ হয়।

সেদিন হঠাৎ হৈ-চৈ পড়ে গেল দৌলতপুরে।

কৈলাশ খুড়ো খবরটা শুনেই দৌড়ে এল মুকুন্দবাবুর কাছে। বললে, শুনেছ মুকুন্দ, লড়াই বেধে গেছে—

—লড়াই? লড়াই মানে?

কৈলাশ খুড়ো পাড়ার মাতব্বর। বললে, সবাই বলছে পৃথিবীতে লড়াই বেধে গেছে।

মুকুন্দবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কার সঙ্গে কার লড়াই?

—শুনছি জার্মানির সঙ্গে ইংরেজদের।

—কেন? কেন লড়াই বাধলো?

—তা কি আমি জানি ছাই?

মুকুন্দবাবু সারা জীবনই লড়াই দেখে আসছেন, লড়াই-এর খবরে আগেকার মতো আর তেমন উদ্বেগ হয় না তখন। তখন রোজই একটা না একটা খুন-খারাপির খবর নিয়ে পাড়ার লোকেদের মধ্যে

উত্তেজনা হতো। তাঁর ছোটবেলায় একবার যুদ্ধ বেধেছিল জার্মানীর সঙ্গে ইংরেজদের। তখনকার কথা বেশি মনে নেই। বিশেষ করে যশোরের মতো জেলায়, দৌলতপুরের মতো গ্রামে কে আর তা নিয়ে মাথা ঘামাবে। কিন্তু তারই মধ্যে হাতের কাছের ঘটনাগুলো নিয়েই লোকে বেশি মাথা ঘামাতো।

কিন্তু এবার অন্য রকম। সবাই বলতে লাগলো এবার কলকাতায় নাকি জাপান বোমা ফেলতে পারে। গোলকও তাই লিখলো মুকুন্দবাবুকে।

মুকুন্দবাবু তাকে লিখেছিলেন, তুমি কলকাতার বাড়িতে তালাচাবি দিয়ে এখানে চলে এসো। এখানে বোমা পড়বার কোনও ভয় নেই।

কলকাতা শহর অনেক আন্দোলন দেখেছে। দেখতে কিছু আর তার বাকি নেই তখন। সেই ১৯২৮ সালে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে চৌত্রিশটা ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চড়ে বসলেন হাওড়া স্টেশনের সামনের রাস্তায়। তার সামনে দু'হাজার পুরুষ ভলান্টিয়ার, পাঁচশো মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা, ঘোড়ায় চড়া ভলান্টিয়ারের দল মিলিটারি পোশাক পরে বিউগ্‌ল বাজিয়ে মার্চ করতে করতে এগিয়ে চলেছে। আর ঘন-ঘন ধ্বনি উঠছে—বন্দেমাতরম্। দু'পাশের দোতলা-তিনতলা বাড়িগুলোঃ বারান্দা থেকে মেয়ে-পুরুষ সবাই ফুলের বৃষ্টি করছে। এ-সব দৃশ্য পরে আর কেউই দেখেনি। হয়ত আর কখনও কেউ দেখবেও না।

তারপরে সারা ইণ্ডিয়ায় আরো কতোবার কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছে। কতোবার হরতাল হয়েছে, কতোবার কতো ইংরেজ খুন হয়েছে। সাহেব খুন করার অপরাধে কতোবার কতো লোকের ফাঁসি হয়েছে, তার হিসেব কারো কাছেই নেই। কিন্তু সেই যুদ্ধের সময়ে সব কিছু যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেল। দেশের যারা নেতা তাদের সবাইকে জেলে পুরে রাখা হলো। কলকাতা শহরে 'এ. আর. পি' 'সিভিক গার্ড' হিসেবে সব বেকার ছেলেরাও কেমন করে রাতারাতি সব চাকরি পেয়ে গেল। তাদের হাতে মাসে-মাসে হাত খরচের মোটা টাকা আসতে লাগলো ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে। তারা টাকা

হাতে পেয়ে কয়েক বছরের জন্যে বেঁচে গেল। তারা সবাই ভাবতে লাগলো যুদ্ধটা আরো যতোদিন চলে ততোই তাদের পক্ষে মঙ্গল।

তখন একদিন গুজব রটে গেল সুভাষ বোস নাকি জার্মানীর বার্লিন থেকে কথা বলেছেন।

কথাটা কেউ-কেউ বিশ্বাস করলেও বেশির ভাগ লোকই বিশ্বাস করলো না। সুভাষ বোসকে পুলিশের নজরবন্দী করেই রাখা হয়েছিল তাঁর নিজের বাড়িতে। দিনরাত অসুস্থ অবস্থাতেই সুভাষ বোস বাড়িতে থাকতেন শয্যাশায়ী হয়ে। কিন্তু তারই মধ্যে কী করে যে তিনি পালিয়ে বার্লিন চলে গেলেন সেইটেই ছিল রহস্যের বিষয়।

ঠিক সেই সময়েই গোলকেন্দু সরকার গোষ্ঠকে নিয়ে এসে হাজির হলো দৌলতপুরে।

মুকুন্দবাবু বললেন, খুব ভালো করেছ কলকাতা ছেড়ে এখানে এসে। শুনছি নাকি কলকাতার ওপর বোমা পড়তে পারে—

গোলকেন্দু বললে, হ্যাঁ, কলকাতাতেও সবাই তাই বলছে। সব লোক কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে গেছে, ইস্কুল-কলেজ সব এখন বন্ধ।

মুকুন্দবাবু বললেন, এখানে কোনও ভয় নেই। কলকাতার অনেক লোকই ঘরবাড়ি ছেড়ে এখানে পালিয়ে এসেছে।

গোলকেন্দু জিজ্ঞেস করলে, দেবুর কী খবর?

মুকুন্দবাবু বললেন, সে আগে যা করছিল এখনও তাই-ই করছে। আমার কথা তো সে শোনে না।

—এখন কোথায় সে? ক্ষেতে গেছে নাকি?

মুকুন্দবাবু বললেন, সে ক্ষেতে-খামারে যাবে? তুমি বলছো কী? সেই যদি জমি-জিরেত দেখবে তাহলে আমার এই দুর্দশা হবে কেন? আমি তো এখন সব সময়ে খালি শুয়েই থাকি, ওই হরবিলাস যা পারে তাই-ই করে। আমার কেউই নেই গোলক, বুড়ো বয়েসে যে আমার এই দশা হবে তা আগে কখনও কল্পনাই করতে পারিনি।

গোলকেন্দু বললে, এবার ওর একটা বিয়ে দিয়ে দিন দাদা, বৌদিরও তবু একটা সঙ্গী হবে। আপনাদের দু'জনেরই একটু সাহায্য হবে তাতে। বিয়ে হলে তখন মনটাও একটু ঘর-মুখো হবে।

—দেবু বিয়ে করবে? তবেই হয়েছে!

মুকুন্দবাবুর গলায় হতাশার স্বর বেরিয়ে এলো।

আবার বললেন, জানো গোলক, যখন দেবুর জন্ম হলো তখন সবাই বললে, আর ভয় নেই। এবার সরকারমশাই-এর সম্পত্তি দেখাশোনা করবার একজন লোক হলো। সেই ছেলে দাদামশাই-এর সম্পত্তিও দেখাশোনা করবে, আবার বাপের সম্পত্তিও দেখাশোনা করতে পারবে! কিন্তু এখন তারাই আবার অন্য জিনিস দেখছে।

গোলকেন্দু বললে, কিন্তু আমার কাছে তো দেবু কলকাতায় ছোটবেলা থেকেই যায়, আমি তো সে-রকম কিছু দেখিনি। আমার তো মনে হয়েছে ও একজন আদর্শ ছেলে!

মুকুন্দবাবু বললেন, আমি জানি ও পরোপকারী, ধর্মভীরু। কোনও রকম নেশা-টেসা করে না। কিন্তু বাপ-মা তাদের ছেলের কাছ থেকে কী চায়? তারা তো চায় যে ছেলে তাদের অত কষ্টে গড়ে তোলা সংসারটা দেখুক। বাপ মা'রা তো চায় তাদের বংশধারাটা বজায় থাকুক।

গোলকেন্দু বললে, সত্যিই তো, ওর বিয়ে দিচ্ছেন না কেন?

—বিয়ে? বিয়ের নাম শুনলেই ও ক্ষেপে যায়! দুঃখের কথা আর কী-ই বা বলবো! তুমি বলে দেখ না, ও কী বলে? আমি বলে-বলে হার মেনে গেছি।

—ঠিক আছে, আমি সুযোগ বুঝে একদিন ওকে বলবো'খন।

সেই সুযোগেরই অপেক্ষা করতে লাগলো গোলকেন্দু। কিন্তু সে-সুযোগ কি অত সহজে আসে। দেবুর তো কথা বলবারই সময় নেই, এত তার কাজ!

আর তার কাজও কি একটা? কোথায় কোন পাড়ায় খাবার জল পাওয়া যাচ্ছে না, কোথায় কোন পাড়ায় কার অসুখ করেছে, টাকার অভাবে কার চিকিৎসা হচ্ছে না, কার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না উপযুক্ত পাত্রের অভাবে, সেই সব পরোপকারের দিকেই তার নজর পড়ে আছে। তারপর আছে হোমিওপ্যাথি ওষুধের দাতব্য-কর্ম।

স্কুলের শিক্ষকতার বিনিময়ে যে টাকাটা মাসে-মাসে তার হাতে আসে, সেটাও কোনও দিন তার বাড়িতে আসে না। বাবার তো টাকার

অভাব নেই। সুতরাং স্কুলের মাইনের টাকাটা বাড়তি টাকা। সেটা নিজের বাড়িতে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য নয়।

আগে যারা সন্ধ্যেবেলা পড়তে আসতো, তারা বড়ো হয়ে যাওয়ার পর তখন অন্য আর এক দল ছাত্র বেছে নিয়েছে সে। আর সারা ইণ্ডিয়া জুড়ে যুদ্ধের যে দুর্যোগ চলছে তাতে কে কোথায় কোন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে তার ঠিক নেই।

গোলকেন্দু সকালবেলা খবরের কাগজ খুলেই অবাক। যা সবাই ভেবেছিল তাই হয়েছে। তাড়াতাড়ি মুকুন্দবাবুর ঘরে এসে বললে, এই দেখ দাদা, আমি যা ভেবেছিলুম তা-ই হয়েছে। কলকাতার মাথার ওপর বোমা পড়েছে। কলকাতা থেকে সব লোক পালিয়েছে—

মুকুন্দবাবু খবরটা শুনে ভয় পেয়ে গেলেন।

বললেন, তাহলে কী হবে? এখানেও বোমা পড়বে নাকি? বোমা পড়লে আমরা কোথায় যাবো?

গোলকেন্দু বললে, কী আর হবে, দেশের মানুষই মরবে, দেশ তো আর মরতে পারে না, দেশ মরবেও না। দেশ তো থাকবেই, আর দেশ থাকলে আবার নতুন মানুষ জন্মাবে, তারাই চালাবে দেশ, তখন সেই মানুষরাই আবার দেশকে নতুন করে গড়বে।

সেদিন পার্বতীবাবু মুকুন্দবাবুর বাড়িতে এলেন।

তিনি গোলকেন্দুকে দেখে বললেন, আরে তুমি কবে এলে?

গোলকেন্দু বললে, এই তো ক'মাস হলো এসেছি—

—কলকাতার কী খবর?

গোলকেন্দু বললে, কী আর খবর, কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছি।

—আর কলকাতার বাড়ি?

—সে বাড়িতে চাবি বন্ধ করে চলে এসেছি। এখন তো শুনছি কলকাতায় বোমা পড়েছে। এই ভয়েই তো কলকাতা থেকে সব লোক পালিয়ে গিয়েছে। আমি গোষ্ঠকে নিয়ে এখানে চলে এসেছি।

পার্বতীবাবু বললেন, আমিও এখন আর দৌলতপুরে থাকি না ভাই। ঢাকায় বদ্‌লি হয়ে গিয়েছি। একটা কাজে এদিকে এসেছিলুম আবার পরশু ফিরে যাবো।

গোলকেন্দু জিজ্ঞেস করলে, বাড়ির খবর কী ?

—খবর সবই ভালো। তবে মিনতিকে নিয়েই ভাবনা—

—কেন ? মিনতির কী হয়েছে ?

—মিনতিরও তো বয়েস হয়েছে।

গোলকেন্দু জিজ্ঞেস করলে, তার বিয়ে দিয়েছ ?

—বিয়ে দিলে কি তুমি খবর পেতে না, ভেবেছ ? আমার তো ওই একই মেয়ে। তার জন্যেই তো আমার যতো ভাবনা। বি-এ পরীক্ষায় ও ডিস্‌টিংশন পেয়েছে। এবার ভাবছি ওর বিয়েটা দিয়ে দেব, আর আমরা কবে আছি, কবে নেই—

তারপর মুকুন্দবাবুর দিকে চেয়ে পার্বতীবাবু বললেন, মুকুন্দবাবু, আপনি তো আমার মেয়েকে দেখেছেন। ও তো বহুদিন দেবুর কাছেই পড়তো। দেবুর সঙ্গে কি আমার মিনতির বিয়ে দেবেন ?

মুকুন্দবাবু শুয়ে ছিলেন। বললেন, আমার ছেলের সঙ্গে ?

পার্বতীবাবু বললেন, হ্যাঁ, বলতে গেলে দৌলতপুরে আমার আসারও ওই একটাই কারণ। আপনার ছেলে তো একটি রত্ন, আপনার ছেলের সঙ্গে যদি আমার মিনতির বিয়ে হয় তো মিনতিও ধন্য হয়ে যাবে, আমিও ধন্য হয়ে যাবো।

মুকুন্দবাবু বললেন, আপনি বলছেন কী পার্বতীবাবু! আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার দেবুর বিয়ে হলে তো আমিই ধন্য হয়ে যাবো। অমন সৌভাগ্য কি আমার হবে ?

—সে কী কথা! দেবু কত গুণী, আর আমার মেয়ে তো সাধারণ একটা মেয়ে। দেবুর মতোন তো কলেজে স্কলারশিপ পায়নি।

—মুকুন্দবাবু বললেন, আমার দেবু কি বিয়ে করবে ?

পার্বতীবাবু কথাটা বুঝতে পারলেন না। বললেন, তার মানে ?

মুকুন্দবাবু বললেন, তার মানে কি আপনি জানেন না ? সে কি সংসারের কিছু দেখে ? এই যে আমি অসুস্থ হয়ে শুয়ে পড়ে আছি সে কি একবারও আমার কাছে এসে খবর নেয় ?

এর জবাবে পার্বতীবাবু আর কী-ই বা বলবেন।

তবু বললেন, আমার মনে হয় দেবুর একটা আদর্শ আছে। ওর মনটা সব সময়ে সেই দিকেই ঝুঁকে থাকে, তাই বাড়ির অন্য কাজের দিকে তেমন মন দিতে পারে না।

—আদর্শ ? মুকুন্দবাবু ম্লান হাসি হাসলেন। বললেন, যে আদর্শ বাপ-মা'কে শ্রদ্ধা করতে শেখায় না, সেটা কোনও আদর্শই নয়।

পার্বতীবাবু বললেন, আমার তো মনে হয়, বিয়ে হয়ে গেলেই দেবু ঘর-সংসারের দিকে পুরো মনটা দেবে।

মুকুন্দবাবু একটা অবিশ্বাসের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন।

বললেন, সেটা হলে তো আমি বেঁচেই যাই। তা যদি হয় তো আমি আর কিছু চাই না।

পার্বতীবাবু বললেন, আমি আমার জীবনে এমন কতো লোককে দেখেছি বিয়ের আগে তারা এক-রকম ছিল, আর বিয়ের পরে একেবারে আমূল বদলে গেল।

মুকুন্দবাবু বললেন, দেবুর যদি তা-ই হয় তো তাতে আমিই সব চেয়ে খুশী হবো। আমি জীবনে তো জ্ঞানতঃ কারো কোনও ক্ষতি করিনি, কারো কোনও অমঙ্গল চিন্তাও করিনি। আমার কেন এমন হলো জানি না।

গোলকেন্দু এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। এবার বললে, ঠিক আছে, কথাটা আমিই পাড়বো দেবুর কাছে। আমার অনুরোধ নিশ্চয়ই এড়াতে পারবে না।

পার্বতীবাবু বললেন, তাই চেষ্টা করে দেখ তুমি গোলক। এ বিয়েটা যদি তুমি করিয়ে দিতে পারো তো, আমি চিরকালের মতো তোমার কাছে ঋণী হয়ে থাকবো।

গোলকেন্দু বললে, আরে দেবু তো আমার ভাইপো, আমি নিজেও

তো তার ভালো চাই। সে বিয়ে করে সংসারী হোক, এটা তো আমিও চাই।

পার্বতীবাবু বললেন, তা হলে আমায় কী দিতে-থুতে হবে, সেটাও আমাকে জানিয়ে দিও তুমি।

গোলকেন্দু বললে, সে-সব কথা পরে হবে, আগে দেবু তো বিয়ে করতেই রাজি হোক—

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই মুকুন্দবাবু বলে উঠলেন, আমি আগে থেকে বলে রাখছি, দেবু যদি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হয় তো শাঁখা-সিঁদুর ছাড়া আর একটা পয়সাও আমি নেব না—আমি কি আমার ছেলেকে বিক্রি করবো বলতে চান?

জিজ্ঞেস করলাম, তারপর?

সুপ্রভাত এমন করে দেবব্রতর জীবনের সব ব্যাপারগুলো জানে, তা আমার ধারণা ছিল না।

জিজ্ঞেস করলাম, শেষ পর্যন্ত তাদের বিয়েটা কি হলো?

সুপ্রভাত বললে, দেখ ভাই, আমাদের দেশে বিয়ে হতে এক মিনিটও লাগে না। শুধু সমস্যা থাকে দেনা-পাওনা নিয়ে। তার মানে বরপক্ষ কতো পণ চাইবে কন্যাপক্ষের কাছ থেকে, সেইটেই থাকে সমস্যা। এ-ক্ষেত্রে সেটা তো নেই। আরও একটা সমস্যা থাকে মেয়ে পছন্দ হওয়া নিয়ে। এ-ক্ষেত্রে তো সে-সমস্যাও নেই। কারণ বর-কনে দু'জনেই দু'জনকে দেখেছে, দু'জনেই দু'জনের অত্যন্ত পরিচিত ঘনিষ্ঠ। এ-বিয়েতে সে-সব ঝামেলাও তো নেই। শুধু সমস্যা হলো দেবব্রত বিয়ে করবে কি করবে না, তাই নিয়ে।

সেই সমস্যা সমাধানের ভার পড়লো গোলকেন্দুর ওপর।

কিন্তু দেবব্রতর মতো ব্যস্ত লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় পাওয়াটাই হলো বড় কথা।

দেবব্রতর কি একটা কাজ? যুদ্ধ বাধার দিন থেকে দেবব্রতর ব্যস্ততা যেন লাফিয়ে-লাফিয়ে বেড়ে গিয়েছিল। কোথায় কোন পাড়ায় কাদের কী অভাব-অভিযোগ, কোন পাড়ায় কার অসুখ-বিসুখ করলো, তার ওপর কলকাতায় বোমা পড়েছে। গান্ধীজী 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন আরম্ভ করে দিয়েছেন। সংসারে দেশের মঙ্গলের জন্যে যে-যা কিছু কাজ করেন, তা সমস্তই যেন দেবব্রতর কাজ। তার সমস্ত দায়িত্বটাই যেন দেবব্রতর একলার। যখন কলকাতার ওপরে জাপানের বোমা পড়লো তার ক্ষতিটাও যেন একলা দেবব্রতর ক্ষতি।

কৈলাশ খুড়ো একদিন রাস্তায় দেখা হওয়াতে জিজ্ঞেস করলেন, কলকাতায় বোমা পড়লে তোমার কী ক্ষতি দেবু? তোমার মাথায় তো বোমা পড়েনি—

দেবু বলতো, আমার মাথায় না-ই বা পড়লো, কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের মাথাতেই তো পড়েছে। তারাও তো মানুষ, তাদেরও তো মা-বাবা-ভাই-বোন সবাই আছে। তাদের ক্ষতি কি আমাদের সকলের ক্ষতি নয়?

এ যুক্তি কেউই বোঝে না। অথচ পাগল বলে যে তাকে উড়িয়ে দেবে, তাও কেউ পারে না।

সব সময়েই সকলের, যাদের কেউ নেই তাদেরও সে আপন-জন, আবার যাদের সবাই আছে তাদেরও সে পর নয়, আপন-জন। আসলে তার পক্ষে কিন্তু কেউ নেই। সে একলা। একেবারে একলা। সংসারী হয়েও সে একলা, একলা হয়েও সে সংসারী।

এ-রকম লোককে বিয়ে করতে রাজী করানো সোজা নয়।

গোলকেন্দু বললে, বিয়ে করতে তোমার আপত্তি কীসের?

দেবু বললে, বিয়ে করলেই তো আমার দায়িত্ব বাড়বে। বউ, ছেলে-মেয়ে তাদের দিকে মনোযোগ দিতে হবে, তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখতে হবে!

গোলকেন্দু বললে, তা-তো দিতেই হবে, সবাই তো তাই-ই করে।

দেবু বললে, কিন্তু কাকা, আমার তো অতো সময় নেই—

গোলকেন্দুবাবু বললেন, বিয়ে করতে আর সময়ের কী দরকার? আমরা তো সবাই-ই বিয়ে করেছি, তোমার বাবা বিয়ে করেছেন, তোমার ঠাকুর্দা বিয়ে করেছেন, তোমার দাদামশাইও বিয়ে করেছিলেন। বিয়ে তো সবাই-ই করে এসেছে, আবার পরেও সবাই-ই করবে।

দেবু বললে, কিন্তু সুভাষ বোসের নাম তো আপনি শুনেছেন, যিনি এখন ইণ্ডিয়ার বাইরে পালিয়ে গেছেন, তিনি কি বিয়ে করেছেন? আর স্বামী বিবেকানন্দর নামও তো আপনি···

গোলকেন্দু কথাটা শুনে একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

বললেন, তা তুমি কি সুভাষ বোস, না বিবেকানন্দ? তুমি সাধারণ গেরস্থ লোক। তুমি তাঁদের কথা তুলছো কেন?

দেবু বললে, তাঁদের কথা ছেড়ে দিলেও কতো সাধারণ লোক বিয়ে করেনি, তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন···

গোলকেন্দুবাবু বললেন, কিন্তু তুমি তো বাপের এক ছেলে। তুমি কি চাও তোমাদের বংশ লোপ পাক? আর তোমার মায়ের কথাটাও একবার ভাবো। তাঁরও তো বয়েস হচ্ছে, তাঁরও তো শেষ জীবনে একটা সহায়-সম্বল চাই। তাঁর অবর্তমানে এ-সংসারটার কী দশা হবে, সেটাও একবার কল্পনা করো—

তখনই বাইরে থেকে একটা ডাক এলো—দেবুদা, দেবুদা?

দেবব্রত ডাক শুনেই বাইরে গেল। দেখলে তারই দলের খোকন তাকে ডাকছে। জিজ্ঞেস করলে, কী রে, কী ব্যাপার?

খোকন গলা নিচু করে বললে, অবিনাশ ধরা পড়েছে—

—অবিনাশ? ধরা পড়েছে?

খোকন বললে, হ্যাঁ, রাত দেড়টার সময়ে পুলিশ তার বাড়িতে ঢুকে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে, তার বাড়িতে কাগজ-পত্র সব কিছু তছনছ করে আরো অনেকের নাম-ধাম পেয়ে গেছে। এই খবরটা দিতে এলাম তোমার কাছে। আমি চলি—

বলে খোকন চলে গেল। গোলকেন্দুবাবু তখনও ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়েছিলেন। দেবু আসতেই জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো? এত

সকালে কে এসেছিস তোমার কাছে ?

দেবু বললে, আমাদের ক্লাবের ছেলে। আমি এখুনি বেরিয়ে যাচ্ছি—আপনি কিছু মনে করবেন না কাকা, আমার আসতে একটু দেরি হবে।

জিজ্ঞেস করলাম, তারপর ?

সুপ্রভাত বললে, অতো তাড়াতাড়ি শেষ জানতে চাইছো কেন ? এখনও তো কাহিনী শুরুই হলো না, এখুনি শেষ জানতে চাইছো ? এখন তো সবে আরম্ভ—

কিন্তু আমার তখন আর তর সইছিল না।

বললাম, ওই ঝর্ণাদেবীর কথাটা তো বলছো না—

সুপ্রভাত বলতে-বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বললে, এক গেলাস জল আনতে বলো তোমার কাজের লোককে—

জলের জন্যে বাড়ির ভেতরে হুকুম দিলাম।

সুপ্রভাত বললে, ওই ঝর্ণাদেবী, 'আলতা মাসী' সবাই-ই আসবে। এখন তো সবে বীজ পোঁতা হলো, আগে গাছটা বড়ো হতে দাও, তবেই তো গাছের ডালে ফল ফলবে—

ততক্ষণে জল এসে গিয়েছিল। তার সঙ্গে মিষ্টিও এসেছিল।

সুপ্রভাত মিষ্টি মুখে দিয়ে বললে, মুখ তো মিষ্টি করালে, কিন্তু আমি যখন গল্প শেষ করবো, তখন তো গল্পটা তোমার তেতো লাগবে।

আমি বললাম, তেতো ? তেতো কেন ?

সুপ্রভাত বললে, মানুষের জীবনটাই তো তেতো।

—তেতো ? তেতো কেন ?

সুপ্রভাত বললে, কেন, তথাগত বুদ্ধদেবের জীবনের শেষটা তেতো

নয় ? শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের শেষটা তেতো নয় ? যীশুখ্রীষ্টের জীবনের শেষটা তেতো নয় ? মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ বোসের জীবনের শেষটা তেতো নয় ? যীশুখ্রীষ্টের জন্মের চারশো নিরানব্বই বছর আগের লোক সক্রেটিসের জীবনের শেষটা তেতো নয় ?

সুপ্রভাতের কথার যুক্তিতে আমাকে হার মানতে হলো।

বললাম, আমি সে অর্থে তেতো বলিনি। আমি বলেছি অন্য কারণে। আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে দেবব্রতর জীবনের কাহিনীটা যেন শেষ হয়। ট্রাজেডি হোক, কমেডি হোক, ক্ষতি নেই, কিন্তু গল্পটা যেন ঠিক মতো জায়গায় শেষ হয়। আজকালকার লেখকরা তো কেউ গল্প শেষ করতে জানে না।

সুপ্রভাতের জল খাওয়া তখন শেষ হয়ে গেছে।

বললে, ও-সব আমি জানি না। আমি তো লেখকও নই, পাঠকও নই, আমি নিজের চোখে যা দেখেছি তাই-ই তোমাকে বলছি। তাতে গল্প শেষ হোক আর না-হোক, আমার তাতে কোনও দায়-দায়িত্ব নেই। আমি গল্পটা তোমাকে বলেই শুধু খালাস !

বললাম, ঠিক আছে, এবার বলো তোমার দেবব্রতের জীবনের বাকিটা—শেষ পর্যন্ত দেবব্রত বিয়েটা করলে ?

সুপ্রভাত বললে, বাঙালীদের বিয়ে হতে তো দেরি হয় না। একবার যদি দু'পক্ষের বাপ-মা বিয়েতে মত দিয়ে দেয় তো সাধারণতঃ তা নিয়ে আর কোনও গোলমাল হয় না। বড়জোর বর নিজে একবার কনেকে নাম-মাত্র দেখে আসে। খুব বেশি যদি দরকার হয় তো দু'একটা প্রশ্নও করে। জিজ্ঞেস করে লেখাপড়া কতদূর হয়েছে, রান্না-বান্না জানে কি না, এই সব মামুলি প্রশ্ন—

সুপ্রভাত আবার বললে, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে মেয়ে দেখার প্রশ্নই তো আসেই না। কারণ পার্বতীবাবুও তার চেনা, আর মিনতিকেও তো দেবু বরাবর দেখে এসেছে। তাকে পড়িয়েছে, পাশও করিয়েছে। সে জন্যে মিনতির বাবার কাছ থেকে কোনও টাকা-পয়সাও সে নেয়নি। টাকা-পয়সা সে কোনও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকেই নেয়নি। তার জন্যে কিছু প্রাপ্তি-যোগই হয়নি তার। কোনও দিন তা সে আশাও

করেনি। পৃথিবীতে অনেকের জন্যেই দেবু অনেক কিছু করেছে, কিন্তু বিনিময়ে তার জন্যে কারো কাছে কোনও দিনই কি সে কিছু চেয়েছে ?

হয়তো তার এই গুণের জন্যেই পার্বতীবাবু তাঁর মেয়ে মিনতিকে দেবব্রতর সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। মানুষের আশার তো কখনও শেষ থাকে না।

মুকুন্দবাবু বললেন, আমার ভাই তো অনেকবার দেবুকে আপনার মেয়ের সম্বন্ধে বলতে গেছে, কিন্তু সে তো তার কোনও কথাই শোনেনি

তারপর একটু থেমে আবার বললেন, আপনি একটা কাজ করুন—

—কী কাজ ?

—আপনি নিজে একবার কথাটা দেবুকে বলে দেখুন না—

—কী বলবো ?

—বলুন যে আপনার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চান।

—পার্বতীবাবু বললেন, কথাটা আপনি বললে ভালো হয় না ?

মুকুন্দবাবু বললেন, আমি দেবুর বাবা, কথাটা আমি বললেই হয়তো ভালো হতো, কিন্তু আমার কথা কি ও শুনবে ?

— আপনার কথা যে শুনবে না, সে আমার কথা শুনবে ? আপনি তার বাবা, আর আমি কে ? আমি তো ওর পর।

—আমি তো বললুম আপনাকে যে ও আমার কথা শোনে না।

—তাহলে আপনার স্ত্রীকে দিয়ে বলান।

মুকুন্দবাবু বললেন, তার কথা ও আরো শুনবে না।

এর পরে আর কথা চলে না।

পার্বতীবাবু অনেক আশা করে এসেছিলেন। শেষে কি তাহলে তাঁকে হতাশ হয়ে খালি হাতে ফিরে যেতে হবে ?

অথচ তিনি এখানে আসবার সময়ে মিনতিকে বলে এসেছেন যে দেবব্রতকে তিনি যেমন করে হোক এ-বিয়েতে রাজি করিয়ে আসবেনই। খালি হাতে ফিরে গেলে সে-ই বা কী ভাববে ?

শেষকালে মিনতিকে সোজাসুজিই জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি তো যাচ্ছি, কিন্তু তোর কোনও আপত্তি নেই তো ? ভালো করে ভেবে দেখ।

এ-কথায় প্রথমে মিনতি জবাব দিতে একটু দ্বিধা করেছিল।

পার্বতীবাবু আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী রে, কথার জবাব দে—

অনেক পীড়াপীড়ির পর মিনতি বলেছিল, তুমি যা ভালো বুঝবে তাই করবে।

পার্বতীবাবু বলেছিলেন, কিন্তু তোর মনের কী ইচ্ছেটা তাই বল। আমি তাকে রাজী করিয়ে আসার পর যদি তুই রাজী না হোস্ তখন?

পার্বতীবাবুর স্ত্রী বেঁচে থাকলে এ নিয়ে অতো ভাবতে হতো না তাঁকে। মিনতির মা'ই সে কাজের ভারটা নিত। তাতে মিনতির কাছ থেকে কথা আদায় করতে পার্বতীবাবুর কোনও অসুবিধাও হতো না।

আর তা ছাড়া মিনতির বয়েসও হয়েছে। এ-ব্যাপারে তার মতামতেরও একটা মূল্য আছে।

মিনতি কথা বলতে গররাজী দেখে তাঁর মনে একটা সন্দেহও হলো। তবে কি তাঁর মেয়ের দেবুকে বিয়ে করতে অনিচ্ছা আছে?

মেয়েদের মন বোঝা নাকি দেবতাদেরও অসাধ্য। হয়তো তাই-ই হবে। কিন্তু এ-কাজ তিনি ছাড়া আর কে করবেন? করবার মতো আর তাঁর নিকট-আত্মীয়া কে আছে? এমন একজন আত্মীয়াও নেই যাঁকে দিয়ে তিনি এই কাজ করিয়ে নিতে পারেন।

আবার এও হতে পারে যে তাঁর মেয়ে হয়তো মনে-মনে অন্য কাউকে মনে ঠাঁই দিয়েছে। সে-কালের কথা আলাদা। এখন তো আর গৌরীদানের যুগ নেই। দেবব্রতর বাড়িতে ছাত্রীদের সঙ্গে অনেক ছাত্রও পড়তে আসতো। তাদের কারোর সঙ্গে হয়তো মন দেওয়া-নেওয়া হয়ে থাকতে পারে। সব কিছুই হওয়া সম্ভব এ-যুগে।

যদি সেকাল হতো তাহলে তিনি অল্প বয়েসেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। কিন্তু মিনতির লেখাপড়ার ঝোঁক দেখে তিনি সেই দিকে যেতে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন বরাবর। তিনি নিজেও একজন নারী-শিক্ষা এবং নারী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তাই যতোদূর মিনতিকে লেখাপড়া শেখানো সম্ভব ততোদিন তাকে পড়িয়েছেন।

কিন্তু বিয়েরও তো একটা বয়েস আছে। বয়োধর্মকে তিনি তো অস্বীকার করতে পারেন না। বয়েস তো একদিন সব মানুষকে তার ইচ্ছাধীন করবেই।

শেষকালে অনেক পীড়াপীড়ির পর মিনতি বলেছিল, আমি আর এ-ব্যাপারে কী বলবো, আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই-ই করবেন। আপনি তো আমার ভালোই চান, মঙ্গলই চান।

মিনতির মনে ছিল দেবব্রত সরকারের বলা কথাগুলো।

মাস্টারমশাই বহুদিন আগে তাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, বলো তো গাছের সব কুঁড়ি, ফুল হয়ে ওঠে না কেন ?

মিনতিরও মনে হয়েছিল কী করে সে নিজের জীবনকে কুঁড়ি থেকে ফুলে পরিণত করতে পারে, করতে পারে একমাত্র মাস্টারমশাই-এর মতো সত্যিকারের সৎ মানুষের সাহচর্যে।

মেয়ের কাছে পূর্ণ সম্মতি নিয়েই পার্বতীবাবু দৌলতপুরে এসেছিলেন মুকুন্দবাবুর কাছে দেবব্রতর সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। দৌলতপুরে এসে মুকুন্দবাবু আর গোলকেন্দুবাবুর সঙ্গে কথা বলে প্রথমে হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন।

তারপর শেষ চেষ্টা হিসেবে মুকুন্দবাবুর প্রস্তাবে তিনি নিজেই একদিন দেবব্রতকে একলা পেয়ে কথাটা তুললেন।

প্রথমে কথাটা শুনে দেবব্রত যেন আকাশ থেকে পড়লো। জিজ্ঞেস করলে, মিনতির সঙ্গে আমার বিয়ে ? আপনি বলছেন কী ?

পার্বতীবাবু বললেন, কেন, আমি অন্যায়টা কী করেছি বাবা ? এটা কি খুব অন্যায় প্রস্তাব আমার তরফ থেকে ? আমি তোমাকে এতদিন ধরে চিনি, মিনতিও এতদিন ধরে তোমাকে চেনে। আর তুমিও আমাকে আর মিনতিকে এতদিন ধরে চেনো। সুতরাং এখন তোমার কাছ থেকে একটা মৌখিক সম্মতি ছাড়া আর কিছু চাই না। তাহলেই আমি এটা নিয়ে অগ্রসর হতে পারি।

—আমার বাবা কি আমার কাকা, তাঁদের কাছ থেকেই প্রস্তাবটা এলে ভালো হতো না ?

—তাঁদেরই প্রথমে আমি প্রস্তাবটা দিই, কিন্তু তাঁরা বললেন যে তাঁদের কথা নাকি তুমি শুনবে না, তাই আমাকে নিজেই তোমার কাছে প্রস্তাবটা দিতে বললেন, তাই আমি নিজেই তোমাকে বলছি—

কথাগুলো শুনে দেবব্রত প্রথমে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো।

তারপর বললে, আচ্ছা একটা কথা আপনাকে বলি—

পার্বতীবাবু বললেন, একটা কথা কেন, আমি মেয়ের বাপ, তুমি হাজারটা কথা বললেও আমি শুনতে প্রস্তুত—কী বলবে, বলো—

দেবব্রত বললে, আমি বিয়ে করবো কি না, সেটা আমি মিনতির সঙ্গে একবার কথা বলে নিয়ে তারপর বলবো।

পার্বতীবাবু ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না। বললেন, মিনতির সঙ্গে তুমি একবার এই নিয়ে কথা বলতে চাও ?

—হ্যাঁ। তার মতামতটা আমি জানতে চাই।

—কীসের ব্যাপারে মতামত ?

—আমাদের বিয়ের ব্যাপারে ? তাতে সে যদি রাজী হয়, তাহলেই আমি তাকে বিয়ে করবো।

পার্বতীবাবু কথাটা শুনে খুব চিন্তিত হলেন। তাঁর মেয়ে মিনতিকে দেবব্রত ভালো করেই চেনে। তবু তার সঙ্গে আবার ব্যক্তিগত এমন কোন্ কথা বলতে চায় দেবব্রত ?

তা বলুক দেবব্রত। তাতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। তাই পার্বতীবাবু বললেন, ঠিক আছে। আমি তাহলে তাই-ই করবো, আমি মিনতিকে একবার তোমার কাছে এখানে নিয়ে আসবো। তখন তুমি তার সঙ্গে দেখা করে যা কিছু বলবার তাই-ই বলো—আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই। তার সঙ্গে তোমার সারা জীবন একসঙ্গে কাটাতে হবে, কথা বলে নেওয়াই তো ভাল। আমি খুব খুশী হলাম তোমার কথায়। আমি আজই চলে যাচ্ছি, যতো শীঘ্রই পারি মিনতিকে নিয়ে আবার দৌলতপুরে আসবো। তুমি তো হাজারটা কাজে ব্যস্ত থাকো, তারই মধ্যে একটু সময় করে তার সঙ্গে যা বলবার তা বলো।

কথাগুলো বলে পার্বতীবাবু আবার ঢাকায় তাঁর নিজের জায়গায় চলে গেলেন। যাবার আগে মুকুন্দবাবু আর গোলকেন্দুবাবুকে দেবুর সঙ্গে যা কথা হলো তা বলে গেলেন।

সব শুনে মুকুন্দবাবু আর গোলকেন্দুবাবু দু'জনেই খুব খুশী হলেন। দেবু যে শেষ পর্যন্ত সংসারী হতে রাজী হয়েছে, এর চেয়ে আনন্দের খবর আর কী হতে পারে ?

সামান্য ঝর্ণাদেবীর 'পদ্মশ্রী' উপাধি পাওয়ার সূত্রে সুপ্রভাতের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যে দেবব্রত সরকারের মতো এক সৃষ্টিছাড়া মানুষের পরিচয় পেয়ে যাবো, তা প্রথমে কল্পনা করতে পারিনি। জিজ্ঞেস করলাম, আর তোমার সেই 'আল্‌তা-মাসী'? তুমি বলেছিলে যে 'আল্‌তা-মাসী' একটা প্রতীক চরিত্র। তার কথা বলছো না কেন?

সুপ্রভাত বললে, আরে দাঁড়াও-দাঁড়াও। অতো তাড়াহুড়ো করলে কি চলে? গল্পে প্রত্যেক চরিত্রের একটা যথাস্থান আছে। সেই জায়গার বদলে যদি অন্য কোথাও তার কথা বলা হয় তো তাতে রসভঙ্গ হবে। রান্নায় নুন কম বা বেশি হলে যেমন তরকারির স্বাদের ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়, গল্পের চরিত্রদের বেলাতেও তাই। তারা অনাবশ্যক যেখানে-সেখানে এসে হাজিরও হবে না, আবার হঠাৎ যথাস্থান থেকে অদৃশ্য হয়েও যাবে না, এইটেই নিয়ম। এই নিয়ম যে-লেখক মানেননি তিনি পস্তিয়েছেন। বেশির ভাগ লেখকই এই জন্যে সাহিত্য-জগৎ থেকে একদিন অদৃশ্য হয়ে গেছেন, কিংবা পাঠক-জগৎ তাঁকে ভুলে গেছে।

সুপ্রভাতের কথা শুনতে আমার ভালো লাগছিল না। যে-লোক কথায়-কথায় জ্ঞান দেয়, তার কথা শুনতে কারই বা ভালো লাগে! আর জ্ঞান যদি দিতেই হয় তো গল্পের মধ্যে এমন জায়গায় জ্ঞান দিতে হবে, যেখানে জ্ঞান দিলে গল্পের গতি রুদ্ধ হবে না, আর গল্পও কোনও রকমে খর্ব হবে না। সে আর্ট ক'জনই বা জানে আর ক'জন পাঠকই বা তা বুঝতে পারে।

যা'হোক, আমার মনের ভাব গোপন রেখে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তা তারপর?

সুপ্রভাত বললে, তারপর আর কী হবে? তারপর একদিন মিনতির সঙ্গে দেবব্রতর বিয়ে হয়ে গেল।

—আর সেই যে দেবু বলেছিল বিয়ের আগে মিনতির সঙ্গে দেখা করে সে তার মতামত জেনে নেবে ?

—সেই মতামত নেবার ব্যাপার যথাসময়েই চুকে গিয়েছিল।

—কী রকম ? সেই ঘটনাটা বলো ?

সুপ্রভাত বললে, সে কথা এখন থাক। সেটা শেষকালে বলবো। বিয়ে হওয়ার পর কী হলো শোন।

ইণ্ডিয়া তখন যুদ্ধের আগুনে জ্বলছে। উনিশশো বিয়াল্লিশের 'কুইট-ইণ্ডিয়া'র আন্দোলন চালাচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী। সে আন্দোলনের ছোঁয়া দৌলতপুরেও এসে লাগলো। একদিন ভগৎ সিং, সুকদেব, চন্দ্রশেখর আজাদ দেশকে আজাদী করবার জন্যে নিজেদের পথ ধরেছিল। তারপর গান্ধীজী আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে। তার ছোঁয়াচও এসে লাগলো দৌলতপুরে।

এক-একদিন মাঝরাতে কে যেন এসে ডাকে দেবুকে।

নিচু গলায় বলে. দেবুদা সর্বনাশ হয়েছে—

—কী হলো ?

—পুলিশ এসে অবিনাশকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

—তার কী অপরাধ ?

—সে রাত্তির বেলায় রেল-লাইন ধরে ইছামতীর দিকে যাচ্ছিল, তার হাতের ঝুলির মধ্যে বোমা পায়, তাই সে পাকড়াও হয়েছে। এখন তো পুলিশ আমাদের সকলের বাড়িতে সার্চ করবে। কী করি এখন ?

দেবব্রত কিছুক্ষণ ভাবলে। বললে, তুই গা-ঢাকা দে—

খোকন বললে, কোথায় গা-ঢাকা দেব ?

দেবব্রত বললে, তুই কলকাতায় চলে যা, সেখানে গিয়ে হেমন্তদার কাছে চলে যা। তিনি যা করতে বলবেন তাই-ই করবি। হেমন্তদার কাছে গিয়ে আমার নাম করবি—

—কিন্তু তুমি ?

দেবব্রত বললে, আমার কথা তোকে ভাবতে হবে না।

তারপর একটু ভেবে বললে, তোর কাছে টাকা-পয়সা কিছু আছে ?

—না ?

দেবব্রত বললে, না থাকে তো আমি দিচ্ছি টাকা, একটু দাঁড়া—

বলে আবার ঘরের ভেতরে এলো। তারপর আলমারির চাবি খুলে নগদ পাঁচশো টাকা বার করে নিয়ে আবার আলমারিতে চাবি দিয়ে দিলে। তারপর আবার বাইরে এসে খোকনকে টাকাগুলো দিলে। খোকন তখনও অন্ধকারের আড়ালে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল।

দেবব্রত বললে, এতে পাঁচশো টাকা আছে, আর দেরি করিসনি, আজই এই টাকা নিয়ে কলকাতায় হেমন্তদার কাছে যা। হেমন্তদা যা করতে বলবে তাই-ই করবি।

—আর তুমি? তোমাকেও তো পুলিশ এ্যারেস্ট করতে পারে, তখন?

দেবু বললে, আমার কথা তোকে ভাবতে হবে না। আমি যা ভালো বুঝবো তাই করবো।

কথাগুলো শুনে খোকন বললে, কিন্তু তুমি যে বিয়ে করেছ দেবুদা?

দেবব্রত বললে, আমার বিয়ে হয়েছে তো কী হয়েছে? বিয়ে করেছি বলে কি আমি তোদের দল-ছাড়া হয়ে গিয়েছি। তুই যা, ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। আর দেরি করিসনি—

বলতেই খোকন আর দেরি করলে না। অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

খোকনকে বিদায় করে দিয়ে দেবব্রত নিজের ঘরে আসতেই আবার বিছানায় গিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যেই সেখানে মিনতিকে দেখে অবাক।

বললে, কী হলো তুমি? তুমি এই অসময়ে?

মিনতি বললে, তোমার ঘরে আসবো, তারও কি আবার সময়-অসময় আছে নাকি?

দেবব্রত বললে, তোমার সঙ্গে তো আমার সেই চুক্তিই আছে—

মিনতি বললে, চুক্তি?

দেবব্রত বললে, হ্যাঁ চুক্তিই তো। তুমি কি আমাদের বিয়ের আগে যে-কথা হয়েছিল, তা কি ভুলে গেলে নাকি?

—আমার ঘুম আসছিল না। চুপ করে শুয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ শুনতে পেলুম বাইরে থেকে কে যেন তোমায় গলা নিচু করে ডাকলো। আমার খুব জানতে ইচ্ছে হলো। তাই তোমার ঘরে এলুম।

—কিন্তু আমার ঘরে আসা তোমার উচিত হয়নি।

মিনতি বললে, বাইরে যে এলো, ও কে?

—ওটাই কি আমার কথার উত্তর হলো? আমি তো তোমাকে বলেছি আমি কার সঙ্গে কী কথা বলছি, কে আমার সঙ্গে দেখা করে কী কথা বলছে, তা তুমি কখনও আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারবে না।

মিনতি বললে, কিন্তু এ-কথা তো তুমি অস্বীকার করতে পারবে না যে, আগে অবশ্য আমি তোমার ছাত্রী ছিলুম, কিন্তু এখন আমি তোমার স্ত্রী। স্ত্রীর মর্যাদাও কি তুমি আমাকে দেবে না?

দেবব্রত বললে, যাও, তুমি তোমার ঘরে যাও, আমি আর সেই সব পুরনো কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই না।

এর পরে মিনতি আর কী বলবে! তার চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়তে লাগলো।

দেবব্রত তাই দেখে বললে, মনে করো না তোমার চোখের জল দেখে আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভুলে যাবো।

—তাহলে তুমি আমায় বিয়ে করেছিলে কেন?

—আমি তো তোমার অনুমতি নিয়েই বিয়ে করেছি, তুমিই তো সেদিন এ বিয়েতে অনুমতি দিয়েছিলে! দাওনি?

মিনতির মুখে কোনও উত্তর নেই।

—আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? উত্তর দাও? দাও উত্তর?

মিনতি কী উত্তর দেবে!

বললে, আমি তখন জানতুম না, আমি তখন বুঝতে পারিনি।

দেবব্রত বললে, তুমি যদি না জানতে পেরে থাকো, তুমি যদি না বুঝতে পেরে থাকো, তাহলে সেটার জন্যে কি আমি দায়ী? তার জন্যে কি আমি দোষী?

তবু মিনতির মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বেরলো না।

—আমার মাথায় এখন অনেক ভাবনা, আমার মাথায় এখন অনেক দায়িত্ব, এই সময়ে তুমি এলে? আর কি কোনও সময় পেলে না?

মিনতি বললে, কখন তোমার সময় হবে তা তুমি বলে দাও, আমি তখনই তোমার কাছে এসে এ-সব কথা বলবো।

দেবব্রত বললে, দেখছো বাড়িতে বাবার অসুখ, দেখছো দেশের এই টাল-মাটাল অবস্থা, দেখছো পাড়ায়-পাড়ায় পুলিশ মরিয়া হয়ে দেশের ছেলে-ছোকরাদের গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়ে অকথ্য অত্যাচার করছে, আর ঠিক এই সময়ে আমরা এই রকম তুচ্ছ মান-অভিমান নিয়ে ঝগড়া করে সময় কাটাচ্ছি।

—আমায় ক্ষমা করো তুমি, আমি সত্যিই অন্যায় করেছি।

দেবব্রত এতক্ষণে যেন একটু নরম হলো।

বললে, আমাকে তুমি ভুল বুঝো না মিনতি। আমি রাগের মাথায় তোমাকে কী বলে ফেলেছি, এখন তার জন্যে আমি তোমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি।

মিনতির কান্না তখন একটু থেমেছে।

দেবব্রত মিনতির কাছে গিয়ে তার মাথাটা বুকে টেনে নিলে।

বললে, যাও মিনতি, তুমি তোমার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো গে। রাত জাগলে তোমার শরীর খারাপ হবে।

মিনতি বললে, আমি আজ তোমার ঘরেই শোব—

—তা হয় না মিনতি, তা হয় না—

—কেন তা হয় না?

—সে কথা তো তোমাকে বিয়ের আগেই বলেছি।

—এই-ই কি তোমার শেষ কথা?

দেবব্রত বললে, এ-রকম করে বলছো কেন? বিয়ের আগেই তো আমি তা বলে দিয়েছি—যাও, কেঁদো না, তুমি তোমার ঘরে চলে যাও—বেশি কান্নাকাটি করলে সব জানাজানি হয়ে যাবে।

এর পর এক তুমুল কাণ্ড বেধে গেল সারা পৃথিবী জুড়ে। তার জের শুধু যে ইংল্যাণ্ড-আমেরিকা-রাশিয়া বা জার্মানীর ওপরে পড়লো, তা নয়। জার্মানী তখন বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে।

আর জাপান? জাপানের হিরোশিমা আর নাগাসাকির মাথার ওপর ৬ই আগস্ট ১৯৪৫ সালে এমন এক ধরনের বোমা পড়েছে, যা আগে পৃথিবীতে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

আর যাঁর ওপরে দেবব্রত সবচেয়ে বেশি ভরসা করেছিল, যে মহাপুরুষ তার মনের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেই সুভাষ বোস? সেই নেতাজী?

হঠাৎ সেই দুঃসংবাদটা দৌলতপুরেও এসে পৌঁছুলো। তারিখটা ছিল ১৮ই আগস্ট ১৯৪৫ সাল। তার ক'দিন পরেই খোকন এসে খবরটা দিয়ে গেল।

খোকন তখন কাঁদছে।

দেবব্রত জিজ্ঞেস করলে, কীরে, কী হলো বল না? কথা বলছিস না কেন?

খোকন কাঁদতে-কাঁদতেই বললে, দেবুদা, সর্বনাশ হয়ে গেছে—

—কেন, কী সর্বনাশ?

খোকন বললে, কলকাতা থেকে খবর এসেছে নেতাজী সুভাষ বোস মারা গেছে।

—সে কী? কে বললে?

খোকন বললে, সবাই বলছে। খবরের কাগজেও নাকি খবরটা বেরিয়েছে—

—কোন খবরের কাগজে?

কলকাতার সব খবরের কাগজেই নাকি খবরটা বেরিয়েছে।

দেবব্রত খবরটা শুনে কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করলে, তুই ঠিক জানিস?

খোকন বললে, কলকাতা থেকে এখানে একজন এসেছে—

তখন দৌলতপুরে বেশি খবরের কাগজ আসতো না। এলেও তা দেরি করে আসতো। পরের দিন আসতো। যখন আসতো তখন সে-খবর বাসি হয়ে গিয়েছে।

ব্যাপারটা খুব চিন্তার। অথচ এই তো কিছুদিন আগেই গুজব শোনা গিয়েছিল যে, সুভাষ বোস তাঁর আজাদ হিন্দ্ ফৌজ নিয়ে ইণ্ডিয়ার ভেতরে মণিপুরে পৌঁছে সেখানে ইণ্ডিয়ার ন্যাশন্যাল ফ্ল্যাগ উড়িয়ে দিয়েছে। তখন আর তো বেশি দেরি নেই।

তখন দেবব্রতদের 'চরিত্র-গঠন শিবিরের' ছেলে-মেয়েদের সে কী আনন্দ। মনে-মনে সবাই তৈরি হয়ে নিয়েছে। ইংরেজ আর বেশিদিন এখানে নেই। দৌলতপুরের তখন সবাই-ই আছে। শুধু সুলতান আহ্মেদ নেই আর কানাই মল্লিক নেই। হঠাৎ সেই কানাই-এর কী এক রকম জ্বর হলো, আর ডাক্তার এসে পৌঁছোবার আগেই সে মারা গেল।

আর নেই সেই অবিনাশও। তাকে পুলিশ একেবারে ধরে হাজতে পুরে রেখেছে। তাকে কে ছাড়িয়ে আনবে? পুলিশ কেন তাকে ছেড়ে দেবে?

সেইদিনই 'চরিত্র-গঠন শিবিরে'র সভ্যদের মিটিং ডাকা হলো। সবাই জড়ো হলো সেই ইস্কুলের সামনে। সবাই যার যা বলবার তা বললে। শৈলেন বললে, এর বদ্লা নিতে হবে। নেতাজী নেই কিন্তু তাঁর অসমাপ্ত কাজ আমাদেরই শেষ করতে হবে—

প্রায় সকলেরই এক কথা। একই সুরে সবাই ওই একই বক্তব্য রাখলেন। সকলের শেষে এল দেবব্রত সরকারের পালা।

সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তোমরা আজ দেশ স্বাধীন করার যে প্রতিজ্ঞা করলে তার জন্যে প্রধান কাজ আর প্রথম কাজ হলো 'চরিত্র-গঠন'। চরিত্র গঠনই হলো মানুষের প্রথম কর্তব্য। যে মানুষ চরিত্র গঠন করতে পেরেছে, তার দ্বারা সমস্ত প্রতিজ্ঞাই পূর্ণ করা সম্ভব। যার

চরিত্র নেই, সে মানুষ নামেরই অযোগ্য। এসব কথা আমি শিখেছি আমাদের 'চরিত্র-গঠন শিবিরে'র প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত নেতা সুলতান আহ্‌মেদ সাহেবের কাছ থেকে। তিনিই আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন যে, এই পৃথিবীতে জন্মে যদি আমরা আমাদের স্রষ্টার ঋণ শোধ না করি, তাহলে আমরা মানুষের আকৃতিতে পশু হয়ে থাকবো। পশুতে আর মানুষে তফাৎ কী? তফাৎ শুধু এই যে, পশু শুধু জীবন ধারণই করে থাকে। প্রকৃতি আমাদের আলো দেয়, বাতাস দেয়, উত্তাপ দেয়, জল দেয়, তার জন্যে পশুকে কোনও ট্যাক্স দিতে হয় না। কিন্তু যে-মানুষ প্রকৃতির এই অকৃপণ দানের জন্যে ট্যাক্স দেয়, সে-ই কেবল প্রকৃত অর্থে মানুষ। আর যে মানুষ তা দেয় না, সে মানুষ নয় পশু। এসব কথা আমাদের এই শিবিরের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত সুলতান আহ্‌মেদ সাহেবই আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। এর জন্যে আমরা তাঁর কাছে ঋণী। আজ সেই ঋণ শোধ করবার লগ্ন এসেছে। তোমরা প্রতিজ্ঞা করো সবাই নিজের-নিজের মানবিক কর্তব্য পালন করে সেই ঋণ শোধ করবে। সুভাষ বোস তাঁর জীবনের মানবিক ঋণ শোধ করে গেলেন, এখন তাঁর বাকি কাজটাও আমাদের শেষ করতে হবে, যদিও আমি বিশ্বাস করি না যে সুভাষ বোস মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুর খবর একটা রাজনৈতিক কূটনীতি। এই কূটনীতি আমাদের কাজ দিয়ে আমাদের কর্তব্য সাধন করে পৃথিবীর দরবারে ফাঁস করে দিতে হবে। এখন আমাদের ভয় পেলে চলবে না। আরো সাহসের সঙ্গে এগিয়ে চলতে হবে। সুভাষ বোসের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। ইংরেজ সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, সুভাষ বোসেরা অতো সহজে মরে না। সুভাষ বোসেরা অমর। জয়হিন্দ্—

দেবব্রতর বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো। আর তারপর যে-যার বাড়ি চলে গেল।

কিন্তু সেইদিন রাত্রেই মুকুন্দবাবুর বাড়িতে মাঝ-রাত্রে হঠাৎ জোরে-জোরে ধাক্কা পড়লো।

রাখাল বাড়ির বাইরের দিকে শুতো বরাবর। সেদিনও সে বাড়ির কাজ-কর্ম শেষ করে রাত্রে নিজের জায়গাটায় গিয়ে যথারীতি শুয়েছে।

হঠাৎ দরজায় জোরে-জোরে ধাক্কার শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেছে।

জিজ্ঞেস করলে, কে ?

বাইরে থেকে উত্তর এলো, দরজা খোল, দরজা খোল —

রাখাল ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলতেই অবাক। অন্ধকারে স্পষ্ট করে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। তবু তারই মধ্যে দেখা গেল পুলিশে-পুলিশে বাড়ির বাইরেটা ছেয়ে গেছে।

সে ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলে, আপনারা কে ?

পুলিশ সামান্য একজন চাকরের কথার জবাব দেবে এমন বেকুব তারা নয়। তারা দরজা খোলা পেয়ে হুড়-মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। তাদের সকলের হাতে টর্চ ছিল। সেই টর্চের আলোয় তারা বাড়ির ভেতরের ঘরে-ঘরে ধাক্কা দিতে লাগলো।

এমনিতে মিনতির রাত্রে ভালো ঘুমই হতো না। অর্ধেক রাতই তার জেগে-জেগে কাটতো। সেদিন বোধহয় তারও একটু তন্দ্রা এসেছিল। অতো রাত্রে তার ঘরের দরজায় ধাক্কা পড়তেই সে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

তবে কি দেবব্রত তার ঘরে ধাক্কা দিচ্ছে ? তার শরীরে যেন কেমন একটু রোমাঞ্চ হলো প্রথমে।

গলার আওয়াজটা নিচু করে একবার জিজ্ঞেস করলে, কে ?

বাইরে থেকে ভারি গলার আওয়াজে কে যেন উত্তর দিলে, দরজা খুলুন, দরজা খুলুন —

তবু সে আবার জিজ্ঞেস করলে, কে ?

—আমরা !

মিনতি এবার ভয় পেয়ে গেল। এ গলার আওয়াজ তো চেনা নয়।

কিন্তু কেউ তার প্রশ্নের জবাব দেবার দরকার মনে করলে না। শুধু হুকুম হতে লাগলো, খুলুন দরজা, দরজা খুলুন—

মিনতি কী করবে বুঝতে পারলে না। মনে হলো যদি ডাকাত হয়! ডাকাত হলে যদি তারা তার ওপরে অত্যাচার চালায় ? এমনিতেই একলা-একলা ঘরে শুতে তার বড়ো ভয় করতো। তার ওপর আবার

এই উৎপাত! কী করবে সে, কাকে ডাকবে, কিছুই সে বুঝতে পারলে না। ভয়ে ঠক্-ঠক্ করে তখন কাঁপছে।

তারপর শুধু তার ঘরেই নয়। তার মনে হলো সমস্ত বাড়িময় যেন অনেক লোকের ভিড়ের শব্দ হতে আরম্ভ করেছে। অনেক লোক যেন চারদিকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

শেষকালে মিনতির ঘরের দরজার পাল্লা দু'টো একবার বিকট শব্দ করে ভেতরে ভেঙে পড়লো। আর যমদূতের মতো কয়েকজন গুণ্ডা যেন হুড়-মুড় করে তার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

বলতে লাগলো, আপনার স্বামী কোথায়? দেবব্রত সরকার?

মিনতি তখন ভয়ে অসাড় হয়ে গেছে।

তারা ততক্ষণে খাটের তলায়, আলমারির পেছনে, আলনার সব কাপড়-চোপড় উল্টে-পাল্টে আতি-পাঁতি করে কাকে খোঁজা-খুঁজি করতে আরম্ভ করেছে।

—বলুন আপনার স্বামী কোথায়? দেবব্রত সরকার কোথায় গেল বলুন?

মিনতি বললে, তিনি তো আমার ঘরে শোন না—

তারা বলে উঠলো, আপনার স্বামীই তো দেবব্রত সরকার? আপনি তো দেবব্রত সরকারের স্ত্রী?

—হ্যাঁ।

—তা আপনার স্বামী আপনার ঘরে শোন না, এ কি হতে পারে কখনও? আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। আমরা আপনাকেও গ্রেফ্‌তার করবো। চলুন আমাদের সঙ্গে—

মিনতির চোখ দু'টো ভয়ে ছল্-ছল্ করে উঠলো।

—চলুন।

অন্য ঘরেও তখন সার্চ হচ্ছে। মুকুন্দবাবু অসুস্থ মানুষ। তার ওপরে বৃদ্ধ হয়েছেন।

ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী চান আপনারা? আপনারা কারা?

একজন বলে উঠলো, আমরা পুলিশ।

পুলিশের নাম শুনে যেন খানিকটা আশ্বস্ত হলেন মুকুন্দবাবু। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন ডাকাতের দল। অন্ধকারে তাদের চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না।

বললেন, তা আপনারা এ-বাড়িতে কেন? কী অপরাধ করেছি আমরা?

—আমরা দেবব্রত সরকারকে এ্যারেস্ট করতে এসেছি—

—কেন, সে কী করেছে?

—আমরা তাকে ডি. আই. রুলে ধরতে এসেছি।

—কী রুল বললেন?

পুলিশ বললে, ডিফেন্স্ অব্ ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট-এর রুলে। আমাদের ওপরওয়ালার হুকুমের বলেই আমরা এসেছি।

এর পরে মুকুন্দবাবু আর কী-ই বা বলবেন। তিনি যেন তখন বোবা হয়ে গেছেন। তাঁর বুকটা তখন ঢিপ্-ঢিপ্ করছে। আগে কখনও তাঁকে এমন করে পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে হয়নি। আজ তাঁর ছেলের জন্যে এমন হেনস্থা হতে হচ্ছে তাঁকে।

এমন সময়ে তাঁর চোখের সামনেই এসে হাজির হলো দেবব্রত। তার হাত দু'টো হাত-কড়া বাঁধা।

সে-দৃশ্য তিনি আর দেখতে পারলেন না। তিনি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ ধপ্ করে মেঝের ওপর টলে পড়লেন।

দেবব্রতও দেখলে তার বাবা অজ্ঞান হয়ে পড়লেন তার সামনেই। কিন্তু তার মুখ দিয়ে আর কোনও কথাই বেরলো না।

শুধু বললে, আমায় কোথায় নিয়ে যাবেন, নিয়ে চলুন—

পুলিশও আর দাঁড়ালো না। তারাও সঙ্গে-সঙ্গে দেবব্রতকে নিয়ে বাড়ির বাইরে চলে গেল। যেতে-যেতে দেবব্রতর কানে এলো মায়ের করুণ আর্তনাদ। মায়ের গলার কোনও শব্দই সে বুঝতে পারলে না, শুধু বুঝতে পারলে দু'টো শব্দ—ওরে খোকা, খোকা রে—

তারপর সোজা তাকে নিয়ে গিয়ে জেলখানায় পুরে দেওয়া হলো।

সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে মানুষের যে কেমন অবস্থা হয় তা বোঝা গেল জেলখানায় গিয়ে। শুধু দেবব্রত নয়, দেবব্রতর আগে নিজের জন্মভূমিকে ভালোবাসার অপরাধে আরো অনেকে জেল খেটেছেন। কে জেল খাটেনি? দেশবন্ধু জেল খেটেছেন, দেশপ্রিয় জেল খেটেছেন। ভগৎ সিং, সুকদেব, যতীন দাস, গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, আবুল কালাম আজাদ, আরো হাজার-হাজার, আরো লক্ষ-লক্ষ লোক।

অনেকে ঝোঁকের মাথায় জেলে গেছেন। অনেকে আবার আদর্শের অনুপ্রেরণায় জেলে গেছেন। অনেকে জেল থেকে বেরিয়ে আবার এখন স্বাধীনতা-সংগ্রামের আজীবন পেন্‌সন্ ভোগ করছেন।

কিন্তু দেবব্রতর জেল খাটা ঠিক সে-রকম জেল খাটা নয়। দেবব্রতর আদর্শ দেশকে স্বাধীন করা। সেই স্বাধান করার সংগ্রামটা হিংসা-নির্ভর না অহিংসা-নির্ভর, সে-প্রশ্নটা গৌণ! কী ভাবে কেমন করে যে সেটা ঘটে গেল, তা সে ছাড়া আর কেউ জানতো না।

যে একজন জানতো সে হলো কানাই মল্লিক। পাড়ার বন্ধু ছিল। কিন্তু সে ততোদিনে মারা গেছে।

আর একজন যে জানতো সে বিনয়দা।

কিন্তু তিনিও তো তার মাত্র কয়েকদিন পরেই মারা গেছেন রাইটার্স বিলডিং-এ। সেদিন যে তিনজন সিম্‌পসনকে মারতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন তিনিও ছিলেন তাঁদের একজন।

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে, অনেক মাস কেটে গেছে, অনেক বছর কেটে গেছে। সবাই হয়তো তাঁদের কথা ভুলে গিয়েছে। হয়তো শুধু তাঁদের নামটাই কোনও রকমে তাদের মনে আছে। কিন্তু দেবব্রত তার সেই বিনয়দাকে তখনও ভুলতে পারেনি। তখনও মনে আছে সেই দিনটার কথা, সেই রাতটার কথা, দৌলতপুরের শ্মশানে শ্মশানেশ্বরীর

পায়ে হাত রেখে সেই প্রতিজ্ঞা-পালনের কথাটা।

জেলখানার ভেতরে বসে-বসে দেবব্রত যতোক্ষণ জেগে থাকতে তভক্ষণ কেবল নিজের অসহায়তার কথা ভাবতো। ভাবতো—কেন সে তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে পারলে না। দেশের আর দেশের মানুষদের জন্যে তো তার সব কিছু ত্যাগ, সব কিছু চেষ্টা ব্যর্থ হলো!

জেলখানায় কারো সঙ্গেই তাকে মিশতে দেওয়া হতো না। যদিই বা কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে আসতো তো তাও অল্পক্ষণের জন্যে। কেউ এলেই দেবব্রত তাকে জিজ্ঞেস করতো—ভাই, তোমরা কিছু খবর পাও?

তারা জিজ্ঞেস করতো, কীসের খবর? আপনার বাবা-মা'র খবর?

দেবব্রত বলতো, না-না, ও-সব খবর নয়—

—তাহলে আপনার স্ত্রীর খবর?

দেবব্রত সকলের ওপর খুব বিরক্ত হতো। সে যে বাড়ির খবরাখবরের জন্যে মোটেই চিন্তিত নয়, সে-কথা সে কাকে বোঝাবে?

শুধু জেলখানার ভেতরেই নয়, যতোদিন জেলখানার বাইরে সে ছিল, তখনও দেবব্রত দেখেছিল সবাই নিজেকে নিয়েই কেবল ব্যস্ত সবাই সব সময়ে নিজের কথাই বড় বেশি করে ভাবে, নিজের একটা বাড়ি হবে কী করে, কেমন করে নিজে অনেক টাকার মালিক হবে, কেমন করে সকলের চাইতে নিজে অনেক বড়ো হবে, এই সব চিন্তা নিয়েই সবাই বড় বেশি বিব্রত।

এ-সব জিনিস সে যতো বেশি লক্ষ্য করতো, ততোই মনে-মনে সে কষ্ট পেতো, তার জানা-শোনা সবাই কেবল ধুলো-কাদা বাঁচিয়ে চলতো, ধর্ম বাঁচিয়ে চলতে চেষ্টা করতো না। দেশ আর দেশের মানুষরা যে ইংরেজদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে, তারা যে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অতি কষ্টে কোনও রকমে শ্বাস-প্রশ্বাস টেনে-টেনে বেঁচে আছে, সে-কথা তো কেউ-ই ভাবছে না। তাহলে সুভাষ বোসের কীসের দায় পড়েছিল যে আই-সি-এস চাকরিটা ছেড়ে দিলে? কেন তাহলে দেশের কাজে জেলে গিয়ে ঢুকলো? কেনই বা আবার জেল থেকে পালিয়ে জাপানে চলে গিয়ে নিজের প্রাণটা খোয়ালে? কীসের জন্যে?

কেন ? এর কারণটা তো সকলেরই জানা। তাহলে দেশের সমস্ত মানুষ এত পরশ্রীকাতর হয়ে গেল কেন ? তাহলে দেশের সমস্ত মানুষ কেন এত স্বার্থপর হয়ে গেল ? কেন সবাই নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত ? এর কারণ কী ?

প্রশ্নগুলো দেবব্রত নিজেকেই করতো, আবার প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজেই দিতে চেষ্টা করতো। কিন্তু সারা দিন রাত, সারা মাস, সারা বছর ভেবে-ভেবেও কোনও উত্তর সে পেত না।

অনেকেই জেল খাটে। ইণ্ডিয়ার স্বাধীনতার লড়াইয়ের সময়ে দেশের এমন কোনও লীডার নেই যিনি জেল খাটেননি। পরবর্তীকালে তাঁরা সবাই-ই তাঁদের ত্যাগের পুরস্কার পেয়ে গেছেন। কেউ-কেউ মিনিস্টার হয়েছেন, কেউ-কেউ আবার চীফ মিনিস্টারও হয়েছেন, যাঁরা তা হতে পারেন নি, তাঁরা পাচ্ছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের পেনসন্।

কিন্তু দেবব্রত সরকার ?

সুপ্রভাত বললে, দেবব্রত সরকার ছিল অন্য জাতের মানুষ, অন্য ধাতের। বহুকাল আগে একদিন দৌলতপুরে শ্মশানেশ্বরী দেবীর পায়ে হাত ছুঁইয়ে সে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল, তা আর সে কোনওদিন ভুলতে পারেনি, তা-ই তাকে সারা জীবন তাড়িয়ে নিয়ে চলেছিল।

জেলের ভেতরে থেকেই সে বাইরের জগতের সমস্ত খবর পেয়ে যেত। কখন কবে কাকে পুলিশ ধরলে, কে কী স্টেটমেণ্ট দিলে, জেলখানার ভেতরে সে-সমস্ত খবরও চলে আসতো।

তখন সে এক বিচিত্র সময় চলছে দেশের। অনেক দিন আগে সুভাষ বোস ত্রিপুরী কংগ্রেসে সকলের ভোটে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন। গান্ধীজী চেয়েছিলেন তাঁর জায়গায় পট্টভি সীতারামিয়া প্রেসিডেণ্ট হোন। তা না হওয়াতে গান্ধীজী রেগে গিয়ে বলেছিলেন, 'পট্টভি সীতারামিয়ার পরাজয় আমারই পরাজয়।' কিন্তু ভোটের বিচার গান্ধীজী মাথা পেতে মেনে নিয়েছিলেন।

কিন্তু তবু ষড়যন্ত্র শুরু হলো কী করে সুভাষ বোসকে প্রেসিডেণ্টের পদ থেকে হঠানো যায়। শেষকালে 'ওয়ার্কিং কমিটি'র সমস্ত মেম্বাররা একসঙ্গে পদত্যাগ করলেন, সুভাষ বোস তখন কাকে নিয়ে কংগ্রেস

চালাবেন ? তিনি একেবারে একলা হয়ে গেলেন।

এ-সমস্ত কিছুই সুভাষ বোসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।

কিন্তু ইতিহাস তো কাউকেই ক্ষমা করে না। গান্ধীজী বললেন, 'After all Subhas Bose is not an enemy of the Country'

সুভাষ বোস তখন তাঁর নিজের একটা নতুন দল গড়লেন, নাম দিলেন 'ফরোয়ার্ড ব্লক'। ঠিক করলেন 'ফরোয়ার্ড ব্লক'কেই তিনি কংগ্রেসের মতো একটা বড়ো দলে পরিণত করবেন। কিন্তু তা পারলেন না। ওদিকে তখন যুদ্ধ বেধে গেছে। আর তিনি তখন জেলখানায়।

সুভাষ বোস তখন ভাবলেন—এই-ই সুযোগ। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। কী করে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন তিনি ? মনস্থির করে নিলেন যে তিনি জেল থেকে যেমন করে হোক পালাবেন। কিন্তু ইংরেজদের জেলখানা থেকে পালানো অতো সোজা ?

তখন তিনি এক নতুন প্ল্যান ঠিক করলেন। সে এমন এক প্ল্যান যাতে কেউ কোনও সন্দেহ করতে না পারে।

সে-সব কথা এখন সবাই জানে।

কিন্তু অতো সহজে তো দেশ থেকে ইংরেজদের তাড়ানো যাবে না। তাড়াতে হলে ত্যাগ নয়, আঘাত করতে হবে। জেলখানার ভেতর থেকে কী করে আঘাত করা যাবে ? সমস্ত দিন-রাত এই সব চিন্তাই মাথায় ঘুর-ঘুর করতো। আর যতোটুকু খবর বাইরে থেকে ভেতরে আসতো, সেই সব খবর নিয়েই মনটা কেবল তোলপাড় করতো।

জেলখানার ভেতরে যারা থাকতো তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবার জন্যে অনেকের আত্মীয়-স্বজনরা আসতো।

কিন্তু কেউ কোনও দিন দেবব্রত সরকারের সঙ্গে দেখা করতে আসতো না। আশেপাশে যারা থাকতো তারা জিজ্ঞেস করতো—আচ্ছা দেবুদা, আপনার কাছে কেউ দেখা করতে আসে না কেন?

দেবব্রত তার উত্তরে শুধু হাসতো। বলতো, আমার আর কে আছে যে এখানে দেখা করতে আসবে ?

—কেন, আপনার বাবা কিংবা মা ?

—তাঁদের বয়েস হয়ে গিয়েছে, তাঁরা এতদূরে আসবেন কী করে?

অনেকে বলতো, কিন্তু আপনার স্ত্রী? তিনি তো বুড়ো মানুষ নন। তিনি তো একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারেন?

দেবব্রত এ-সব কথার উত্তর দিত না। বলতো, আমার স্ত্রীরও তো সংসারের কাজ-কর্ম আছে। সে-সব কে দেখাশোনা করবে?

তারা বলতো, তার জন্যে তো অনেক লোকজন আছে। বাড়িতে লোকজন তো কম নেই। তারাও তো একবার আসতে পারেন?

দেবব্রত বলতো, না এলেই তো ভালো হে—

—কেন, ভালো কেন? আপনার কি তাদের কাউকে দেখতে ইচ্ছে করে না?

দেবব্রত বলতো, না।

তারা দেবুদা'র উত্তর শুনে হতবাক হয়ে যেত।

জিজ্ঞেস করতো, কেন? দেখতে ইচ্ছে করে না, কেন?

দেবব্রত বলতো, দেখ, আমার মনে হয় এই পৃথিবীতে কেউ কারো নয়। এ-পৃথিবীর মানুষগুলোকে আমার ভালো লাগে না।

—কেন?

দেবব্রত বলতো, স্বার্থের জন্যে সবাই সবাইকে ব্যবহার করে। বাপ ছেলেকে ভালোবাসে স্বার্থের তাগিদে। মা বাপকে ভালোবাসে, তাও স্বার্থের তাগিদে। সকলের সঙ্গে সকলের সম্পর্ক কেবল স্বার্থের ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আসলে কেউ কাউকে ভালোবেসে কাছে টানে না। প্রয়োজন ছাড়া মানুষের মাথায় আর কিছুই ঢোকে না।

সবাই অবাক হয়ে যেত দেবুদার কথা শুনে।

দেবুদা বললে, এই যে দেখছো ইংরেজরা আমাদের দেশে রাজত্ব করছে প্রায় দু'শো বছরের ওপর, এরও কিন্তু সেই একই কারণ। প্রয়োজন। মুশকিল হয়েছে কি, আমরা না তাড়ালে তারা যাবে না।

তারপর একটু থেমে আবার বললে, আর এই যে আমরা ইংরেজদের পেলেই খুন করছি, এও সেই একই কারণে। কারণটা হলো তাদের কোনও রকমে তাড়িয়ে দিতে পারলে আমরা সবাই তাদের খালি সিংহাসনগুলোতে বসবো। তারা এখানে লাটবড়োলাট হয়ে

রাজত্ব করছে। তারা চলে গেলে আমরাই কেউ-কেউ তাদের ফেলে যাওয়া চেয়ারগুলোতে বসবো। আমরা কেউই দেশকে ভালোবাসি না। আমরা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসি না।

—তা এ বন্ধ করবার উপায় কী ?

দেবু বলতো, এর একমাত্র উপায় 'চরিত্র-গঠন' করা। আমাদের দৌলতপুরের সুলতান আহ্মেদ সাহেব যতোদিন বেঁচে ছিলেন, ততোদিন এই সব কথাই বলতেন। আমাদের নিজেদের চরিত্র-গঠন না করতে পারলে, ইণ্ডিয়া স্বাধীন হয়েও কিছু লাভ করতে পারবে না।

কথাগুলো জেলখানায় যারাই শুনতো, তারাই অবাক হয়ে যেত।

জিজ্ঞেস করতো, তাহলে হাজার-হাজার লোক যে দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছে আর দিচ্ছে, তার কি কোনও দাম নেই ?

দেবুদা বলতো, না, ইংরেজরা যতোদিন আছে ততোদিন একটু শান্তি আছে। কিন্তু যেদিন ওরা চলে যাবে, সেদিন থেকেই চেয়ার দখল করার জন্যে আবার মারামারি, লাঠালাঠি, খুনোখুনি শুরু হয়ে যাবে—

—তাহলে ইংরেজদের খুন করে কোনও লাভ হয়নি ?

দেবব্রত বললে, না।

—কেন ?

—লাভ হয়নি এই জন্যে যে আমাদের সকলের জীবনেরই আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে 'নেওয়া', দেওয়া নয়। আমরা সব কিছু পেতে চাই, কেউ কিছু দিতে চাই না। ইংরেজরা চলে গেলে ওই নেওয়ার ইচ্ছেটা আরো বেড়ে যাবে, আমাদের মধ্যে তখন সবাই প্রেসিডেন্ট হতে চাইবে, সবাই প্রাইম-মিনিস্টার হতে চাইবে, সবাই কেবল মিনিস্টার হতে চাইবে। অথচ ও-সব পোস্ট তো বেশি নেই। তখন লাগবে বন্ধুতে-বন্ধুতে ঝগড়া, ভায়ে-ভায়ে ঝগড়া, বাপ-ছেলেতে ঝগড়া। দেখবে, তখন কী সব খুনোখুনি কাণ্ড চলবে দেশের ভেতর, আর বাইরের দেশগুলোও আমাদের দেশটাকে টুকরো-টুকরো করে দেবে। আমাদের মধ্যে তখন কে রাজা হবে, কে মন্ত্রী হবে, তাই নিয়ে দিন-রাত ঝগড়া চলতে থাকবে। সে এক ভয়ঙ্কর দিন আসছে আমাদের সামনে।

সুপ্রভাত কথা বলতে বলতে থামলো।

বললাম, কই, সেই ঝর্ণা দেবীর কথা তো বললে না।

সুপ্রভাত বললে, বলছি, বলছি। যথা সময়ে সমস্ত কথাই বলবো।

জেলের ভেতরে যখন এই সব কাণ্ড চলছে, তখন যুদ্ধ শেষ হলো, তখন যারা ইণ্ডিয়ান-আর্মিতে কাজ করতো, তারা ছুটি পেয়ে গেছে। কিন্তু তাদের মন তখন বিগড়ে গেছে।

সে ১৯৪৬ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি।

বোম্বাই-এর জাহাজ-ঘাটায় এ্যাড্‌মিরাল গড্‌ফ্রে যখন একদিন তাঁর যুদ্ধ-জাহাজে টহল দিচ্ছেন, তখন পেছন থেকে নেভির লোকরা তাকে অপমান করবার জন্যে গালাগালি দিতে লাগলো। বেড়ালের ডাক ডাকতে লাগলো।

ব্যাপার দেখে গড্‌ফ্রে ভয় পেয়ে গেলেন।

এ-রকম ব্যবহার তো আর বরদাস্ত করা যায় না। এদের প্রশ্রয় দিলে এরা তো একদিন তাঁকে তাঁর চেয়ার থেকে হটিয়ে দেবে।

তিনি সঙ্গে-সঙ্গে হুকুম দিলেন, সকলকে এ্যারেস্ট করো—

তা তাই-ই করা হলো। আর সঙ্গে-সঙ্গে তার প্রতিবাদে সমস্ত জাহাজের নেভির লোকরা হঠাৎ ধর্মঘট করে বসলো, সে এক ভয়ঙ্কর ধর্মঘট। আমরা কেউ কোনও কাজ করবো না, আমরা কোনও নিয়ম-কানুন মানবো না। আমরা আজ থেকে বিদ্রোহ শুরু করে দিলাম, দেখি এ্যাড্‌মিরাল গড্‌ফ্রে কী করতে পারে?

বলে সব জাহাজের মাথা থেকে 'ইউনিয়ন জ্যাক্' ফ্ল্যাগ টেনে নামিয়ে দিলে আর তার জায়গায় কংগ্রেসের ন্যাশন্যাল ফ্ল্যাগ আর মুসলিম লীগের চাঁদ-তারা মার্কা ফ্ল্যাগ উড়িয়ে দিলে।

তার জের চললো কলকাতার পোর্টেও। সেখানেও নেভীর লোকরা সবাই বিদ্রোহ করবার জন্যে তৈরি হলো।

এ এক মহা দুর্যোগের দিন ইংরেজদের পক্ষে।

এমন সময় ইংলণ্ডের নতুন প্রাইম মিনিস্টার লর্ড এ্যাটলী ঘোষণা করলেন—আমি এবার ইণ্ডিয়াকে স্বাধীন করে দেব। এই কাজের জন্যে আমি ইণ্ডিয়াতে নতুন ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটনকে পাঠাচ্ছি।

ওদিকে মোহম্মদ আলি জিন্না আর বল্লভভাই প্যাটেলও বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্য করে কাগজে স্টেটমেন্ট দিলে ধর্মঘট তুলে নিতে।

তখন বিদ্রোহীদের তরফ থেকে ধর্মঘট তুলে নেওয়া হলো।

লর্ড এ্যাটলী সাহেবও বুঝলো যে, এর পর আর ইণ্ডিয়াতে থাকা চলবে না ইংরেজদের।

এর ফলে ইণ্ডিয়ার জেলখানায় যতো স্বদেশী লোকেরা বন্দী ছিল, তারা জেল থেকে ছাড়া পেলে।

জেল থেকে বেরিয়ে দেবব্রত বাইরের রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। সেখান থেকে সোজা এসে পৌঁছলো কাকার বাড়িতে।

গোষ্ঠ তখন বাজার করে ফিরছিল। কলকাতার পাড়ায়-পাড়ায় তখন উত্তেজনা। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছে ইংরেজরা। সন্ধ্যের পর থেকে আর কেউ বাইরে বেরোয় না। কেউ বাড়ি ফিরতে দেরি করলে বাড়ির লোক বড়ো ভাবনায় পড়ে। একবার বাড়ি থেকে কেউ বাইরে বেরোলে, আবার নিরাপদে বাড়িতে ফিরতে পারবে কিনা তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

গোষ্ঠই আগে দেখতে পেয়েছে। বললে, এ কি দাদাবাবু, আপনি? এখন কোথা থেকে আসছেন?

দেবব্রত বললে, জেল থেকে—

—এই-ই প্রথম এলেন?

দেবব্রত বললে, হাঁা, এতদিন তো জেলখানাতেই ছিলুম। এর পরে এখান থেকে দৌলতপুরে যাবো।

গোষ্ঠ দৌলতপুরের নাম শুনেই কী যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তা বলতে গিয়েও সে থেমে গেল।

দেবব্রত জিজ্ঞেস করলে, কাকা কোথায় রে ?

—বাবু তো দৌলতপুরে :

—সে কী ? কেন ?

গোষ্ঠ বললে, সে কী, আপনি শোনেন নি কিছু ?

—আমি কী শুনবো ? আমি তো জেলখানাতেই ছিলুম এতদিন, সেখানে বাইরের কোনও খবর পৌঁছতো না—

গোষ্ঠ আর কিছু না বলে বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেবব্রতকে বললে আপনি ভেতরে আসুন—

—কাকা যখন নেই তখন আর তোমাদের বাড়িতে ঢুকে কী হবে, আমিও দৌলতপুরে যাই—

গোষ্ঠ বললে, না না, ভেতরে এসে বসুন, এখুনি এলেন, একটু জিরিয়ে নিন। আমি আপনার জলখাবার তৈরি করে দিচ্ছি। চান-টান করুন। এতদিন পরে এলেন, এসেই চলে যাবেন ?

দেবব্রত বাড়ির মধ্যে ঢুকলো। গোষ্ঠও রান্নাঘরে গিয়ে দাদাবাবুর জন্যে জলখাবারের যোগাড় করতে লাগলো।

মানুষ যখন প্রথম চলতে শেখে তখন মাঝে মাঝে পড়ে যায়। কিন্তু পড়ে গেল বলে থেমে থাকলে তার চলে না। ভবিষ্যতে যাকে একদিন বড়ো হয়ে অনবরত চলতে হবে, তাকে এখন পড়ার জন্যে ভয় করলে চলবে না। তখন তো তার চলার সময়ে কেউই তাকে সঙ্গ দেবে না—একলা চলার প্রতিজ্ঞা নিয়েও তাকে দুর্গমের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

এ-সব কথা ছোটবেলায় সুলতান আহ্‌মেদ সাহেবই তাকে শিখিয়েছিলেন। তখন থেকেই সে জানতো যে তাকে চালাবে সে তার মন নয়, সে তার শরীর নয়, সে তার নিষ্ঠা। এই নিষ্ঠার জোরেই

একদিন প্রকৃতরূপে মানুষ হয়ে উঠবে সে। তার জন্যে তাকে সমস্ত রকমের কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

একদিন কলকাতাতে থাকতেই হলো তাকে।

পরের দিনই দেবব্রত গোষ্ঠকে বললে, আমি আজ যাই গোষ্ঠ, আর দেরি করতে পারবো না—

গোষ্ঠও সকাল-সকাল খাবার তৈরি করে দিলে। যোগাড়-যন্ত্র করবার প্রশ্নই আসে না। কারণ সঙ্গে তার মালপত্র, বাক্স-বিছানা কিছুই নেই। যেমন খালি হাতে পুলিশ তাকে ধরে জেলে পুরেছিল, তেমনি নিঃস্ব অবস্থাতেই তাকে তারা জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছে।

—আমায় কিছু টাকা দিতে পারো গোষ্ঠ?

গোষ্ঠ বললে, কতো টাকা চাই, বলুন না—

—এই দশ বারো টাকা যা পারো দাও। পরে দৌলতপুর থেকে টাকাটা তোমায় পাঠিয়ে দেব। ট্রেন ভাড়াটা সঙ্গে নিলেই চলবে।

সেই টাকা নিয়েই দেবব্রত তাড়াতাড়ি রওনা দিলে দৌলতপুরের দিকে। 'শেয়ালদা' স্টেশনে গিয়ে ট্রেনের টিকিট কাটতেই যা দেরি। টিকিটটা কেটে সে প্লাটফরমে ঢুকলো, একটা ট্রেন এসে পৌছলো ঠিক সেই সময়ে। সেই ট্রেন থেকে নামলো হাজার-হাজার লোক!

এত লোক তো আগে এমন করে নামতো না। দেখে মনে হলো তারা যেন সবাই দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসছে। কারো সঙ্গে অথর্ব বুড়ো-বুড়ি, কারো কোলে বাচ্চা ছেলে-মেয়ে। সকলেরই মুখে-চোখে আতঙ্কের ছাপ, সবাই-ই যেন বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত।

সেই ভীড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ দেখা গেল কাকাকে।

—কাকা, আপনি?

—তুই?

কাকা যতো অবাক, দেবব্রত ততো অবাক।

—আপনি কোত্থেকে? দৌলতপুর থেকে? আমি তো দৌলতপুরেই যাচ্ছি—

কাকা বললে, তোকে আর দৌলতপুরে যেতে হবে না। আমিও সেখান থেকেই ফিরছি। সেখানে আর কেউ নেই—

—নেই মানে?

কাকা তাকে হাত দিয়ে ধরে বললেন, চল্, আমার বাড়িতে চল্। তোকে সব বলবো।

বলে রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি ধরেই তাতে দেবব্রতকে ওঠালেন।

গাড়িতে আসতে আসতেই দেবব্রত জিজ্ঞেস করেছিল, দৌলতপুরে গিয়ে কেমন দেখলেন আপনি? সবাই ভালো তো?

কাকা কথাটা এড়িয়ে গেলেন। বললেন, তুমি এতদিন জেলখানায় ছিলে, বলো, কোনও অসুবিধে হয়েছিল নাকি?

—অসুবিধে তো হবেই। আরামের জন্যে তো কেউ জেলে যায় না।

কাকা এ-কথার জবাবে কিছু বললেন না। শুধু বললেন, এদিকে দেশের অবস্থাও তো খুব খারাপ। তুমি কিছু শুনেছ?

—আমি তেমন কিছু শুনিনি। আর আপনি তো জানেন, আমি এমনিতেও কখনও বাজে কথা নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করি না।

—তবু, কানে তো কিছু আসতে পারে।

—কানে কিছু এসেছে, কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করিনি।

—কী কানে এসেছে তোমার?

—সবাই বলছিল বৃটিশ গভর্মেণ্ট নাকি ঠিক করেছে যে, তারা ইণ্ডিয়া ছেড়ে চলে যাবে। তাই তারা কে এক লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে নাকি এখানে ভাইসরয় করে পাঠিয়েছে।

গোলকেন্দুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি মনে করো ইংরেজরা এ-দেশ ছেড়ে চলে যাবে?

—আমার তো সন্দেহ হয়—

কাকা বললেন, আমারও সন্দেহ হয়। সেই জন্যেই তো তারা সমস্ত দেশে আগুন জ্বেলে দিয়েছে।

—কীসের আগুন?

কাকা বললেন, হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের লড়িয়ে দিয়েছে যে।

—তাই নাকি?

কাকা বললেন, সেই জন্যেই তো পার্ক-সার্কাস অঞ্চলে যতো হিন্দু ছিল সবাই শ্যামবাজার, ভবানীপুর, আলিপুরে চলে এসেছে। আর

আমাদের এদিকে যতো মুসলমান ছিল, সবাই পার্ক-সার্কাসে চলে গেছে। তাই তো এতদিন সন্ধ্যের পর কারফিউ চলছিল। সেইসব দেখেই তো আমি দৌলতপুরে চলে গিয়েছিলুম।

-- সেখানে গিয়ে কী দেখলে ?

এ-কথার উত্তর দেওয়ার আগেই হঠাৎ দেখা গেল রাস্তা বন্ধ! একদল পুলিশ বন্দুক নিয়ে সব গাড়ি-ঘোড়া-বাস-ট্রাম আটকে দিচ্ছে। ওদিকে যাওয়া নিষেধ। তাদের ট্যাক্সিকেও তারা অন্য রাস্তায় ঘুরিয়ে দিলে।

কাকা বললেন, হঠাৎ আবার কী হলো ? আবার গণ্ডগোল শুরু হলো নাকি ?

অথচ দেবব্রত কয়েক ঘণ্টা আগে ওই পথ দিয়েই এসেছে। তখন অতো পুলিশ-পাহারা দেখেনি। আসলে তারা লাল-পাগড়ি পরা পুলিশ নয়, প্যারা মিলিটারি পুলিশ।

কাকা বললেন, ক'দিন আগে অনেক লোক মারা গিয়েছিল। তাই গান্ধীজী এখন কলকাতায় এসে রয়েছেন। উনি না এলে আরো খুনোখুনি হতো।

বাড়িতে আসার পর গোষ্ঠ জিজ্ঞেস করলে, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন যে ?

গোলকেন্দুবাবু বললেন, কাজ হয়ে গেল, তাই ফিরে এলুম।

তখনও কিন্তু তাঁর মনের ভয় যাচ্ছে না। বললেন, হ্যাঁরে, কলকাতার খবর কী ? আর খুন-খারাবি হয়েছে এখানে ?

গোষ্ঠ বললে, হ্যাঁ, এখানেও খুনোখুনি হয়েছে খুব। সন্ধ্যের পর কেউ আর বাড়ি থেকে বেরোয় না। আপনি চলে যাওয়ার পর এখানে খুনোখুনি আরো বেড়ে গিয়েছিল—এখন একটু থেমেছে।

দেবব্রত বললে, আমি তাহলে এই সময়ে দৌলতপুরে যাই। ওখানে বাড়িতে কে কেমন আছে দেখি গিয়ে। আমাদের ছেলেরা সব রয়েছে ওখানে। তারা খবরও পাচ্ছে না আমি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি কিনা, তারাও খুব ভাবছে—

গোলকেন্দুবাবু বললেন, দেশের এই অবস্থায় ওখানে গিয়ে তোমার

কী হবে? অবস্থা একটু স্বাভাবিক হোক, তখন যেও।

কিন্তু দেবব্রত পীড়াপীড়ি করতে লাগলো দৌলতপুরে যাওয়ার জন্যে। সে যাবেই সেখানে কারণ তার ক্লাবের সব ছেলেরা সেখানে কী করছে তার খবর নেওয়া দরকার।

জিজ্ঞেস করলাম, তারপর?

১৯৪৬ সালের আগস্ট মাস থেকেই দেশের হালচাল খারাপ হচ্ছিল। তারপর আরো এক বছর কেটে গেছে। তখন অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেল। কলকাতায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে খুনোখুনি লাঠালাঠি সেই ১৯২৫ থেকেই তা চলে আসছিল। কিন্তু ১৯৪৬ সালেই খুনোখুনিটা আরো বিরাট আকার ধারণ করলো। তারপর এলো ১৯৪৭ সাল।

তখন থেকেই গণ্ডগোলটা আরো বেড়ে গেল। একদিন কাকাকে না বলেই দেবব্রত দৌলতপুরে চলে গিয়েছিল। তিনি তখন বাড়িতে ছিলেন না।

একদিন বাড়িতে এসে দেবুকে না পেয়ে গোষ্ঠকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, তোর দাদাবাবু কোথায়?

গোষ্ঠ বললে, তা তো জানি না বাবু, তিনি তো খেয়ে-দেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

গোলকেন্দুবাবুর খুব ভয় হলো। তখন দিন-কাল খুব খারাপ, এ-সময়ে কোথায় গেল সে? একদিন কাটলো, দু'দিন কাটলো, তবু দেবুর দেখা নেই। বড়ো ভাবনায় পড়লেন তিনি।

তিনি বুঝতে পারলেন না কোথায় যাবেন, কার কাছে যাবেন। কাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন দেবুর কথা। কে বলতে পারবে তার

ঠিকানা ? তবে কি দেবু সেই দৌলতপুরেই ফিরে গেল ?

কিন্তু দেবব্রতর কথা ভাবলে তো চলবে না তাঁর। তাঁরও তো স্কুল আছে, ছাত্ররা আছে। তাদের কথাও তো ভাবতে হবে।

সেদিনও ছাত্ররা বাড়িতে পড়তে এলো। তিনি তাদের নিয়ে পড়াতে বসলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত মনটা পড়ে রইলো সেই দেবুর দিকে।

তবে কি দেবুর কোনও বিপদ-আপদ হলো ?

তখনকার কলকাতার যা অবস্থা তাতে সব কিছুই সম্ভব। কারো জীবনের কোনও নিশ্চয়তা নেই। যে কেউ যে কোনও দিন নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারে।

শেষকালে চারদিন পরে দেবু এসে হাজির হলো। দেবুর শরীরের অবস্থা দেখে তিনি চমকে উঠলেন। তার মুখে শরীরে আঘাতের চিহ্ন। রক্তের দাগ লেগে আছে তার জামা-কাপড়ে।

তিনি দেবুকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

দেবু তখন ভালো করে কথাই বলতে পারছে না।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গিয়েছিলে তুমি ? তোমার এ-দশা কে করলে ? প্রথমে কথার উত্তরও দিতে পারলে না দেবু।

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, বলো দেবু, তুমি কোথায় গিয়েছিলে ? কোনও কথারই জবাব দিতে পারে না দেবু।

তিনি গোষ্ঠকে বললেন, পাড়ার ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনতে।

শেষকালে ডাক্তারবাবু এসে দেখে শুনে পরীক্ষা করে বললেন, মনে হচ্ছে, কেউ কোনও ভারি জিনিস দিয়ে ওকে আঘাত দিয়েছে।

তিনি ওষুধ দিয়ে গেলেন আর একটা ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেলেন।

সেই ওষুধটা খেয়ে দেবু একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লো।

কয়েক ঘণ্টা ঘুমের পর যখন সে চোখ খুললো তখন গোলকেন্দুবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছিল তোমার ? কেউ তোমায় কি মেরেছে ? আমি কতো করে বললাম কোথাও বেরিও না। দিনকাল বড়ো খারাপ। এখন যতোটা সম্ভব বাড়ির বাইরে বেরোন উচিত নয়। তবু বেরোলে কেন ? কী হলো তোমার ? এ-রকম হলো কেন তোমার ?

তবুও কোনও জবাব দিলে না দেবু। তারপর আবার ঘুমিয়ে

পড়লো সে। কাকা ভাবলেন—ঘুমোনই ভালো। আরও ঘুমোক—বলে আর দেরি করলেন না। তাঁরও তো স্কুল আছে, তাঁরও তো ছাত্ররা আছে। সে-দিকটাও তো দেখতে হবে তাঁকে।

সেদিন দেবুর অবস্থা একটু ভালো বলে মনে হলো। কাকা মুখের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, এখন কেমন আছো তুমি দেবু?

দেবু কোনও উত্তর দিলে না কাকার প্রশ্নের।

কাকা আবার জিজ্ঞেস করলেন. কোথায় গিয়েছিলে তুমি এ ক'দিন?

দেবু বললে, দৌলতপুরের খবর তো আমায় কিছুই বলেননি আপনি? বললে ক্ষতি কী হতো?

গোলকেন্দুবাবু বললেন, দৌলতপুরের কী কথা?

—আমার বাবা মা সবাই মারা গেছেন. সে-কথা তো আমায় বলেননি।

—তুমি কী দৌলতপুরে গিয়েছিলে নাকি?

দেবু বললে, হ্যাঁ—

—তুমি দুঃখ পাবে বলেই কিছু বলিনি। জানলে তো তুমি তার প্রতিকার করতে পারতে না?

দেবু বললে, কে বললে আমি প্রতিকার করতে পারতুম না? আমি ওখানে থাকলে এত অনাচার, এত অত্যাচার হতে দিতুম না? আমি আমাদের ক্লাবের ছেলেদের নিয়ে সব মানুষকে বাঁচাতাম। দরকার হলে জীবন দিতুম।

—কিন্তু আমি যাওয়ার আগেই তো সব সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। আমি তো দৌলতপুরে গিয়ে সব শুনেই চলে এলাম। আমার তো অতো তাড়াতাড়ি ফিরে আসার কথা নয়। আমি ওখানে গিয়েছিলুম দু'চারদিন থাকবো বলে। কিন্তু দৌলতপুরে পৌঁছিয়েই দেখলুম যে আমার যাওয়ার আগেই সব সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। তবু আমি ওখানে থাকতুম। কিন্তু ওরাই আমাকে ফিরে আসতে বললে। ওরাই বললে, এখানকার লোক সবাই ক্ষেপে গেছে, এখানে থাকলে আপনাকে আমরা আর বাঁচাতে পারবো না।

দেবু শুনছিল আর কথাও বলছিল। কিন্তু চোখ দিয়ে তার এক ফোঁটা জলও পড়ছিল না।

কাকা জিজ্ঞেস করলেন, আর মিনতির কথা শুনেছ তো ?

দেবু বললে, হ্যাঁ—

—কিন্তু কেন এমন হলো বলো তো ? মিনতি অতো ভালো মেয়ে, সে কেন অমন করলে ? জীবন দিতে পারলে না মিনতি ? এর চেয়ে তো জীবন দেওয়াও ভালো ছিল। অথচ সাহাবুদ্দীনও তোমায় কতো শ্রদ্ধা করতো। প্রাণের মায়া কি ইজ্জতের চেয়েও বড়ো হলো ? ইজ্জত বড়ো, না জীবন বড়ো ?

তারপর একটু থেমে তিনি আবার বললেন, যাক্‌গে, যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আর ভাবনা করে লাভ নেই।

দেবু বললে, অথচ আপনি তো জানেন, সুলতান আহ্‌মেদ সাহেব কতো মহৎপ্রাণ মানুষ ছিলেন। তারপর কতো লোক এই দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে কতো নিষ্ঠুরভাবে প্রাণ দিলে। আজ কি তার এই পরিণতি ?

—তুমি দৌলতপুরে যাওয়ার আগে যদি এ-সম্বন্ধে আমাকে একবার বলতে, তাহলে আর তোমার এই কষ্ট হতো না!

দেবু চুপ করে রইল। গোলকেন্দুবাবু খানিক পরে বললেন, শেষকালে সাহাবুদ্দীনও কিনা তোমার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করলে ? এককালে সেও তো তোমার ছাত্র ছিল! ছিল না ?

দেবু বললে, আপনি তো জানেন সব!

কাকা বললেন, হ্যাঁ, সবই তো আমি জানি। তুমি তো বিয়ে করতেই চাওনি কখনো, শুধু আমি কেন, সে-কথা দৌলতপুরের সবাই জানে। তুমি তো কেবল মুচিপাড়ায় কিংবা মুসলমানপাড়ায়, কোথায় কে অসুখে পড়েছে, কার কী বিপদ হয়েছে, কে খেতে পাচ্ছে না, তাই নিয়েই থাকতে। বাড়ির ভালো-মন্দর কথা তো কখনও তুমি ভাবোনি। দাদার তো সেইটাই দুঃখ ছিল! দাদা অনেকবার আমার কাছে এই বলে দুঃখ করেছে যে, দেবু আমাদের কাউকে দেখে না।

এবার দেবু কিছু উত্তর দিলে না।

কাকা আবার জিজ্ঞেস করলে, তা তোমার সঙ্গে গাঁয়ের কারোর সঙ্গে দেখা হলো না?

দেবু বললে, আমি তো দৌলতপুরে যেতেই পারলুম না—

—কেন?

দেবু বললে, স্টেশনে নেমে একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে যেই একটুখানি গেছি, তখনই গুণ্ডারা এসে আমার গাড়িকে থামিয়ে দিলে।

—সে কী?

দেবু বললে, হ্যাঁ, দেখলুম সেই যশোর আর সে-যশোর নেই। এরই মধ্যে সেখানে সব কিছু বদলে গিয়েছে। কারো বাড়িতে আলো জ্বলছে না। আমাকে গাড়ি থেকে তারা ধরে-বেঁধে নামিয়ে দিলে।

—তুমি তোমার নাম-ধাম বলেছিলে?

—হ্যাঁ, আমি ভেবেছিলুম আমার নাম বললে সবাই চিনতে পারবে। কিন্তু তা হলো না। উল্‌টে আমাকে গালাগালি দিতে লাগলো। অথচ আমি তো কোনও দোষ করিনি।

—তারপর?

তারপরের ঘটনাও বললে দেবু। শেষকালে তার বহুকালের বন্ধু রসুল মিয়ার সঙ্গে সেখানে দেখা হয়ে গেল।

রসুল দৈবক্রমে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সে দেবুকে চিনতে পেরেছে। বললে, আরে দেবুদা না?

সেদিন রসুল মিয়া সেখানে না থাকলে কী যে হোত তা বলা যায় না। সেই রসুলই তাকে গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। সেই তাদের বাড়িতে গিয়েই দেবব্রত দৌলতপুরের সব খবর জানতে পারলে। একদিন নাকি হঠাৎ একদল গুণ্ডা তাদের বাড়িতে যাদের সামনে পেয়েছে তাদের—বাবা-মা-রাখাল কেউ-ই বাদ পড়েনি।

—আর মিনতি?

—রসুল বললে, সাহাবুদ্দীন এসে নাকি তার একদিন আগেই মিনতিকে নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে। তার হদিস কেউ জানে না।

তারপর রসুলও আর বেশিদিন দেবুকে নিজে না রেখে ট্রেনে

তুলে দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাতেও দেবু রেহাই পায়নি। ট্রেনও পুরোপুরি কলকাতা পর্যন্ত আসতে পারেনি। কোনও রকমে দর্শনা স্টেশন পর্যন্ত এসে থেমে গিয়েছিল। তারপর দু'মাইল হেঁটে এপারে এসেছে। সে যে কতো কষ্ট, কতো অত্যাচার, কতো ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে, চেক্‌পোস্টেও কতো হয়রানি সহ্য করতে হয়েছে, তার ঠিক নেই। এপারে মুসলমানদের যতো অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে, ওপারের হিন্দুদেরও তেমনি অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে।

সব শুনে গোলকেন্দুবাবু বললেন, এর শেষ কোথায় তাই আমি কেবল ভাবছি। আমারও তো তোমার মতো অবস্থা হয়েছিল। আমি বেঁচে গিয়েছিলাম এই জন্যে যে, নতুন লোক বলে আমি হিন্দু কি মুসলমান তা কেউ চিনতে পারেনি। আমি নিজেও কাউকে আমার পরিচয় দিইনি। যখনই শুনলাম দাদা আর বউদি খুন হয়ে গিয়েছে, তখন আর দাঁড়াইনি সেখানে, আর ট্রেনটা সেদিন ঠিক সময়ে চলেছিল।

কলকাতায় ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের সেই দিনে প্রায় এক লক্ষ লোক জড় হয়েছে নারকেলডাঙার একটা মাঠে। তার মধ্যে হিন্দু আছে, খ্রীষ্টান আছে, মুসলমান আছে। গরীব ভিখিরি আছে, পয়সা-ওয়ালা বড়লোকরাও আছে। যাদের এতদিন দাঙ্গার ভয়ে বাড়ি থেকে বেরোবার সাহস হয়নি, তারাও জড়ো হয়েছে সেখানে। আর শুধু কি তাই, আশেপাশের চারদিকের বাড়ির ছাদে, বারান্দায় হাজার-হাজার লোক সেই মাঠের দিকে হাঁ করে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবারই আগ্রহ গান্ধীকে দেখতে, গান্ধীর কথা শুনতে। তারা খবরের কাগজে পড়ে জানতে পেরেছে, পাঞ্জাবে দিল্লীতে লক্ষ-লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, লক্ষ-লক্ষ মানুষ সব সম্পত্তি ফেলে রেখে প্রাণের দায়ে দিল্লী ছেড়ে

পাঞ্জাবের পাকিস্তানে চলে গিয়েছে, আর ওদিকে পাঞ্জাবের দিক থেকেও লক্ষ-লক্ষ মানুষ তাদের সব সম্পত্তি ছেড়ে দিল্লীতে চলে এসেছে। কতো মানুষ যে তার ফলে প্রাণ হারিয়েছে, তার রেকর্ড কোথাও নেই। সেখানকার খবর যতো কলকাতায় এসে পৌঁছোচ্ছে, এখানে এই কলকাতায়ও ততো লোকের প্রাণ ভয়ে শিউরে উঠছে। পূর্ব পাকিস্তানেও ততো হাঙ্গামা শুরু হচ্ছে। পাকিস্তান থেকে যারা যারা ফিরে দিল্লীতে এসে পৌঁছোচ্ছে, দিল্লীতে কলকাতায় ঢাকাতেও তার নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়া হচ্ছে।

এর মধ্যে একটু শুধু আশার আলো দেখিয়েছেন গান্ধীজী। তিনি দিল্লী ছেড়ে কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন। এসে উঠেছেন সাধারণ একটা বস্তি-পাড়ায়ঃ যেখানে মুসলমানরাও থাকে, আবার হিন্দুরাও থাকে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি করে।

এক সময় তিনি এসে পৌঁছলেন সেই ভিড়ের মধ্যে। তাঁদের দুঃখের কথা ভেবে তিনি তাঁদের মধ্যে এসেছেন। তাঁর কথা শুনতেই কলকাতার হিন্দু-মুসলমান সবাই একই আসরে এসে জুটেছে।

তারপর যখন সেই দুর্বল মানুষটা এসে মঞ্চের ওপর উঠলেন, তখন লক্ষ-লক্ষ মানুষের ভিড়ের মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত রহস্যময়তার স্রোত বয়ে গেল!

—ভাইও ওউর বহিনো—

জমায়েতের সমস্ত লোক উৎকর্ণ হয়ে শুনছে গান্ধীজীর কথা।

—আমাকে চারদিক থেকে লোকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। আমি নাকি কলকাতার সাম্প্রদায়িকতার সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি। আমি কেউ নই। এই সম্মান আমার নয় আপনাদের। আপনাদের শুভবুদ্ধির জন্যেই এটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এটা সাময়িক শান্তি না স্থায়ী শান্তি তা আমি জানি না। যদি সাময়িক শান্তি হয় তাহলে কিন্তু ভয়ের কথা। একে স্থায়ী করতে গেলে আপনাদের সকলের সমবেত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আমার একলার দ্বারা এ সম্ভব হবে না। আমি তো এর জন্যে আমার সকল চেষ্টা চালিয়ে যাবোই, কিন্তু আপনারাই আমার ভরসা। আপনাদেরও সাহায্য করতে হবে

আমাকে। সাম্প্রদায়িকতা একটা ক্যানসারের ক্ষতের মতো। তা নিরাময় করতে হলে চাই চিকিৎসা। অহিংসাই হলো সেই চিকিৎসা। যে-দেশের স্বাধীনতার জন্যে হাজার-হাজার মানুষ বহু বৎসর ধরে অসহ্য কষ্ট স্বীকার করেছে, হাজার-হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছে, সেই তাদের ত্যাগ মিথ্যে হয়ে যাবে, যদি আমরা পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরে হিংসা আর কলহে প্রবৃত্ত হই। আমাদের এক হতে হবে, আমাদের সংযমী হতে হবে। তা হতে পারলে তবে দেশের কল্যাণ হবে, আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়া সার্থক হবে—

—তারপর ?

যে ছেলেটি গল্প করছিল সে তারক। তারক সরকার গোলকেন্দুবাবুর ছাত্র। সে দক্ষিণ কলকাতায় থাকে, কিন্তু গান্ধীর বক্তৃতা শুনতে অনেকের সঙ্গে সেও নারকেলডাঙ্গায় গিয়েছিল।

গোলকেন্দুবাবুও শুনছিলেন। বললেন, তারপর কী বললেন গান্ধীজী ?

তারক বলতে লাগলো, তারপর তিনি বললেন যে, আমি জানি কলকাতার বাঙালীরা আমার কথা শুনবে। কিন্তু দুঃখের কথা এখনও কলকাতায় এমন এলাকা আছে, যেখানে হিন্দুরা থাকতে ভয় পাচ্ছে, আবার এমন এলাকাও আছে, যেখানে মুসলমানরা থাকতে ভয় পাচ্ছে। ঈশ্বরের চোখে আমরা সবাই এক। যদি এখনও সে-সব জায়গায় সব ধর্মের সব বিশ্বাসের মানুষ একসঙ্গে বাস না করতে পারে, তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতা মিথ্যে হয়ে যাবে। তা হলে দেশ একবার ভাগ হয়েছে, তখন আবার আরো অনেক ভাগ হয়ে যাবে—

দেবব্রত বললে, এখন এ-সব কথা বললে কী হবে। তখন গান্ধী এ-সব কথা বলতে পারলেন না, যখন ইংরেজরা দেশ ভাগ করে দিলে ? তখন গান্ধী কোথায় ছিলেন ? তখন তিনি হাঙ্গার স্ট্রাইক করতে পারলেন না ?

গোলকেন্দুবাবু বললে, তুমি চুপ করো দেবু। তুমি সবে অসুখ থেকে উঠেছ, এখন তোমার অতো উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়।

দেবু বললে, আমি উত্তেজিত হবো না তো কী হবো ? তাহলে

বিনয়দা, দীনেশদা, বাদলদা কেন সিমসন্ সাহেবকে খুন করে নিজেরা প্রাণ দিলে? কেন ভগৎ সিং, সুকদেব, যতীনদা এই স্বাধীনতার জন্যে জীবন ত্যাগ করলে? তারা কি এই রকম স্বাধীনতার জন্যেই প্রাণ দিয়েছিল? সকলের সমস্ত আত্মত্যাগের ফলে কার সুবিধে হলো?

গোলকেন্দুবাবু বললেন, তুমি চুপ করো দেবু, উত্তেজিত হলে তোমারই শরীর খারাপ হবে।

দেবু বললে, আমি উত্তেজিত হবো না তো কে উত্তেজিত হবে? দেশে কি একটা মানুষ আছে? তারা তো ঠাণ্ডা মাথায় সব মেনে নিয়েছে। তারা কি মানুষ? তারা গান্ধীকে খুন করতে পারলে না? জওহরলাল নেহরুকে খুন করতে পারলে না? বল্লভভাই প্যাটেলকে খুন করতে পারলে না? কেন আমার বাবা-মা কা'র জন্যে খুন হয়ে গেল? তারা কী দোষ করেছিল? কেন সাহাবুদ্দীন মিনতিকে নিয়ে পালিয়ে গেল? এর জন্যে কে দায়ী? লর্ড মাউন্টব্যাটেন না গান্ধী, না নেহরু, না প্যাটেলজী? সমস্ত দেশের সর্বনাশ করে এখন মুখে শান্তির বুলি আওড়াচ্ছে সব। এই সব লোকরা যতদিন দেশে থাকবে, ততোদিন দেশের কিছু ভালো হবে না—। ঠিক আছে, আমি এর কী প্রতিকার করবো—

গোলকেন্দুবাবু বললেন, কী প্রতিকার করবে তুমি?

—জানি না আমি কোনও প্রতিকার করতে পারবো কিনা। যদি তা করতে পারি তখন আপনি তা দেখতে পাবেন।

কিন্তু দেবব্রত বড়ো একলা পড়ে গেল সেইদিন থেকে। তবে তার একটাই ভরসা ছিল যে একলা লড়াইতে কখনও ফাঁকি থাকে না। দেশের সমস্ত লোক যেন দেশটাকে নিজের নিজের সম্পত্তি বলে ধরে নিয়েছে। সেই সম্পত্তিটাকে ভাঙিয়ে সবাই যেন নিজের-নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে চাইছে। বিছানায় যতোদিন দেবব্রত শুয়ে থাকতো ততোদিন কেবল একই ভাবনাগুলো তার মাথাটা কুরে কুরে খেত। কেন সবাই এমন হয়ে গেল? যারা দেশের কর্ণধার হয়ে গেল তারা কি কোনওদিন দেশের মানুষের কথা ভেবেছে? মানুষের কি ভালো করতে চেয়েছে তারা? জেলে যাওয়াটা কি বড়ো ত্যাগ? যে-সব

লোকরা এখন দেশের লীডার তারা তো জন্ম থেকেই বড়োলোকের ছেলে। কাকে বলে ত্যাগ তা কি তারা কখনও করেছে? তারা তো সবাই-ই নিজের স্বার্থের কথাই কেবল ভেবেছে। নিজের পৈত্রিক সম্পত্তির ভোগ-দখল করেই জীবন কেটেছে। কেউ বিলেতে গেছে ব্যারিস্টারি পড়ে টাকা উপায় করতে, কেউ বা অনেক পৈত্রিক টাকা থাকার ফলে অন্য কোনও কিছু কাজ করবার নেই বলে রাজনীতি করে সকলের মাথায় বসবার মতলবে এখানে এসেছে। কিন্তু একজনও তো মানুষের ভালো করবার মতলবে আসেনি। যে-লোকটা সত্যিকারের দেশভক্ত ছিল সে তো নেই। সে আজ এখানে থাকলে কি এমন অবস্থা হতো? এমন করে দেশ টুকরো টুকরো হতো?

তারকই তাকে বলে গিয়েছিল, স্বাধীনতা যেদিন প্রথম এলো সেদিন নাকি বাসে-ট্রামে-ট্রেনে কেউই ভাড়াই দেয়নি। কেন? কেন ভাড়া দেয়নি?

তারক বলেছিল, শুধু তাই-ই নয় দাদা, সবাই নাকি রাজভবনে ঢুকে লাটসাহেবের বাড়িতে ঢুকে গিয়ে লাটসাহেবের শোবার বিছানার ওপরে উঠে জুতো পায়ে দিয়ে দুম-দাম করে নেচেছিল, দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলো ছাতার বাঁট দিয়ে ভাঙচুর করেছিল, লাটসাহেবের আসবাব-পত্র সব কিছু তছ্-নছ্ করেছিল—

—কেন?

দেবব্রত জিজ্ঞেস করেছিল, কেন এমন করতে গেল তারা?

তারক বলেছিল, তাদের আনন্দ হয়েছিল তাই করেছিল। আগে তো কেউ লাটসাহেবের বাড়িতে ঢুকতে পেত না। তাই এখন যা-ইচ্ছে-তাই করবার অধিকার পেয়ে গেল—

—কেউ কিছু বারণ করেনি?

—না।

দেবব্রত জিজ্ঞেস করেছিল, যারা বাড়ির দেখা-শোনা করতো এতদিন, তারা তখন কোথায় ছিল?

তারক বলেছিল, তারাও তখন তাদের ডিউটি ছেড়ে ফুর্তি করতে বেরিয়েছিল, তারাও জেনে গিয়েছিল যে তারা স্বাধীন হয়ে গেছে।

ডিউটি না করলেও তারা ঠিক তাদের মাইনে পেয়ে যাবে।

কথাগুলো শুনে দেবব্রত আর কোনও কথা বলেনি। চুপ করে শুধু ভেবেছিল।

প্রত্যেক দিনের মতো সেদিনও গোলকেন্দুবাবু ঘরে এসেছিলেন।

জিজ্ঞেস করেছিলেন, আজ কেমন আছো দেবু?

দেবু বললে, ভালো না—

—কেন? আবার কী হলো?

দেবু বললে, আর শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে না।

—শুয়ে থাকতে কি কারো ভালো লাগে? কিন্তু কী করবে বলো? শরীর ভালো হলে তখন উঠে বোস, তখন আবার নড়া-চড়া কোর।

দেবু বললে, না, শরীর আমার ভালো আছে, মন ভালো নেই।

—কেন? মনের কী হলো তোমার?

—চারদিকের অবস্থা দেখে শুনে কিছ্ছু ভালো লাগছে না আমার।

—চারদিকের কী অবস্থা আবার দেখলে তুমি?

দেবু বললে, আপনি তো সবই দেখছেন। এ-সব দেখে আপনার মনে কষ্ট হচ্ছে না?

—কোন্ অবস্থা?

—এই যে শুনলুম নাকি কেউ বাসে-ট্রামে-ট্রেনে ভাড়া দেয় না, টিকিট কাটে না; কেউই নাকি কারো ডিউটি করে না। সবাই কাজে ফাঁকি দেয়। আরো আরো অনেক রকমের কথা শুনছি, কিছু-কিছু খবরের কাগজেই পড়ছি। এ-রকম করলে এ-দেশের কী হবে? এ-দেশের মানুষদের কী হবে?

—ও, তুমি বুঝি ওই সব কথাই ভাবছো?

দেবু বললে, ভাববো না? আমি তো সারাজীবন ওই সব কথাই ভেবে এসেছি। তখন ভেবেছি ইংরেজরা চলে গেলেই আমরা ভালো হবো, আমরা মানুষ হবো, আমরা ঠিক-মতো কাজ করবো। এ তো দেখছি উল্‌টো হলো।

—কী উল্‌টো হলো?

দেবু বললে, এই যে হিন্দুরা মুসলমানদের খুন করে ফেলছে,

মুসলমানরা হিন্দুদের খুন করে ফেলছে। কেউ অফিসে কাজ করছে না, এই যে পাকিস্তান হিন্দুস্থান হলো, তবু তো খুনোখুনি বন্ধ হলো না, সবাই অফিসে গিয়ে ফাঁকি দিতে আরম্ভ করেছে, আর যারা সারাজীবন মন-প্রাণ দিয়ে দেশ সেবা করলে, তাদের ঠেলে-ঠেলে দিয়ে সুবিধেবাদীরা সামনে এগিয়ে সব বড়ো-বড়ো পোস্টগুলোতে জাঁকিয়ে বসলো, সামনের সারিতে গিয়ে বসলো, কে মন্ত্রী হবে তাই নিয়ে ঝগড়া মারামারি করতে শুরু করে দিলে, এ-রকম ব্রিটিশ আমলে ছিল না। এর চেয়ে তো দেখছি ইংরেজ-আমলই ভালো ছিল। তখন অন্তত: গুণের কদর ছিল, পরিশ্রমের দাম ছিল, নিষ্ঠার পুরস্কার ছিল। এখন তো আমরা ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি, এখন তো আমাদের দায়িত্ব আরো বেড়ে গেল। এখন তো আর বিদেশীরা নেই। এখন তো আরো মন দিয়ে কাজ করা উচিত।

দেবব্রত দিন-রাত শুয়ে-শুয়ে কেবল এই সব কথাই ভাবতো আর কাকা কিছু জিজ্ঞেস করলেই এই সব কথাই কেবল বলতো।

অথচ কোথায় রইলো তার বাবা, কোথায় রইলো তার মা, কোথায় রইলো মিনতি, কোথায় রইলো তার দৌলতপুর! সে-সব কথা কাউকে সে কখনও বলতোও না, তাদের কথা সে ভাবতো কিনা তাও কেউ বুঝতে পারতো না।

গোলকেন্দুবাবু গোষ্ঠকে বলে রেখেছিলেন যে সে যেন দেবুর ওপর একটু নজর রাখে। সে যেন ঘর ছেড়ে কোথাও বেরিয়ে না পড়ে।

গোষ্ঠ কাজের ফাঁকে-ফাঁকে এক-একবার বাইরে থেকে দেবুকে দেখে যেতো। এমন ভাবে দেখে যেতো যাতে দাদাবাবু জানতে না পারে। সে দেখতো দাদাবাবু কখনও খবরের কাগজ পড়ছে, কখনও কোনও বই পড়ছে, বা চুপ করে বসে ওপর দিকে চেয়ে কী ভাবছে! কিংবা কখনও বিড়-বিড় করে কী-সব কথা বলছে।

—কে? কে? কে?

দেবব্রতর মনে হতো কে যেন তার ঘরে ঢুকছে। যখন তার প্রশ্নের জবাব কেউ দিত না, তখন আবার সে চুপ করে শুয়ে থাকতো।

গোলকেন্দুবাবু যখনই ঘরে ঢুকতেন তখনই জিজ্ঞেস করতেন, আজ

কেমন আছো ?

দেবু বলতো, ভালো—

—যদি ভালো আছো তো সমস্তদিন শুয়ে-বসে থাকো কেন ?

দেবু বলতো, কিছু ভালো লাগে না।

—কেন ভালো লাগে না ?

দেবু বলতো, ভালো লাগবে কী করে ? সমস্ত দেশ যে গোল্লায় গেল, সমস্ত মানুষ যে খারাপ হয়ে গেল। সুভাষ বোস তাহলে কেন প্রাণ দিলেন ? বিনয়দা কেন অমন করে মারা গেলেন ?

আরো অনেক কথা দেবুর বলবার ইচ্ছে হতো, কিন্তু কান্নার আবেগে তা আর বলতে পারতো না।

গোলকেন্দুবাবু তখন একজন মানসিক-রোগের ডাক্তারকে ডেকে দেবব্রতকে দেখালেন। পরীক্ষা করে তিনি বললেন, রোগী খুব শক্ পেয়েছে। একটু সময় লাগবে সারতে।

তা তাই-ই হলো। সেই ডাক্তারের ওষুধেই কয়েক মাসের মধ্যেই দেবব্রত বিছানায় উঠে বসলো। তারপর একটু-একটু করে ঘরের মধ্যেই পায়চারি করতে লাগলো। তারপরে ঘরের বাইরেও বেরোতে লাগলো। তারপরে কাকার ছাত্রদের পড়াতেও লাগলো।

ছাত্ররা দেবব্রতর পড়ানো খুব পছন্দ করতো। তারা তার কাছে পড়ে স্কুলে-কলেজে পরীক্ষায় আরো ভালো ফল করতে লাগলো।

গোলকেন্দুবাবু সব দেখে শুনে একদিন বললেন, দেখলে তো, তোমার কথা অনুযায়ী পৃথিবী চলে না।

দেবু কোন উত্তর দিলে না এ কথার।

আবার বললেন, তুমি চাও আর না চাও, ইতিহাস এগিয়ে চলবেই। পিছিয়ে যেতে যেতেও আবার সামনের দিকে এগিয়ে চলবে। তোমার কথায় সে চলবে না। কারো কথাতেই সে চলবে না। গান্ধীজী মারা গেছেন, তা বলে কী দেশ থেমে গেছে—

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, তুমি জানো না বোধহয় যে তোমার সেই ছাত্র সাহাবুদ্দিন! সাহাবুদ্দিনের কথা তোমার মনে আছে তো ? যে মিনতিকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সে এখন

পাকিস্তানের মিনিস্টার হয়েছে। মিনতিকে বিয়েও করেছে সে।

দেবব্রত এ-সব কথার কোনও উত্তর দিলে না।

গোলকেন্দুবাবু বললেন, দেখলে তো ইতিহাস কাকে বলে? ইতিহাস তোমার আমার, তোমার বাবা-মা'র কারোরই পরোয়া করে না। হিটলার মুসোলিনী তাঁরাও তো ইতিহাসের গতিপথ বদলাতে চেয়েছিলেন, তাঁদের চাওয়া-পাওয়া কি ইতিহাস মিটিয়েছে? তুমি ও-সব কথা ভেবে মন খারাপ কোর না। তুমি শুধু তোমার কর্তব্য করে যাও, আর অন্য কিছু করবার অধিকার তোমার নেই। তোমার দৌলতপুর আর সে দৌলতপুর নেই, আমার এই কলকাতাও আর সে-কলকাতা নেই। বলো তো তোমাদের সেই শত্রু ইংরেজ কি আর সেই ইংরেজ আছে? যে-ইংরেজের বংশধর লোম্যান, সিমশন আর পেডিকে খুন করে সবাই মনে করেছিল, ইংরেজরা এবারে নির্বংশ হয়ে যাবে। কিন্তু তা কি হয়েছে? তারা তো এখনও আমেরিকার ধামা ধরে টি঳কে আছে! এই-ই হচ্ছে ইতিহাস। মানুষ ইতিহাসকে পাল্‌টায় না, ইতিহাসই মানুষকে পাল্‌টায়—এই সত্যিটা মেনে নিজের কাজ করে যাও।

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, আর একটা কথা শোন, একটা নতুন স্কুল তৈরি করছে আমাদের গভর্মেণ্ট। আমি সেখানে তোমার একটা চাকরির চেষ্টা করছি। তাদের একজন হেডমাস্টার দরকার, আমি তোমার নাম সাজেস্ট্‌ করেছি। সে-চাকরিটা যদি হয় তখন যেন তুমি আপত্তি কোর না—

তখনও দেবু কোনও উত্তর দিলে না।

কাকা বললেন, আমি এখন চলি, আমার একটা কাজ আছে।

বলে তিনি চলে গেলেন। যারা তখন তার সামনে বসে পড়ছিল, দেবু তাদের বললে, আজকে এই পর্যন্ত থাক, আমার শরীরটা খারাপ, আজ তোমরা যাও, কালকে আবার তোমরা এই সময়ে এসো। তখন আমি আবার তোমাদের পড়াবো। বলে দেবব্রত ঘর ছেড়ে উঠে গেল। নিজের ঘরে গিয়ে ভেতর থেকে দরজায় খিল বন্ধ করে দিলে।

জিজ্ঞেস করলাম, সে কী? মিনতি দেবব্রতকে বিয়ে করার পর আবার সাহাবুদ্দীনকে বিয়ে করলে? এ কেমন করে হলো?

সুপ্রভাত বললে, সেইজন্যেই তো তোমাকে গল্পটা বলছি হে। তখন পার্বতীবাবু নিজের মেয়ের সঙ্গে দেবব্রতর বিয়ে দেওয়ার জন্যে কতো ধরাধরি কতো পীড়াপীড়ি করেছিলেন, তবে সে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল, আর শেষকালে কিনা সেই মিনতিই দেবব্রতকে ছেড়ে সাহাবুদ্দীনকে বিয়ে করলে! আগে পৃথিবীর ম্যাপে পাকিস্তান বলে কোনও দেশের নামও ছিল না। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের পর আবার আর একটা নতুন নাম কিনা যুক্ত হলো সেই পৃথিবীর ম্যাপেই। ঠিক তেমনি আগে যে ছিল মিনতির স্বামী, তার নাম মুছে গিয়ে সেখানে লেখা হলো আর একটা নাম। আগে যে ছিল হিন্দুর স্ত্রী সে হঠাৎ হয়ে গেল মুসলমানের স্ত্রী। ইতিহাস ভূগোলের সঙ্গে সঙ্গে যে মানুষের মনও বদলে যায়, সেটাই প্রমাণ হয়ে গেল এই মিনতির জীবনের ঘটনাতে।

আর সে বদলটা যদি মুকুন্দবাবু আর তাঁর স্ত্রী, পার্বতীবাবু আর তাঁর স্ত্রী দেখতে পেতেন তাহলে? তাহলে কি তাঁরা সে ঘটনাটা মন থেকে মেনে নিতে পারতেন?

সেই ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর যারা জন্মেছে তারা কল্পনা করতেও পারবে না যে, তাদের দেশ স্বাধীন করতে তাদের পূর্বপুরুষদের কতো রক্ত, কতো ঘাম, কতো ইজ্জত খোয়াতে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কতো ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে তাদের।

আর তার সুফল বা কুফল যারা এখন ভোগ করছে, তারা?

তারা নির্বিকার, নির্বিকল্প, নিঃসঙ্কোচ। স্বাধীন দেশের লোকরাই স্বাধীন দেশের সম্পত্তি চুরি করে। স্বাধীন দেশের লোকরাই বিনা-টিকিটে ট্রেনে উঠে ভাড়া ফাঁকি দেয়, স্বাধীন দেশের লোকরাই আয়কর

ফাঁকি দিয়ে স্বাধীন দেশের সম্পত্তি লুঠ-পাট করে স্বাধীন দেশের ক্ষতি করে। ইংরেজ আমলে আমরা সব অত্যাচার অনাচারের জন্যে বিদেশী ইংরেজদেরই দায়ী করতুম, এখন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমরা কাদের দায়ী করবো? এখন তো সেই অত্যাচার অনাচার আরো লক্ষগুণ বেড়েছে। তাহলে এখন আমরা কার বিরুদ্ধে লড়বো?

বললাম, ও-সব কথা এখন থাক, ও-সব তত্ত্বকথা আমি উপন্যাস লেখবার সময়ে গল্পের মধ্যে জুড়ে দেব। তারপর কী হলো তাই বলো। দেবব্রতর সঙ্গে সেই মিনতির পরে কি আর দেখা হয়েছিল?

সুপ্রভাত বললে, হ্যাঁ, দেখা হয়েছিল।

জিজ্ঞেস করলাম, কবে? কতো পরে?

সুপ্রভাত বললে, সেও এক অভূতপূর্ব ঘটনা। মানুষের জীবনে কতো রকমের ঘটনা আর কতো রকমের দুর্ঘটনা যে ঘটে, তা ভাবতে গেলে অবাক হয়ে যেতে হয়! যে-দেবব্রত ছোটবেলায় সুলতান আহ্‌মেদের মতো মহাপুরুষের শিক্ষায় মানুষ হয়েছিল, বিনয়দা'র মতো মানুষের কাছ থেকে দেশ-সেবার দীক্ষা নিয়েছিল, সে কি কখনও কারো সঙ্গে আপোষ-রফা করে বেঁচে থাকতে পারে?

আজকাল তো সবাই-ই আপোষ-রফা করেই বেঁচে আছে। বড়োর চেয়ে এখন সবাই তো ছোটকেই আদর্শ করে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। একটু আপোস-রফা করলেই যদি অস্তিত্ব টি'কে থাকে তাহলে আর আদর্শের জন্যে বিরোধ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে লাভ কী? প্রত্যেক মানুষের ভেতরে আর একটা মানুষ কানে কলম গুঁজে লুকিয়ে বসে থাকে। সে সবাইকে শয়নে স্বপনে হিসেব কষে লাভ-লোকসানের ব্যালেন্স-শীটটা দেখিয়ে দিয়ে হুঁশিয়ার করে দেয়। সে বলে—সবাই যা করছে, তুমিও তাই-ই করো। সে বলে—সকলের তালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলো। তাতেই তোমার ঐহিক লাভ। পারলৌকিক লাভের কথা ভেবে লাভ নেই। তোমার মৃত্যুর পর কী হবে-না-হবে তা তোমার ভাববার দরকার নেই। দেশে অনেক লোক আছে সে-সব কথা ভাববার। তুমি শুধু তোমার নিজের কথা, নিজের স্ত্রী পুত্র কন্যার কথা ভাবো। দেশের কথা ভাববার জন্যে তুমি যাদের

ভোট দিয়ে মন্ত্রী করেছ তারা ভাবুক। তুমি শুধু তোমাদের নিজেদের কথা নিয়ে মশগুল থাকো।

এই-ই হচ্ছে শতকরা একশোজন মানুষের মানসিকতা।

কিন্তু দেবব্রত সরকার?

তাই শুরুতেই বলে দিয়েছি যে যেমন, সব পাহাড়ই হিমালয় নয়, সব নদীই গঙ্গা নয়, সব মৃগ কস্তুরী-মৃগ নয়, তেমনি সব মানুষই দেবব্রত সরকার নয়।

ইতিহাস আস্তে-আস্তে তার জাবদা-খাতার পাতাগুলো এক-এক করে উল্‌টিয়ে যায় আর আগেকার যুগের সব-কিছু ওলোট-পালোট হয়ে যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে একদিন পাঠান-মোগল যুগের অবসান হয়ে গেলে ইংরেজরা আসে। তখন পূর্বসূরীদের কথা ভুলে গিয়ে মানুষ দেওয়াল থেকে আগেকার বাদশা-নবাবদের ছবি সরিয়ে ফেলে ইংরেজ বড়লাট-লাটসাহেবদের ছবি টাঙায়। তারপর যখন আবার ইংরেজ বড়লাট-লাটসাহেবরা চলে যায়, তখন তার জায়গায় জওহরলাল ইন্দিরা-রাজীব গান্ধীর ছবি টাঙায়, তাদেরই ভজনা করে দেশের মানুষরা নিজেদের কৃতার্থ বোধ করে।

এই-ই হচ্ছে নিয়ম। কিন্তু সব নিয়মের ব্যতিক্রমের মতো এ-নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে।

তাই কিছু লোক সূর্যকে পূজো করে, কিছু লোক অগ্নিকে পূজো করে, কিছু লোক জলকে পূজো করে। সেই সূর্য অগ্নি আর জলের কোনও বিকল্প নেই, বিকল্প ছিল না, বিকল্প নেইও। বিকল্প কোনও কালে থাকবেও না। যুগ বদলালেও তারা যুগাতীত হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখবে।

এই ধরনের মানুষ হলো দেবব্রত। দেশ যতোই বদলাক, দেশ যতোই টুকরো-টুকরো হোক, দেশের রাজা বা রানী যে-ই হোক, দেবব্রত সরকারদের আদর্শ তো কখনও বদলায় না। তাদের আদর্শ কখনও বদলাতে নেই।

ততোদিনে অনেক জল হাওড়া পুলের তলা দিয়ে বয়ে গেছে। সেই জলের সঙ্গে অনেক রক্ত অনেক পাপ অনেক অত্যাচারও বয়ে

গিয়ে বে-অব-বেঙ্গলে গিয়ে মিশেছে।

সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি যেটা ঘটে গিয়েছে দেবব্রতর জীবনে, সেটা হলো কাকার মৃত্যু।

দেশের মৃত্যুর সঙ্গে অবশ্য গোলকেন্দুবাবুর মৃত্যুর কোনও তুলনাই করা যায় না। তবু আগে ইণ্ডিয়া ভাগ হওয়ার ফলে যে-আঘাত সে পেয়েছিল, তার কাছে কাকার মৃত্যু কিছুই না।

সবচেয়ে বড়ো কথা হলো বিচ্ছেদ।

আগেকার বাবা-মা'র সঙ্গে বিচ্ছেদটা চোখের আড়ালে ঘটে গেছে বলে সেটা অতোটা আঘাত তাকে দিতে পারেনি। কিন্তু এবার কাকার মৃত্যুর খবরটা পেয়ে আশে-পাশের বাড়ি থেকে যারা তাকে সহানুভূতি জানাতে এসেছিল, তারাও দেবব্রতর মুখের ভাব দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

পাশের বাড়িতে শৈলেনবাবু থাকতেন, শৈলেন চক্রবর্তী। তাঁর সঙ্গে গোলকেন্দুবাবুর ঘনিষ্ঠতা ছিল।

আর শুধু কি শৈলেনবাবু? গোলকেন্দুবাবুর অসংখ্য ছাত্র ছিল। তারা তাঁর কাছে লেখাপড়া শিখেই পরবর্তী জীবনে অনেক বড়ো হয়েছিল। বড়ো হয়েছিল মানে বেশি মাইনের চাকরি পেয়েছিল।

গোলকেন্দুবাবুকে তখনও শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়নি। তাঁর রক্তমাখা শরীরটা দেখে বোঝা যায় যে, কেউ তাকে খুন করেছে। আগের রাত্রেই পুলিশ তাকে খবর পাঠিয়েছিল যে, শেষ রাত্রের দিকে রাস্তার ওপরে গোলকেন্দুবাবুকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। প্রথমে কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। শেষকালে তাঁরই এক ছাত্র তাঁকে চিনতে পেরে কাছাকাছি পুলিশের থানায় খবর দেয় যে, মৃত ব্যক্তির নাম—গোলকেন্দু সরকার।

খবরটা পেয়েই শেষ-রাত্রেই থানায় গিয়ে সনাক্ত করে কাকাকে।

পুলিশের কর্তা জিজ্ঞেস করলেন, ইনি আপনার কাকা?

দেবব্রত তখনও একদৃষ্টে দেখছে কাকাকে। যে-কাকার সঙ্গে আগের দিনও তার কথা হয়েছে, সেই মানুষটাই তখন নির্জীব নিষ্প্রাণ। তাঁকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে, কেউ তাঁকে পেছন থেকে ছোরা দিয়ে

আক্রমণ করে তাঁর প্রাণ নিয়েছে।

তারক সরকার বললে, আজকাল রোজ-রোজই এই রকম হচ্ছে, এখন কলকাতার এই অবস্থা!

তারপর কাকাকে নিয়ে আসা হলো তাঁর বাড়িতে। ততক্ষণে সবাইকে খবর দেওয়া হয়েছে। কাকার স্কুলেও খবর দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে স্কুলেও ছুটি ঘোষণা করা হলো। ছুটির পর তারাও সবাই দল বেঁধে এসে হাজির হলো। হেড্‌মাস্টার মশাইকে ওই অবস্থায় দেখে ছেলেদের চোখ কান্নায় ছল-ছল করে উঠলো।

দেখতে দেখতে আরো অনেক লোক জড়ো হলো। সমস্ত পাড়ার লোক এসে ভিড় করলো বাড়ির সামনে। সকলের চোখেই জল। সকলেই গোলকেন্দুবাবুকে ওই অবস্থায় দেখে দূর থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম করে নিজেদের শ্রদ্ধা জানাতে লাগলো।

কিন্তু আশ্চর্য, দেবব্রতকে দেখে বোঝা গেল না যে সে কিছু আঘাত পেয়েছে। সে যেন নির্বাক নিঃশব্দ নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার চোখের জলও যেন ঝরতে ভুলে গেছে।

শেষকালে দেবব্রত বললে, এবার চলো শ্মশানে যাওয়া যাক্—

সবাই দল বেঁধে তাঁকে নিয়ে শ্মশানের দিকে যাত্রা করলে।

পাড়ার লোক যারা সে-দৃশ্য দেখছিল তারা সবাই-ই সেদিন শোকার্ত হয়ে বলতে লাগলো—একজন মহাপুরুষ চলে গেলেন।

সুপ্রভাত বললে, তারপর থেকে দেবব্রত যেন সম্পূর্ণ একলা হয়ে গেল। শুধু একলা নয়, নিঃসহায়, নিঃসম্বল, নিঃসঙ্গও হয়ে গেল সে। আগে বাবা-মা চলে গেছেন, শ্বশুর-শাশুড়ী সবা-ই চলে গিয়েছিলেন। তারপর চলে গিয়েছিল তার জন্মভূমি, জন্মভিটে। সে-সব তাকে চোখ দিয়ে দেখতে হয়নি। বাইরের ইতিহাস-ভূগোলের মতো তার নিজের মনের ইতিহাস-ভূগোলও বদলে গিয়েছিল। এবার তার কাকাও চলে গেলেন। তাহলে রইলো কে?

এক গোষ্ঠ ছাড়া তার আর কেউ-ই রইলো না।

দেবব্রত গোষ্ঠকে একদিন ডাকলে। বললে, তোরও যদি থাকতে কষ্ট হয়, তাহলে তুইও চলে যেতে পারিস।

গোষ্ঠ বললে, আমি চলে গেলে আপনাকে দেখবে কে ?

দেবব্রত বললে, আমি একলা মানুষ, কোন রকমে চালিয়ে নেব। কিন্তু আমার জন্যে তুই কেন কষ্ট করতে যাবি ?

—আমার কেউ নেই দাদাবাবু, আমি আর কোথায় যাবো ?

—তুইও আমার মতো একলা ?

—হ্যাঁ দাদাবাবু, যিনি আমার নিজের বলতে সব কিছু ছিলেন, তিনিই যখন চলে গেলেন তখন আমি আর কোথায় যাবো ? এখানেই পড়ে থাকবো।

তারপর একটু থেমে আবার বললে, আপনি যদি আমায় না রাখতে চান তো আমাকে চলে যেতেই হবে।

—কোথায় যাবি ?

—কোথায় আর যাব ? আমি আমার দেশে চলে যাবো।

—তোর দেশ ? তোরও আবার দেশ আছে নাকি ?

—হ্যাঁ, সকলেরই তো দেশ থাকে।

—কোথায় দেশ ? পাকিস্তানে, না ইণ্ডিয়ায় ?

—এখানে, এই নদীয়ায়।

—তা সে-দেশে তোর কে-কে আছে ?

—সেখানে আমার এক মামাতো ভাই আছে। আর সব মারা গেছে।

—তা তারা তো কই কখনও তোর কাছে আসে না।

গোষ্ঠ বললে, আমিই তাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখিনি। বাবুর কাছেই আমি ছোটবেলা থেকে আছি কিনা, তাই বাবুর ওপর আমার মায়া পড়ে গিয়েছিল। তখন মা'ও বেঁচেছিলেন। মা মারা যাওয়ার পর বাবুকে দেখবার তো আর কেউ রইল না, তাই আমি আর এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাইনি। এখন আপনি যদি আপনার কাছে রাখেন তো আমি থাকবো, কোথাও যাবো না।

তাই গোলকেন্দুবাবু চলে যাওয়ার পরও গোষ্ঠ আগের মতো এ বাড়িতে রয়ে গেল। আগের মতো এ-বাড়ির সব রকম কাজকর্ম চলতে লাগলো। আগে যেমন ছাত্ররা কাকার কাছে পড়তে আসতো, তেমনি তখন থেকে আসতে লাগলো দেবব্রতর কাছে। দেবব্রতও একটা স্কুলে

যেমন কাজ করছিল, তেমনি কাজ করতে লাগলো। স্কুলে কাজের জন্যে মাইনে নিতে আপত্তি না থাকলেও, বাড়িতে ছাত্রদের কাছ থেকে কাকার মতো সেও মাইনে বা টাকাকড়ি কিছুই নিত না।

কাকার মৃত্যুর পর থেকে দেবব্রত স্কুলের মাইনেটা পেয়েই গোষ্ঠর হাতে দিয়ে দিত। বলতো, এই নে, এ-মাসের মাইনেটা নে—

গোষ্ঠ প্রথম-প্রথম আপত্তি করতো। বলতো, সমস্ত মাইনেটা আমাকে দিয়ে দিলেন?

দেবব্রত বলতো, তোকে দেব না তো কাকে দেব? বাড়িতে কি আমার বউ আছে যে তাকে দেব? তুই-ই তো সব খরচ-খরচা করিস। একটু হিসেব করে চলিস, যখন জামা-কাপড় কেনবার দরকার হবে, তখন তোর কাছ থেকে টাকা চেয়ে নেব।

গোষ্ঠ কী আর বলবে। বলতো, আপনার এই শার্টটা তো ছিঁড়ে গেছে, একটা নতুন শার্ট তো আপনার দরকার।

—সে কী? কোথায় ছিঁড়ে গেছে? এ তো প্রায় নতুনই আছে।

দেবব্রত নিজের শার্টটার দিকে চেয়ে-চেয়ে কোথাও কোনও ছেঁড়া দেখতে পেত না। বলতো, না না, এতেই চলে যাবে, মিছিমিছি টাকা নষ্ট করে কী লাভ?

বলে সেই শার্টটা পরেই স্কুলে চলে যেত। আবার পরের দিন স্কুলে যাওয়ার সময় দেখতো, সেই শার্টটার জায়গায় অন্য আর একটা নতুন শার্ট সেখানে রয়েছে।

নতুন শার্ট দেখেই দেবব্রত চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলো, ওরে গোষ্ঠ, গোষ্ঠ, আবার নতুন শার্ট আমার কোত্থেকে এলো রে?

গোষ্ঠ কাছে এসে বললে, নতুন শার্টটা আমি কিনে এনেছি।

— আর পুরনোটা?

—পুরনোটা দিয়ে আমি বাসনওয়ালীর কাছ থেকে একটা কাঁসার বাটি কিনেছি।

কী আর করা যাবে। নতুন শার্টটাই গায়ে দিলে দেবব্রত। বললে, এই রকম বাবুয়ানি করলেই দেখছি আমি ফতুর হয়ে যাবো। আমাকে কি বড়লোক পেয়েছিস তুই? জানিস না আমাদের দেশ

গরীব, এদেশে বাবুয়ানি করা পাপ ?

আর শুধু কি জামা ? ধুতিও তাই। সব কিছুতেই সে বিলাসিতার বিরুদ্ধে। যে-দেশের শতকরা ষাট ভাগ লোক গরীব, সে-দেশে এত বিলাসিতা কি ভালো ?

স্কুলের অঙ্কের টিচার সুশীলবাবু একদিন তাকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা দেবব্রতবাবু, আপনি ছেলেদের তো বাড়িতে পড়ান।

—হ্যাঁ, পড়াই।

সুশীলবাবু বললেন, তা পড়ান, ভালোই করেন। কিন্তু তা আমাদের এত লোকসান করেন কেন ?

—আমি আপনাদের লোকসান করি ? তার মানে ?

কথাটা শুনে সে যেন আকাশ থেকে পড়লো। জীবনে সে কখনও কারো লোকসান করেছে বলে তার মনে পড়লো না। কোনও লোকসান করা দূরে থাকুক, কারো লোকসান করার স্বপ্নও সে কখনও দেখেনি।

বললে, আমি তো বুঝতে পারছি না আপনি কী বলছেন ?

সুশীলবাবু বললেন, আপনার জন্যে কোচিং ক্লাশে আমাদের ছাত্র হচ্ছে না। আপনি বিনা-পয়সায় পড়ালে কে মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা দিয়ে আমাদের কোচিং ক্লাশে পড়বে বলুন ?

দেবব্রত তো হতবাক। কোনও কথা তার মুখ দিয়ে বেরোল না।

সুশীলবাবু আবার বললেন, আপনি না-হয় বিয়ে-থা করেননি, সন্ন্যাসী মানুষ, আপনি বিনা পয়সায় পড়াতে পারেন, কিন্তু আমাদের তো বউ-ছেলে-মেয়ে আছে। সংসার চালানো যে আজকাল কতো কষ্টের, তা তো আপনি জানতে পারলেন না।

—কে বললে, আমি বিয়ে করিনি ?

—সে কী ? আপনি বিয়ে করেছেন ? আপনার স্ত্রী কোথায় ?

—দেশ ভাগ হওয়ার পর নাকি সে অন্য একজনের সঙ্গে কোথায় চলে গেছে। আমি তখন জেলখানায়।

খবরটা যেমন অভিনব তেমনি লজ্জাকর।

কিন্তু দেবব্রত সরকারের সে-জন্যে কোনও খেদ নেই।

খবরটা এখানে কেউ-ই জানতো না।

সুশীলবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন, তারপর জেল থেকে বেরিয়ে আপনার স্ত্রীর আর কোনও খবর পাননি ?

—আর তার খোঁজ নিয়ে কী হবে ? সে সুখে থাকলেই হলো।

যারা এতদিন দেবব্রত সরকারকে পাগল বলে মনে করেছিল, তারা তখন থেকে তাকে অন্য দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলো। তাদের মনে হলো তাহলে মানুষটা হয়তো ভালোই। পোশাক-পরিচ্ছদ আর বাইরের ব্যবহার দিয়ে বিচার করে তারা তাকে নির্বোধ বলে ভাবলেও আসলে মানুষটা পরোপকারী, সংযমী, নির্লোভ আর নিরহংকারী।

ততদিনে দেশের হালচাল তখন আমূল বদলে গিয়েছে। এককালে যে-কলকাতায় রাতের বেলা বেরোন যেত না, তখন তা আবার শান্ত হয়ে এলো।

কিন্তু একটা ব্যাপারে দেবব্রতকে কেউ হারাতে পারলে না, সে যেটা সত্যি বলে মনে করবে তা সে পালন করবেই। সেই সত্যটা রক্ষা করবার জন্যে সে নিজের প্রাণ পর্যন্ত কবুল করতে প্রস্তুত থাকবে। স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে সেই বিশ্বাস সেই সত্য থেকে কেউ তাকে একচুল নড়াতে পারবে না।

জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কী হলো ? সেই মিনতি ? মিনতির কী হলো ?

সুপ্রভাত বললে, এবার তুমি তোমার সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে। তারপরই আরম্ভ হবে দেবব্রত সরকারের জীবনের অগ্নিপরীক্ষা। তখনই জানা গেল সে কতোটা পরোপকারী, কতোটা সংযমী, কতোটা কঠোর, কতোটা নির্লোভ আর কতোটা নিরহঙ্কারী।

এই সময়েই একদিন স্কুল থেকে ছুটির পর দেবব্রত বাড়িতে এসে

মিনতিকে দেখে অবাক হয়ে গেল ?

—তুমি ? তুমি হঠাৎ ?

মিনতি প্রথমে কথাটার কোনও জবাব দিতে পারলে না।

—আর, এ কে ?

—এ আমার মেয়ে ঝর্ণা।

দেবব্রত দু'জনের দিকেই চেয়ে দেখতে লাগলো। জিজ্ঞেস করলে, তোমরা কলকাতায় কবে এলে ?

মিনতি বললে, আজই—

—কোথায় উঠেছ ?

মিনতি বললে, তোমার এখানেই। কেন, তোমার আপত্তি আছে ?

—আমার আপত্তি থাকবে কেন ? কতোদিন থাকবে তুমি এখানে ?

মিনতি বললে, যতোদিন তুমি থাকতে দেবে।

—তার মানে ?

মিনতি বললে, তুমি থাকতে অনুমতি না দিলে কী করে আমি বলবো যে আমি কতোদিন এখানে থাকবো ?

—ধরো আমি যদি বলি যে, এখন থেকে বরাবর আমি এখানেই তোমাকে থাকতে দেব, তাহলে ?

—বরাবর থাকতে দেবে তুমি ?

—হ্যাঁ, বরাবর। কথা দিচ্ছি—

মিনতি বললে, তাহলে আমি তোমার এখানেই বরাবর থাকবো।

—কেন, তুমি এতদিন যেখানে ছিলে সেখান থেকে চলে এলে কেন ?

মিনতি বললে, আমার স্বামী মারা গেছেন।

—সে কী ? সাহাবুদ্দীন মারা গেছে ? কী হয়েছিল তার ? সে তো শুনেছিলাম পাকিস্তানের হোম-মিনিস্টার না কী যেন হয়েছিল !

মিনতি বললে, একটা ট্রেন এ্যাক্সিডেন্টে আমরা সবাই আঘাত পাই, আমার স্বামী তাতে মারা যায়, আমি আর আমার এই মেয়ে শুধু বেঁচে ফিরে এসেছি। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পাশপোর্ট ভিসা নিয়ে সোজা তোমার কাছে চলে এসেছি। পৃথিবীতে আর কেউ নেই তো আমার, যার কাছে গিয়ে এখন দাঁড়াই।

কথাগুলো শুনে দেবব্রত কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবতে লাগলো।

তার কাছ থেকে কথার কোনও উত্তর না পেয়ে মিনতি বললে, তুমি থাকতে দেবে ?

—আমি অন্য কথা ভাবছি।

—কী কথা ?

—ভাবছি, আমি তো গরীব। তুমি অতো বড়লোক স্বামীর স্ত্রী হয়ে, আমার মতো গরীবের ঘরে কি থাকতে পারবে ?

মিনতি বললে, কিন্তু এ-কথা তো অস্বীকার করতে পারবে না যে, তুমি এককালে আমাকে বিয়ে করেছিলে।

—সে-সব কথা এখন থাক। তুমি আর তোমার মেয়ে কিছু খেয়েছ ?

গোষ্ঠ পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললে, আমি ভাত রান্না করে দিয়েছি। আর তার সঙ্গে ঘরে আলু ছিল, তাও ভেজে দিয়েছি। আর তার সঙ্গে ডাল—

গোষ্ঠ তো তার দাদাবাবুকে চেনে। সে আন্দাজ করে নিয়েছিল যে, যারা বাড়িতে এসেছে তারা নিশ্চয়ই দাদাবাবুর পরিচিত ঘনিষ্ঠ লোক। বিশেষ করে মহিলাটির মাথার সিঁথিতে যখন সিঁদুর রয়েছে। আর তার সঙ্গেও যখন রয়েছে একটা মেয়ে। সব লোকই অচেনা মানুষের চেহারা দেখে অন্ততঃ একটা আন্দাজ করে নিতে পারে যে, কে তার আপন আর কে তার পর। বিশেষ করে গোষ্ঠ। কারণ এ-বাড়িতে সে ছোটবেলা থেকেই আছে, আর ছোটবেলা থেকেই তার দাদাবাবুকে দেখে আসছে।

দেবব্রত বললে, যতক্ষণ আমার এই গোষ্ঠ আছে, ততক্ষণ তোমার কোনও সঙ্কোচ করবার দরকার নেই মিনতি। তোমাদের যা-কিছু দরকার হবে তা নিঃসঙ্কোচে এই গোষ্ঠর কাছ থেকে চেয়ে নিও, বুঝলে এ-বাড়িতে গোষ্ঠই সব। দৌলতপুরে যেমন আমাদের রাখাল ছিল, এখানে এও ঠিক তেমনি।

তারপর দেবব্রতকে একটু চিন্তিত দেখে মিনতি বললে, তুমি কোথাও যাচ্ছো নাকি ?

দেবব্রত বললে, হ্যাঁ, আমাদের স্কুলের ইতিহাসের মাস্টার আজকে

আবার স্কুলে আসেননি। তাই তাঁর জন্যে বড়ো ভাবনা হচ্ছে। তিনি তো কখনও কামাই করেন না, নিশ্চয় কোনও অসুখ-বিসুখ করেছে। তাই তাঁর বাড়িতে একবার গিয়ে দেখে আসি, কী ব্যাপার! আমি যাবো আর আসবো।

তারপর গোষ্ঠকে বললে, ওরা যদি আসে কেউ তো বসতে বলিস গোষ্ঠ, বুঝলি ?

আর তারপর মিনতির দিকে ফিরে বললে, তোমরা রাত্তিরে কী খাবে, গোষ্ঠকে বলে দিও, ও তোমাদের জন্যে তা-ই রান্না করে দেবে।

বলে সে যেমন এসেছিল, তেমনি তখনই বাইরে বেরিয়ে গেল।

কয়েকদিন এ-বাড়িতে থেকেই মিনতি বুঝতে পারলে, গোষ্ঠই এ-বাড়ির মালিক। সে-ই বাজার করে, রান্না করে, তার কাছেই থাকে এ-সংসারের চাবি-কাঠি। তার নির্দেশেই দেবব্রত সরকার চলে। সে কী কাপড়-জামা পরবে না পরবে না, তা পর্যন্ত ঠিক করে দেবে গোষ্ঠ।

প্রথম দিন থেকেই এমনি এক অদ্ভুত সংসারে এসে ঢুকলো মিনতি আর তার মেয়ে ঝর্ণা।

মিনতি বললে, তোমাদের বাড়িতে চায়ের পাট নেই গোষ্ঠ ?

গোষ্ঠ বললে, আপনি চা খাবেন বৌদি ? তা আগে বললেন না কেন ? আমি এখ খুনি দোকান থেকে চা কিনে নিয়ে আসছি।

বলে গোষ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে দৌড়লো। আর তার পরেই বাড়িতে এসে স্টোভ জ্বালিয়ে চা তৈরি করে দিলে। বললে, আপনি যদি আগে বলতেন, তাহলে আর আপনার এত কষ্ট হতো না।

শুধু মিনতি নয়, ঝর্ণাও চা খেল। মিনতি জিজ্ঞেস করলে, তোমার দাদাবাবু চা খান না ?

গোষ্ঠ বললে, না—

—তুমি ?

গোষ্ঠ বললে, আমিও চা খাই না।

মিনতি বললে, আমি আর আমার মেয়েও আগে চা খেতুম না। কিন্তু হঠাৎ চা খেতে খেতে এমন নেশা হয়ে গেছে যে সকালে বিকেলে চা না খেলে মাথা ধরে যায়।

গোষ্ঠ বললে, তা ভালোই তো। দাদাবাবু চা খান না বলে আমিও চা খাই না। আর শুধু চা নয়, দাদাবাবুর কোনও নেশাই নেই। দাদাবাবু পান পর্যন্ত খান না।

—কেন খান না ?

গোষ্ঠ বললে, উনি যদি নেশা করেন তো ওঁর ছাত্ররাও যে নেশা করবে, তখন উনি তাদের বারণ করতে পারবেন না।

—তোমার দাদাবাবু কি চান যে, ছাত্ররা চা কি পান না খাক ?

গোষ্ঠ বললে, হ্যাঁ, দাদাবাবু বলেন যে, যে-জিনিসটা খেলে শরীরের কোনও উপকার হয় না, তা না-খাওয়াই ভালো।

মিনতি বুঝতে পারলে এ-বাড়ির দাদাবাবুটিও যেমন, গোষ্ঠও ঠিক তেমনি মিলেছে।

প্রথম দিন রাত্রেই গোষ্ঠ জিজ্ঞেস করেছিল, আপনাদের বিছানা কোন ঘরে করবো বৌদি ?

—যে-ঘরে তোমার খুশী। তোমার দাদাবাবু কোন ঘরে শোন ?

—ওঁর কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। যে-কোনও ঘরে শুলেই হলো।

—উনি কোন্ ঘরে শোন এখন ?

—আপনি ওঁর শোবার ঘর দেখবেন ? তাহলে আসুন আমার সঙ্গে।

বলে মিনতিকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গিয়ে একটা ঘরের তালা খুলে দেখালো। বললে, এই-ই দাদাবাবুর ঘর। এখানেই দাদাবাবু রাত্তিরে শোন।

মিনতি আর ঝর্ণাও ঘরটার ভেতরে চেয়ে দেখলে। মেঝের ওপর বিছানা পাতা। অতি সাধারণ একটা মাদুর, তার ওপরে একটা সাধারণ চাদর পাতা। আর মাথার দিকে এক ইঞ্চি উঁচু একটা বালিশ।

দেয়ালে কার একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি ঝুলছে। ঘরের ভেতরে আর কোন কিছু আসবাব-পত্র নেই। একেবারে শাদা-মাটা।

ঝর্ণা বললে, উনি কি খাটে শোন না ?

গোষ্ঠ বললে, না—

মিনতিও বললে, কেন ?

—দাদাবাবু বলেন, শক্ত মেঝের ওপর শুলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

—ও ছবিটা কার ?

—উনি দাদাবাবুর গুরুদেব।

—গুরুদেব ? তার মানে ? উনি কী দীক্ষা নিয়েছেন নাকি ?

গোষ্ঠ জানে না কে দাদাবাবুর গুরুদেব। তার কাছে দাদাবাবু দীক্ষা নিয়েছেন কিনা তাও সে জানে না। এককালে কাকাবাবু ওই ঘরে শুতেন। তখন খাট ছিল ওখানে। তিনি মারা যাওয়ার পর দাদাবাবু খাটটা বাইরে বার করে দিয়েছেন। সেইটের ওপর এক তলার ঘরে বিছানা করে দিয়েছি আমি।

মিনতি আগেও দেখেছিল দেবব্রতকে। বিয়ে হওয়ার পরও দেখেছে। তারপরে যখন দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধলো তখন দেবব্রত জেল-খানায়। তারপর চারদিকে যখন মানুষের খুনোখুনি চরমে উঠলো তখন সাহাবুদ্দিন না থাকলে সে বাঁচতো না। সেই সাহাবুদ্দিন তাকে বিয়ে করলে। কারণ বিয়ে না করলে হিন্দু হওয়ার অপরাধে সেও খুন হয়ে যেত। আর তারপর ইতিহাসের কোন অলঙ্ঘ্য নির্দেশে পুর্ব পাকিস্তানের একজন মন্ত্রীও হলো। কাকে বলে ঐশ্বর্য, কাকে বলে বিলাসিতা, কাকে বলে সম্মান, তাও সে নিজের চোখেই দেখলে। মন্ত্রীর স্ত্রীর হওয়ার ফলে সমাজে তারও খাতির বাড়লো। তখন এই ঝর্ণা জন্মালো।

আর তারপর ?

আর কারো কপালে যে-দুর্যোগ ঘটে না, মিনতির জীবনে সেই দুর্যোগই ঘনিয়ে এল। তখন কি সে কল্পনাও করতে পেরেছিল যে আবার তাকে সিঁদুর দিতে হবে তার সিঁথিতে। একদিন আবার তাকে এই দেবব্রতর কাছেই ফিরে এসে তার কৃপাপ্রার্থী হতে হবে ?

এই দেবব্রতর সংসারের পাশাপাশি সেই সাহাবুদ্দীনের সংসারের তুলনা করলে মিনতির হাসি পেত, সাহাবুদ্দীনের মা মিনতিকে কতো আদর করতো তখন। তখন সবাই বলতো যে মিনতির সৌভাগ্যের জন্যেই নাকি সাহাবুদ্দীন সাহেব পাকিস্থানের মন্ত্রী হতে পেরেছে।

কিন্তু সেই তারাই আবার একদিন তার ওপর বিরূপ হয়ে উঠলো।

সে এক বড়ো মর্মান্তিক ঘটনা। টেনের সেলুনে চেপে সাহাবুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে মিনতি আর ঝর্ণা যাচ্ছে ঢাকার দিকে। মন্ত্রীর সাঙ্গোপাঙ্গ আছে অন্য কামরায়। তখন অনেক রাত। খাওয়াদাওয়ার পর সবাই-ই ঘুমে অচেতন। হঠাৎ একটা বিকট-শব্দে সবাই জেগে উঠতেই সঙ্গে সঙ্গে কী যে হলো, অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে গেল সবাই।

তারপরের ঘটনা আর মনে নেই।

যখন জ্ঞান হলো তখন মিনতি দেখলে সে হাসপাতালের একটা বিছানায় শুয়ে আছে। জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই তার মনে পড়লো ঝর্ণার কথা। সে সামনের একজনকে জিজ্ঞেস করলে আমার মেয়ে কোথায়?

পাশের খাটটার দিকে দেখিয়ে নার্সটা বললে, ওই যে—

—ও কেমন আছে?

নার্স বললে—একটু ভালো।

—আর মিনিস্টার সাহেব?

নার্সের মুখের চেহারাটা কেমন করুণ হয়ে উঠলো। মিনিস্টার সাহেবের খবর না দিয়ে নার্স তখন তাকে কী একটা ওষুধ খাইয়ে দিতেই মিনতি আবার অচৈতন্য-অজ্ঞান হয়ে গেল।

আর তারও বহুদিন পরে সে জানতে পারলে যে মিনিস্টার সাহেব আর নেই।

মনে আছে খবরটা শুনেই মিনতি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার পরদিন থেকেই মিনতি বুঝতে পেরেছিল যে পরলোকগত স্বামীর সংসারে সে আর তার মেয়ে অবাঞ্ছিতা, উপেক্ষিতা।

তখন থেকেই তাদের দুজনের ওপর লাঞ্ছনার চাবুক পড়তে আরম্ভ করলো।

আগে যারা 'বেগম সাহেবা' 'বেগম সাহেবা' বলে তাকে সম্ভ্রম সম্মান শ্রদ্ধা বর্ষণ করতো, তখন তারাই আবার তাদের ওপর অবহেলা আর অসম্মানের কষাঘাত করতে আরম্ভ করলো। আগে তার শাশুড়ী শ্বশুর দেওররা তাদের দিকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতো। কিন্তু তারপর থেকে তারাই আবার যতটা সম্ভব তাদের এড়িয়ে চলতে লাগলো।

এ ভাবে আর কতোদিন বেঁচে থাকা যায়? তার বাপের বাড়িতেও এমন কেউ ছিল না যে সে তাদের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেবে। নিজে যে আলাদা হয়ে জীবনযাপন করবে তারও উপায় নেই। তার সোনার গয়না যা-কিছু ছিল তা সমস্তই শ্বশুর-বাড়ির লোকেরা কেড়ে নিয়েছিল।

তাহলে সে আর তার মেয়ে কী ভাবে কার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে জীবন ধারণ করবে? কী করে তুজনের পেট চালাবে? সে যদি হিন্দুও না হয়, মুসলমানও না হয়, তাহলে সে কোন ধর্ম-মতে বাঁচবে। তাদের তুজনের বেঁচে থাকবার তাগিদে কি তাহলে যে-কোনও ধর্ম-মতের আশ্রয় নিতেই হবে? তাদের মতো মানুষের আশ্রয় কোথায় মিলবে তাহলে? শুধু মানুষ নামে তকমা নিয়ে বাঁচবার অধিকার কি কোথাও কারো নেই। সবাই কি হিন্দু, মুসলমান, কিংবা খ্রীষ্টান হবে? মানুষ হবে না কেউ? মানুষ হতে আপত্তি কী?

হিন্দুর মেয়ে হয়ে একবার সে মসজিদে গিয়ে ধর্ম বদলে হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছিল। এবার কি তাহলে সে মন্দিরে গিয়ে আবার হিন্দু হবে? তেমন মন্দির কোথায় আছে? সে-মন্দিরের ঠিকানা কে তাকে জানাবে?

সে-সব যে কী দিন গেছে তখন তার হিসেব করতে গেলেই মিনতির মাথায় ব্যাথা করতে আরম্ভ করতো।

ঝর্ণা বলতো, মা তুমি আগে তো মাথায় সিঁতুর দিতে না, এখন দিচ্ছ কেন?

ঝর্ণা তখন ছোট ছিল, তাই আগেকার কথা একটু মনে ছিল তার। একদিন মাঝরাতে ঝর্ণাকে নিয়ে মিনতি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। সঙ্গে টাকা-কড়ি কিছুই নেই। শ্বশুর-বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে সে, তারও কিছু ঠিক ছিল না।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যাওয়াতে ঝর্ণা কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। বলেছিল, কোথায় নিয়ে যাচ্ছো মা তুমি ?

মিনতি সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, চুপ করো, চুপ করো, আমরা কলকাতায় যাবো—

একদিন মন্ত্রীর বেগম হয়ে যে-মিনতি সব রকম সরকারী সম্মান-সমারোহ-সম্বর্ধনা পেয়েছে, তাকেই যে আবার একদিন এক কাপড়ে কপর্দক-শূন্য হাতে সকলের অলক্ষ্যে রাস্তায় বেরোতে হবে তা কি সে কল্পনা করতে পেরেছিল।

মনে আছে সেদিন ভাগ্য-দেবতার কী নির্দেশ ছিল তা তার জানা ছিল না, কিন্তু এমন একজন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ সে পেয়েছিল যার সঙ্গে জীবনে তার কোনও পরিচয় বা দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। অথচ তিনি স্বেচ্ছায় তাদের দুজনের কলকাতায় পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

বলেছিলেন, মা, আমি নিমিত্ত মাত্র। যদি তোমাদের কোনও উপকার করতে পারি তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।

মিনতি জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি তো আমার কোনও পরিচয় জানেন না, তাহলে আপনি কেন আমার এমন উপকার করবেন ?

তিনি হেসেছিলেন মিনতির কথা শুনে। বলেছিলেন, পরিচয় আবার জিজ্ঞেস করতে যাবো কেন মা ? আমি জানি যে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জীবনই বিষময়। কারো বেশি আর কারো বা কম। কোনও বিশেষ বিপদে না পড়লে কি কেউ নিজের শ্বশুর-বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরোয় ? এ-সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেসই বা কী করতে যাবো ? আমার ক্ষমতা থাকলে তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবো, আর ক্ষমতা না থাকলে উদ্ধার করতে পারবো না।

তখন পাকিস্তান ইণ্ডিয়ার শত্রু দেশ থেকে পারাপার করা সোজা নয়।

তবু তারই মধ্যে তিনি বোধহয় সে-দেশের সরকারী আমলাদের দয়া আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। তাই ছাড়-পত্র আদায় করতে বেশি বেগ পেতে হয়নি।

তারপর ট্রেনে উঠে বর্ডার পেরিয়ে কলকাতায় আসা।

কিন্তু কলকাতা তো ছোট শহর নয়, বিরাটাকার। শুধু ভবানীপুরের গোলকেন্দু সরকার আর যে স্কুলের তিনি হেডমাস্টার ছিলেন, সেই নামটা মনে ছিল মিনতির। এটুকুই মাত্র তার জানা ছিল যে, দেশ ভাগ হওয়ার পর দেবব্রত সেই কাকার বাড়িতে গিয়েই উঠেছে।

সেইটুকু পরিচয়ের সূত্র ধরে একজন অপরিচিত মানুষ সেদিন মিনতি আর ঝর্ণাকে এই বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু মজার কথা এই যে, তিনি এই উপকারের বিনিময়ে কোনও প্রতিদান চাননি।

কিন্তু এই বাড়িতে এসে মিনতি যা দেখলে, তাতে আনন্দের চেয়ে তার আশঙ্কাই হলো বেশি। আগেও মানুষটা অসাধারণ ছিল, এখন এখানে এসে দেখলে সেই মানুষটা এখন আরো অসাধারণ হয়ে গিয়েছে। আরো কোমল, আরো কঠোর, আরো জেদী, আরো তেজী।

ঝর্ণা একটু আড়ালে পেয়ে মা'কে জিজ্ঞেস করেছিল, উনি কে মা?

মিনতি বলেছিল, উনি তোমার বাবা!

ঝর্ণা বিশ্বাস করেনি কথাটা। বলেছিল, কিন্তু তুমিই তো আমাকে বলেছিলে আমার বাবা মারা গিয়েছে।

মিনতি বলেছিল, না, মারা যাননি, ইনিই তোমার বাবা!

কথাটা শুনেও কিন্তু ঝর্ণার বিশ্বাস হয়নি। যদি বাবাই হবেন তাহলে তিনি তাঁকে আদর করেন না কেন? তাকে নিয়ে বেড়াতে যান না কেন? তার জন্যে বাড়িতে আসার সময় দোকান থেকে খেলনা কিনে আনেন না কেন, খাবার কিনে আনেন না কেন?

এ-সব প্রশ্নের উত্তর ঝর্ণা কোনও দিনই পায়নি। শুধু মনে মনে সে ভেবেছে কেবল, আর সব কিছু লক্ষ্য করে গেছে।

এখানে থাকতে থাকতেই হঠাৎ বাইরে থেকে একদিন একজন মহিলা বাড়িতে এসে ঢুকলো। বেশ বয়েস হয়েছে মহিলার। দেখতে সুন্দর চেহারা। মাঝবয়েসী হলেও মাথার চুলে একটু একটু পাক ধরেছে।

—কই গো, বউমা কোথায় গেলে ?

মহিলার গলা শুনে মিনতি বাইরে বেরিয়ে এলো।

—কে ?

মহিলা বলে উঠলো, আমি গো বউমা, আমি। আল্‌তা-মাসি।

—আল্‌তা-মাসি !

—হ্যাঁ গো বউমা, বিশ্বাস হচ্ছে না ? এই দেখ না আমার হাতে কী রয়েছে। এই হচ্ছে আল্‌তার শিশি, আর এই হচ্ছে সিঁদুরের কৌটো।

বলে আল্‌তা-মাসি তার হাতের কাচের শিশিটা আর একটা কাঠের বাক্স দেখালে উঁচু করে।

মিনতির মনের ঘোর তখনও কাটেনি।

আল্‌তা-মাসি আল্‌তার শিশিটা হাতে নিয়ে বসে পড়লো। বললে, বোস বউমা, বোস। বলে একটা ছোট এ্যালুমিনিয়ামের কৌটো বার করে তাতে খানিকটা আল্‌তা ঢাললে।

তারপর বললে, দেখি মা, তোমার পা'টা বাড়িয়ে দাও—

মিনতিও তাই করলে। আল্‌তা-মাসি মিনতির একটা পায়ে পরম যত্ন করে আল্‌তা পরিয়ে দিলে। তারপরে নিজেই বললে, কী চমৎকার পা জোড়া তোমার বউমা, যেন ননীর তৈরি। এবার ডান পা বাড়িয়ে দাও—

মিনতি তখনও বুঝতে পারছে না তার পায়ে আল্‌তা পরিয়ে মহিলার কী লাভ। সে নিঃসঙ্কোচে তার ডান পা'টাও বাড়িয়ে দিলে। তারপরে তাও যখন শেষ হলো, দু'পায়ের ওপর দু'টো টিপ লাগিয়ে দিলে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে।

তারপর আল্‌তার শিশির মুখে ছিপি এঁটে দিয়ে সিঁদুরের কৌটোটা খুললে। বললে, এইবার তোমার মাথাটা দেখি—

আল্‌তা-মাসির নির্দেশ মতো মিনতি সামনের দিকে মাথা নিচু করতেই মাসি তার সিঁথিতে আস্তে আস্তে সিঁদুর বুলিয়ে দিলে।

কপালের মধ্যিখানেও একটা গোল করে সিঁদুরের টিপ লাগিয়ে দিলে।

তখন আল্তা-মাসি বললে, আশীর্বাদ করি তুমি সোয়ামীর ঘর আলো করে জন্ম-এয়োস্ত্রী হয়ে থাকো বউমা।

বলে বাইরে চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়ে বলেছিল, আবার আসবো মা আমি।

আল্তা-মাসি চলে যাওয়ার আগেই গোষ্ঠ রান্না করতে করতে দৌড়ে এল। বললে, এই নাও, তোমার দক্ষিণে নিয়ে যাও।

—দক্ষিণে দেবে? তা দাও—

আল্তা-মাসি যাওয়ার পর মিনতি বললে, ও কে গো গোষ্ঠদা?

—ও হলো আল্তা-মাসি—

—আল্তা-মাসি মানে?

গোষ্ঠ বললে. ও এই সমস্ত বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সধবাদের আল্তা-সিঁদুর পরিয়ে বেড়ায়।

—তাতে ওর লাভ?

—লাভ কিছুই না।

—তাহলে ওকে তুমি পয়সা দিলে যে?

—পয়সা চায় না, সবাই জোর করে ওকে দক্ষিণে দেয় তাই নেয়।

—কেন এ-রকম করে?

—কেন করে তা কী করে বলবো বউদি।

—কোথায় থাকে?

—আমি জানি না।

মিনতি জিজ্ঞেস করলে, ওর সংসারে কে-কে আছে?

—শুনেছি ওর নিজের কেউ নেই। ওর স্বামীও নেই।

মিনতি অবাক হয়ে গেল। বললে, ওর স্বামীও নেই? তবে যে ওর মাথায় সিঁদুর রয়েছে, পায়ে আল্তা লাগানো।

গোষ্ঠ বললে, লোকে বলে ওর স্বামী নাকি বহুকাল আগে ওকে ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু ওর বিশ্বাস ওর স্বামী আজও বেঁচে আছে। তারপর থেকে ও পাড়ার সব সধবা বউ-ঝিদের আল্তা-সিঁদুর পরিয়ে পরিয়ে বেড়ায়।

—তা ওর পেট চলে কী করে ?

গোষ্ঠ বললে, ওই যে আমি ওকে একটা টাকা দিলুম, ওই রকম সব বাড়ি থেকেই কিছু-না-কিছু দক্ষিণে পায়। তাইতেই ও কোনও রকমে দু'বেলা ভাতে-ভাত রান্না করে খেয়ে নেয়।

কথাটা শুনে মিনতি অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলো। এ আবার কী রকম চরিত্র। তবে কি ও বিশ্বাস করে যে পরের মঙ্গল-কামনা করলে নিজেরও ভালো হয় ? হয়তো তাই, কিংবা হয়তো তা নয়।

দু' একদিন পরে ওই আল্‌তা-মাসি আবার একদিন এলো।

মিনতি আলতা পরতে পরতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলো, আচ্ছা মাসি, মেসোমশাই কোথায় ?

আল্‌তা-মাসি বলে উঠলে, কে জানে কোন্ চুলোয়—

মিনতি বললে, এই পরকে আল্‌তা-সিঁদুর পরিয়ে তোমার কী লাভ ?

—ও মা, বলো কী বউমা, লাভ নেই ?

—বলো না, কী লাভ ?

আল্‌তা-মাসি বললে, পরের উপকার করলে যে লাভ, এই পরের বাড়ির বউ-ঝিদের আল্‌তা-সিঁদুর পরিয়েও তো সেই একই লাভ। এ-জন্মে এইটুকু পুণ্য যদি করতে পারি, তাহলে পরের জন্মে আবার এই রকম সোয়ামী পাবো। আমার সোয়ামীর মতো সোয়ামী কি সহজে পাওয়া যায় বউমা ? অনেক তপস্যা করলে তবে অমন সোয়ামী কেউ পায়।

—তা তোমার সোয়ামীর মতো সোয়ামী তুমি আবার পর জন্মেও চাও ?

আল্‌তা-মাসি বলে উঠলো, তা চাইবো না ? সোয়ামী-ইস্তিরির সম্পর্ক কি এক জন্মের বউমা ? সম্পর্ক তো জন্ম-জন্মান্তরের।

মিনতি বললে-তাহলে তোমাকে একলা ফেলে মেসোমশাই চলে গেল কেন ? এটা কি ভালো কাজ হলো ?

আল্‌তা-মাসি বললে, আমারই পাপে বউমা, আমারই পাপে—

—তোমার পাপে মানে ?

আল্‌তা-মাসি বললে, আমি হয়তো গেল জন্মে কোনও পাপ করেছিলুম। তাই আমাকে ছেড়ে আমার সোয়ামী এমন করে চলে গেছে। তাই তো বউমা এবার এই জন্মে তোমাদের মতো সোয়ামী-সোহাগী বউমাদের আল্‌তা-সিঁদুর পরিয়ে পুণ্য করে বেড়াচ্ছি। যাতে গেল-জন্মের সব পাপ ধুয়ে-মুছে যায়।

আল্‌তা-মাসির বিশ্বাসের কথা শুনে মিনতির মনে যেন খুব ভরসা হলো। ওই সামান্য একজন লেখা-পড়া না জানা মেয়েমানুষের মুখ থেকে অমন কথা শুনতে পাবে এটা মিনতি কল্পনাও করতে পারেনি। তার মনে হলো ওই আল্‌তা-মাসির মতো বিশ্বাস যদি সে পেতো!

একটা একটা করে দিন চলে যাচ্ছিল আর মিনতির মনে হচ্ছিল যেন একটা একটা দিন নয়, একটা একটা বছর কেটে যাচ্ছিল, একটা একটা যুগ! যে মানুষটার ওপর নির্ভর করে মিনতি এত কষ্ট করে কলকাতায় এলো সে-মানুষটা যেন দিনের-পর-দিন মাসের-পর-মাস আরো দূরে চলে যাচ্ছিল। বেশির ভাগ দিন তার দেখাই পাওয়া যেত না। কখন যে সে-মানুষটা ঘুম থেকে ওঠে, কখন যে ঘুমোয় তার সন্ধান রাখা যেন মানুষের পক্ষেও অসাধ্য ছিল।

গোষ্ঠকে মিনতি জিজ্ঞেস করতো, তোমার দাদাবাবু এত সকালে কোথায় গেছে গো?

গোষ্ঠ বলতো, তা তো তিনি আমায় বলে যাননি। নিশ্চয় কোথাও কোনও জরুরী কাজ আছে তাঁর।

—তা এত কী কাজ থাকে গো তোমার দাদাবাবুর?

—তা আমায় কখনও বলেন না তিনি।

মিনতি জিজ্ঞেস করতো, তা আমরা যে এ-বাড়িতে আছি তা তোমার দাদাবাবুর মনে আছে তো?

গোষ্ঠ বলতো, কী বলছেন আপনি বউদি, আপনাদের কথা তো দাদাবাবু সমস্তক্ষণই বলেন আমাকে—

মিনতি অবাক হয়ে যেত গোষ্ঠদার কথা শুনে। বলতো, সে কী। আমাদের কথা তোমার দাদাবাবু সমস্তক্ষণ বলেন? কী বলেন?

গোষ্ঠ বলতো, বলেন আপনাদের খাওয়াদাওয়ার যেন কোনও কষ্ট

না হয়। আপনারা যা-যা খেতে ভালোবাসেন সেই রকম জিনিস বাজার থেকে কিনে এনে রান্না করে দিতে বলেন।

—সে কী? না না, আমাদের জন্যে বিশেষ রান্না করবার দরকার নেই। তোমার দাদাবাবুর জন্যে যা-যা রান্না হবে, আমরা তাই-ই খাবো। আমাদের জন্যে তোমার দাদাবাবুকে অতো ভাবতে বারণ করে দিও।

গোষ্ঠ বলতো, দাদাবাবুর রান্না আপনারা খেতে পারবেন না বউদি। আপনাদের জিভে তা রুচবে না।

—কেন? খেতে পারবো না কেন?

গোষ্ঠ বলতো, সে-রান্নায় তেল নেই, ঘি নেই, মশলা নেই, লঙ্কা নেই কিছ্ছু। উনি তো মাছ-মাংস ডিম-পেঁয়াজ-রসুন কিছু খান না!

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

মিনতি বলতো, তাহলে কি কেবল আমাদের জন্যেই তুমি মাছ রান্না করো?

—হ্যাঁ! মাছ না হলে আপনাদের খেলে কষ্ট হবে, তাই উনি সেই নিয়ম করে দিয়েছেন!

মিনতি খানিকক্ষণের জন্যে হতবাক হয়ে থাকতো। তারপর জিজ্ঞেস করতো, আর তুমি? তুমি কী খাও?

গোষ্ঠ বললো, দাদাবাবু যা খান আমিও তাই খাই। দাদাবাবু বলেন, ওই খাওয়াতেই নাকি শরীর ভালো থাকে।

মিনতি বলতো, না না, শুধু আমাদের জন্যে মাছ রান্নার দরকার নেই। তোমরা যা খাবে আমরাও তাই খাবো। মিছিমিছি কেন শুধু আমাদের জন্যে মাছ রান্না করা!

গোষ্ঠ কিন্তু তা শুনতো না। সে মিনতিদের জন্যে আলাদা করে মাছ রান্না করে দিত।

আসলে গোষ্ঠই ছিল এ-বাড়ির কর্তা, এবং একই সঙ্গে গোষ্ঠই ছিল এ-বাড়ির গিন্নী। দেবব্রত মাইনেটা পেয়েই সেটা গোষ্ঠর হাতে দিয়ে দিত, গোষ্ঠও সেই টাকার মধ্যে সংসার-খরচটা চালাবার চেষ্টা করতো।

দেবব্রত মাঝে মাঝে গোষ্ঠকে জিজ্ঞেস করতো, হ্যাঁ রে, টাকা-কড়ি

আছে তো তোর হাতে ? না কি টাকার দরকার তোর ?

গোষ্ঠ ওই টাকার মধ্যেই সংসার চালিয়ে নিত। বলতো-না, আর টাকার দরকার নেই।

তারই মধ্যে আবার আল্তা-মাসিকেও মাঝে মাঝে আট আনা কি একটা টাকা বখশিশ দিত সে। অনেকবার মাসের শেষের দিকে বলতো, আল্তা-মাসি, আজকে আর কিছু দিতে পারবো না—

আর আল্তা-মাসিও তেমনি। টাকাটা না-পেলেও তার কোনও ব্যাজার নেই। সব সময়েই তার হাসিমুখ। সব সময়েই তার মুখে ওই একই কথা-সোয়ামী-ইস্তিরীর সম্পর্ক কি এক জন্মের মা ? সে সম্পর্ক যে জন্ম-জন্মান্তরের—পরের জন্মে তুমি এই রকম সোয়ামীই যেন পাও বউমা, এই আশীর্বাদ করি।

সেদিন মিনতি বললে, গোষ্ঠদা, তুমি একলা কেন রান্নাবান্না করবে, আমি তো বসেই থাকি. আমিও না হয় তোমাকে একটু সাহায্য করি—

গোষ্ঠ বললে, না না বউদি, তা হয় না আপনি নতুন এসেছেন, আপনি অতো কষ্ট করতে যাবেন কেন ?

মিনতি বলতো, না না, আমি একটু রান্না করি। রান্না না করতে পারলে আমি রান্না করতে যে ভুলে যাবো—

গোষ্ঠ আপত্তি করতো। বলতো, না, আপনি রান্না করছেন শুনলে দাদাবাবু বকাবকি করবেন।

—কেন, বকাবকি করবেন কেন ?

গোষ্ঠ বলতো, না, দাদাবাবু আমাকে বার-বার করে বলে দিয়েছেন বউদির যেন কোনও কষ্ট না হয়।

—কেন ? রান্না করতে বারণ করে দিয়েছেন কী জন্যে ?

গোষ্ঠ বলতো, কী জানি কেন বারণ করেছেন। মনে হয় আপনার কষ্ট হওয়ার কথা ভেবেই বারণ করে দিয়েছেন।

—কেন, কষ্ট হবে কেন ?

গোষ্ঠ বলতো, কষ্ট হবে না ? আপনারা বড়লোকের বাড়িতে জন্মেছেন, আপনাদের কি নিজের হাতে রান্না করা পোষায় ?

—এ-কথা কি তোমার দাদাবাবু তোমাকে বলেছেন ?

—না, আমি বলছি।

মিনতি বলতো, না গোষ্ঠদা, না। আমি তোমাদের মতো গরীবের ঘরেই জন্মেছি, সংসারের কাজ করা আমার অভ্যেস আছে।

না, তবু গোষ্ঠ মিনতিকে কোনও কাজ করতে দিত না।

কিন্তু এ-রকম ভাবে কতোদিন মানুষ চুপ করে বসে থাকতে পারে? স্বাস্থ্য আছে, মন আছে, সময় আছে। এত অফুরন্ত বিশ্রাম নিয়ে কি কেউ বেঁচে থাকতে পারে?

সেদিন হঠাৎ সদর-দরজার কড়া বাজতেই মিনতি কী করবে বুঝে উঠতে পারলে না।

গোষ্ঠদাও কোন কাজ নিয়ে বাইরে গিয়েছে। ঝর্ণাও ঘরের ভেতরে কী একটা ছবির বই নিয়ে পড়ছিল। সদর দরজার ভেতর থেকে মিনতি জিজ্ঞেস করলে, কে? গোষ্ঠদা?

বাইরে থেকে পুরুষের গলার আওয়াজ এলো, দেবুদা আছেন?

মিনতি বললে, না, তিনি বাড়ি নেই।

তবু বাইরে থেকে অনুরোধ এলো, একটু দরজাটা খুলবেন? একটা বই দিয়ে যাবো দেবুদাকে।

অগত্যা দরজাটা খুলতেই হলো মিনতিকে। মিনতি দেখলে একজন ভদ্রলোক একটা বই হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মিনতিকে দেখে ভদ্রলোক যেন একটু অবাক হয়ে গেছেন। হয়তো এ-বাড়িতে একজন মহিলাকে দেখবেন, এটা যেন তিনি আশা করেননি।

—এই বইটা দেবুদাকে দিয়ে দেবেন। বলবেন সুশীল এসেছিল।

—ঠিক আছে।

বলে ভদ্রলোক মিনতির হাতে বইটা দিয়ে চলে গেলেন।

মিনতিও বইটা নিয়ে আবার দরজায় যথারীতি খিল বন্ধ করে দিলে। মিনতি বইটার দিকে দেখে বুঝলে ওপরে লেখা আছে, ভক্তিযোগ। লেখক অশ্বিনীকুমার দত্ত। তারপর যখন গোষ্ঠ এলো তখন সব ঘটনাটা খুলে বললে। বইটাও দিলে তাকে।

গোষ্ঠ বললে, আমি দাদাবাবুকে দিয়ে দেব'খন।

মিনতি জিজ্ঞেস করলে, ওই সুশীল কে গো গোষ্ঠদা?

—ও দাদাবাবুর একজন ছাত্র। ওকে দাদাবাবু মাঝে-মাঝে বই পড়তে দেন। শুধু সুশীল নয়, আরো কতো ছাত্র যে দাদাবাবুর আছে। কিন্তু ছাত্রই শুধু নয়, কতো ভক্তও যে ওঁর আছে তার ঠিক নেই।

এর কিছুদিন পরেই আর এক কাণ্ড হলো। মিনতি দেখলে সেদিন সকাল থেকেই গোষ্ঠ নানা-কাজে খুব ব্যস্ত। প্রথমে মিনতি কিছু বুঝতে পারেনি। গোষ্ঠকেও কিছু জিজ্ঞেস করেনি। সকালবেলা দাদাবাবু যেমন রোজ বেরিয়ে যান, তেমনি বেরিয়ে গেছেন।

বিকেল থেকেই বাড়িতে অনেকে আসতে আরম্ভ করতে লাগলো। একজন নয়, দু'জন নয় ক্রমে ক্রমে দশ-বারোজন লোক। সকলের হাতে ফুলের মালা, মিষ্টির বাক্স। গোষ্ঠ তাদের সকলকেই অভ্যর্থনা করে ঘরের ভেতরে বসালো।

মিনতি আর ঝর্ণা দু'জনেই অবাক হয়ে দেখতে লাগলো। এমন তো হয় না কখনও। হঠাৎ বাড়িতে এত লোকের আমদানি কেন হলো? এর উদ্দেশ্য কী?

গোষ্ঠর তখন খুব ব্যস্ততা চলছে। একবার বাইরের দোকানে যাচ্ছে, আবার বাড়িতে এসে রান্না সামলাচ্ছে। বাইরের ঘরটা তখন লোকজনে ভর্তি হয়ে গেছে। সবাই-ই প্রশ্ন করছে, কী হলো গোষ্ঠ, স্যার কোথায়?

—আপনারা বসুন, দাদাবাবু এখুনি আসছেন।

দূর থেকে মিনতি সমস্ত দেখছিল। ঝর্ণাও দেখছিল। এত লোক কেন তাদের বাড়িতে! এরা কারা!

এক সময়ে আরো চার-পাঁচজন লোক জড়ো হলো।

এরই ফাঁকে মিনতি একবার গোষ্ঠকে ফাঁকা পেয়ে জিজ্ঞেস করলে, আজকে বাড়িতে কী হচ্ছে গো?

—আজকে আমার দাদাবাবুর জন্মদিন বউদি।

—তাই নাকি? জন্মদিন? ওঁরা কারা?

—ওঁরা সব দাদাবাবুর ইস্কুলের ছেলে আর মাস্টার মশাইরা।

—তা তোমার দাদাবাবু এ-দিনে কোথায় গেছেন?

—তাঁর কি কোন ঠিক আছে বউদি? তাঁর সব কথা মনেও থাকে

না। তাঁর কি কম কাজ?

—কী এত কাজ তাঁর।

—সে আপনি বুঝবেন না বউদি, তাঁর যে সকলের সব ব্যাপারে মাথা ব্যাথা···

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই কে একজন তাকে ডাকলে, আর সে সেই দিকেই চলে গেল। তার উত্তরটা পুরো দেওয়া হলো না।

এদিকে সবাই যখন প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠেছে, তখন দেবব্রত বাড়িতে এসে হাজির। দেবব্রতকে দেখে তখন সবাই উল্লসিত।

দেবব্রত তাদের সকলকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কী হে, তোমরা হঠাৎ? কী মনে করে?

এক ভদ্রলোক একটা ফুলের মালা দেবব্রতর গলায় পরিয়ে দিলে।

—কী, ব্যাপার কী? এ-সব কী?

তারপর আরো মালা, আরো ফুল। মালার ভারে দেবব্রত তখন তটস্থ। দেবব্রত গলা থেকে মালা নামাতেও পারছে না, মালা পরাবার মতো জায়গাও নেই তখন তার গলাতে।

—আরে, তোমাদের ব্যাপার কী, হঠাৎ আমি কী করে বসলাম যে, তোমরা এত ফুলের মালা দিচ্ছ?

সুশীল বললে, আজকে যে আপনার জন্মদিন তা আপনি ভুলে যেতে পারেন। কিন্তু আমরা তো তা ভুলতে পারি না।

—আমার জন্মদিন? বলে হো-হো করে দেবব্রত হাসতে হাসতে ঘর ফাটিয়ে দিলে।

হাসি থামিয়ে আবার বললে, তোমরা তো আমায় অবাক করে দিলে হে? তোমাদের স্মৃতি-শক্তি তো খুব প্রখর।

সুশীল বললে, তা আজ এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলেন দেবুদা?

আর বোল না—আমাদের যতীনের বাবার খুব অসুখ। সেইখানে যেতে হয়েছিল।

—যতীন? যতীন কে?

দেবব্রত বললে, যতীন দত্ত, ক্লাশ টেন-এর স্টুডেন্ট, তার বাবার হঠাৎ স্ট্রোক হয়েছে, খবরটা পেয়েই তাদের বাড়িতে গেলুম। গিয়ে

দেখি সব্বাই খুব ভাবনায় পড়েছে। ডাক্তার ডাকবার টাকাও নেই কাছে। তখন আমার এক জানা-শোনা ডাক্তারকে ডেকে আনলুম। তার গাড়িতেই যতীনের বাবাকে হসপিটালে পৌঁছিয়ে দিয়ে সেখানে ভর্তি করিয়ে তবে এখানে আসছি।

সুশীল বললে, এখন কেমন আছেন তিনি?

দেবব্রত বললে, ভালো বলে তো মনে হলো না। কাল সকালে আবার একবার হসপিটালে গিয়ে দেখতে হবে, কেমন আছেন তিনি।

তারপর ডাকলে, ওরে গোষ্ঠ, কোথায় গেলি তুই?

গোষ্ঠ সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। বললে, এই তো আমি—

দেবব্রত বললে, তোর কাছে পঞ্চাশটা টাকা আছে? দিতে পারিস?

গোষ্ঠ পঞ্চাশটা টাকা এনে দিতেই দেবব্রত টাকাগুলো পকেটে রেখে দিয়ে বললে, যতীনটা এত হতভাগা যে ঘরে একটা টাকা পর্যন্ত নেই যে ডাক্তারকে ফী দেবে, এই টাকা দিলে তবে ওদের বাড়ি কাল ভাত রান্না হবে ··।

সুশীল বললে, এবার আমাদের বউদিকে আর ঝর্ণাকে একটু ডাকুন দেবুদা।

বউদি? দেবব্রত তখন অবাক হয়ে চেয়ে রইল সকলের দিকে।

সুশীল, সুব্রত, কেদার সবাই-ই একসঙ্গে বলে উঠলো, আপনি আমাদের কিছুই বলেননি দেবুদা, কিন্তু আমরা সব জেনে গেছি। ডাকুন বউদি আর ঝর্ণাকে। ও গোষ্ঠ, তোমার বউদিকে আর ঝর্ণাকে একবার এ-ঘরে আসতে বলো তো।

গোষ্ঠ ভেতরে গিয়ে মিনতিকে কথাটা বলতেই মিনতি বলে উঠলো, আমি? আমাকে ওঁরা ডাকছেন?

—হ্যাঁ, আপনাকেও ডাকছেন, আর খুকুকেও সবাই ডাকছেন।

মিনতি কথাটা শুনেই কেঁপে উঠেছে।

বললে, আমাকে ওঁরা ডাকছেন? তুমি ঠিক শুনেছ তো গোষ্ঠদা?

—হ্যাঁ বউদি, আমি ঠিক শুনেছি না তো কি বেঠিক শুনেছি? আপনাকে আর খুকুকে দুজনকেই ডেকেছেন। চলুন, অনেক রাত হয়ে গেছে। আর দেরি করবেন না।

সাহাবুদ্দীনের সংসারে যখন মিনতি 'বেগম-মিনতি' হয়ে বাস করতো, তখন তাকে অনেক মীটিং অনেক সভায় যেতে হয়েছে। অনেক জায়গায় গিয়ে সামান্য-কিছু বলতেও হয়েছে অনেক সময়ে। তখন সে-সব অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এবার? এবার এখানে তার পরিচিতি কী? সে কে? সে তো এখানে পত্নী নয়, আশ্রিতা। আশ্রিতা ছাড়া তার আর কী পরিচিতি, আর কী বিশেষণ আছে?

মিনতি বললে, আমি এই ভাবেই যাবো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি যেমন আছেন ওই ভাবেই চলুন। আর খুকু, তুমিও চলো।

কী আর করা যাবে তখন।

যেমন পোশাকে মিনতি ছিল, সেই ভাবেই ঝর্ণাকে নিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে হাজির হলো।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরটার মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে গেল যেন।

সুশীল, সুব্রত, কেদার তারা সবাই-ই এক-একটা মোটা ফুলের মালা নিয়ে এসে মিনতির হাতে তুলে দিলে, ঝর্ণাকেও দিলে এক-একটা ফুলের তোড়া।

শুধু তাই-ই নয়। ফুলের মালা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আবার দুই হাত দিয়ে মিনতির পায়ের পাতা ছুঁয়ে মাথায় ঠেকালে। সেই তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবার পর্ব যেন কিছুতেই শেষ হয় না।

সুশীল বললে, জানেন বউদি, আপনার আসার কথা দেবুদা আমাদের কাছে একবারও বলেনি, পাছে আমরা দেবুদার কাছে মিষ্টি খেতে চাই।

দেবব্রতও বললে, সত্যিই, তোমরা মিনতিকে জানলে কী করে সুশীল?

সুশীল, সুব্রত, কেদার সবাই-ই বললে, আমাদের কাছে আর কতোদিন খবরটা লুকিয়ে রাখবেন দেবুদা?

দেবব্রত বললে, সত্যিই বলো না, তোমরা মিনতির কথা জানতে পারলে কী করে?

সুশীল বললে, আমি একদিন আপনার 'ভক্তিযোগ' বইটা ফেরত দিতে এসেছিলুম, তখন আপনি বাড়ি ছিলেন না।

—তারপর ?

—তারপর আর কী ! আমরা বউদিকে দেখেই চিনতে পেরেছি। কিন্তু আপনাকে কিছু বলিনি। ভেবেছিলুম আপনার জন্মদিনে আমরা সারপ্রাইজ দেব।

দেবব্রত বললে, ও তাই বলো।

বলে হাসতে লাগলো দেবুদা।

তখন সবাই ই সেই হাসিতে যোগ দিয়ে একসঙ্গে হাসতে লাগলো। সবাই বললে, আপনারা দু'জনে একবার একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়ান, একটা ছবি তুলবো—

—ছবি ?

দেবব্রত মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলো। জিজ্ঞেস করলে, ছবি কেন তুলবে তোমরা ?

সুব্রত বললে, এমন সুযোগ তো আর পরে আসবে না, দাদা আর বউদিকে তো আর ভবিষ্যতে একসঙ্গে পাব না।

দেবব্রত বললে, তোমরা কী করে জানলে যে ইনি তোমাদের বউদি ?

সুশীল বললে, আমি জানতে পেরেছি দেবুদা।

দেবব্রত আর এ-কথার প্রতিবাদ করলে না। শুধু বললে, তা তোল।

পাশাপাশি দাঁড়ালো দু'জনে। গোষ্ঠ হঠাৎ বলে উঠলো, তাহলে ঝর্ণা বাদ পড়লো কেন ? ওকেও ছবিতে নিন দাদাবাবু আর বউদির সঙ্গে।

ঝর্ণাকেও দু'জনের মধ্যিখানে দাঁড়াতে হলো।

সুব্রত বললে, একটা মস্ত ভুল হয়ে গেল –

দেবব্রত বললে, কী ?

—আপনার বাঁ পাশে বউদি দাঁড়ালে ঠিক হতো।

সুশীল বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সুব্রত ঠিক বলেছে। বউদি, আপনি দেবুদা'র বাঁ পাশে গিয়ে দাঁড়ান।

আগে এ-রকম কতো বার ফটো তোলা হয়েছে মিনতি আর সাহাবুদ্দীনের। তখন পাকিস্তানের খবরের কাগজেও সে-সব ছবি কতোবার ছাপা হয়েছে। সে-সব এখন এই সময়ে অতীতের পর্যায়ে পড়ে গেছে। সে-সব কথা এখন ভেবে লাভ নেই।

কিন্তু অতীত বলে কি তা চিরকালের মতো মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। মিথ্যে যদি হতো তাহলে ঝর্ণাও তো মিথ্যে হয়ে যেত তার জীবনে। তাহলে তাকে নিয়ে আর লজ্জার মাথা খেয়ে আজ এমন করে এ-বাড়িতে আসতে হতো না।

ফটো তোলা হয়ে গেল গোষ্ঠ বললে, ফটোটা তৈরি হলে আমাকে একটা দেবেন মাস্টার মশাই।

দেবব্রত রেগে গেল। বললে, কেন, ও-ফটো নিয়ে তুই কী করবি? বাড়িতে আমার বই-পত্র রাখবার জায়গা হয় না, তার ওপর আবার ফটো। ও-সব দরকার নেই সুব্রত, ও তোমাকে দিতে হবে না।

তা পরের কথা পরে হবে। সবাই দল-বল নিয়ে চলে যেতে প্রস্তুত।

হঠাৎ গোষ্ঠ বললে, এখন আপনারা যেতে পারবেন না, একটু বসুন।

দেবব্রত তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। বললে, কেন, তোর আবার কী কাজ আছে?

এর উত্তর না দিয়ে গোষ্ঠ বাড়ির ভেতরে চলে গেল। আর খানিক পরেই সবাই দেখে অবাক হয়ে গেল, সে মাটির ডিশ্-এ করে রসগোল্লা নিম্‌কি সিঙাড়া নিয়ে এসে ঘরের মেঝেতে রাখছে। যতোগুলো অতিথি এসেছে, ততোগুলো খাবারের ডিশ্।

সকলের জন্যে খাবারের ডিশ্ আনা হয়ে গেলে সে বলে উঠলো, এবার দয়া করে একটু মুখে দিন আপনারা।

দেবব্রত তার কাণ্ড-কারখানা দেখে ততক্ষণে অবাক। তার খুব রাগ হলো। বললে, এ-সব কী করেছিস রে গোষ্ঠ? এ-সব তোকে আবার কে করতে বললে রে?

এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না সে। সে আবার সকলের দিকে চেয়ে বললে, আপনারা একটু মুখে দিন সবাই।

দেবব্রত বললে, তুই হঠাৎ এ-সব করতে গেলি কেন?

—আজ আপনার জন্মদিন, আজকে করবো না তো কবে করবো?

দেবব্রত বললে, জন্মদিন কি শুধু আজই প্রথম হলো? আগে হয়নি? আগেও তো কতোবার এঁরা জন্মদিন করতে এসেছেন, তখন তো কখনও এই সব কাণ্ড করিসনি।

সুব্রতরা সবাই তখন ডিশ্‌ থেকে খাবার তুলে নিতে আরম্ভ করেছে। বললে, ওকে অতো বকবেন না দেবুদা, আজ তো সকলেরই আনন্দের দিন। ওর আনন্দ হয়েছে তাই করেছে।

দেবব্রত বললে, তা ও জানে না এই কলকাতায় কতো লোক খেতে পায় না, কতো লোকের থাকবার মতো একটা ঘর নেই, কতো লোকের দু'বেলা অন্নই জোটে না।

—থাক থাক, ওকে অতো বকবেন না!

কিন্তু তার রাগ তখনও কমেনি। বললে, ও কা'র টাকা দিয়ে তোমাদের খাওয়াচ্ছে? ও তো আমারই টাকা! সবাই যদি জানতে পারে যে, আমি নিজের পকেটের টাকা খরচ করে নিজের জন্মদিনের উৎসব পালন করছি, এই রকম করে টাকা নষ্ট করছি, তাহলে আমি তাদের কী জবাব দেব বলো তো?

গোষ্ঠ বললে, ও টাকা আপনার নাকি, ও তো আমার টাকা।

—তোর টাকা? তোর টাকা মানে?

—আপনি তো মাইনের সব টাকাটা এনে আমার হাতে তুলে দেন; তাতে ওটা আমার টাকা হলো না?

—তা সে-টাকা তো তোকে দিই সংসার খরচের জন্যে!

—সেই সংসার খরচের টাকা থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়েই তো আমি ওই টাকা জমিয়েছি। আমি যদি টাকা না জমাতাম তো আজকে এই মিষ্টি খাওয়াতে পারতুম?

—তুই সংসার খরচ থেকে টাকা বাঁচালি বলেই ওমনি ওটা তোর টাকা হয়ে গেল? তাহলে আর এবার থেকে মাইনের টাকাটা এনে তোর হাতে তুলে দেব না।

গোষ্ঠ বললে, তা না-দেবেন না-দেবেন! আমার কী? তখন আপনি কোনও দিন খেতেই পাবেন না।

—কেন, খেতে পাবো না কেন?

গোষ্ঠ বললে, আপনি কি সারাদিন বাড়িতে থাকেন যে যখনই টাকার দরকার হবে আর অমনি তখনই আপনার কাছে টাকা চাইবো? ও-সব আমি পারবো না।

দেবব্রত বললে, তা না পারিস তো আমারও দরকার নেই তোকে, আমি অন্য লোক রাখবো।

গোষ্ঠর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, তাহলে আমি চলে যাই—

বলে আর দাঁড়ালো না। যেমন অবস্থায় ছিল তেমনি অবস্থায় রাস্তার দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল। কিন্তু দেবব্রত তার হাতটা খপ্ করে ধরে ফেললে। বললে, কোথায় যাচ্ছিস তুই?

—আপনি যে বললেন, আপনার আর দরকার নেই আমাকে।

—যদি চলেই যাবি তো আমার টাকাগুলোর হিসেব দিয়ে যা।

—হিসেব? টাকার হিসেব চাইছেন আপনি?

—তা হিসেব চাইবো না? টাকা যখন আমার তখন তার হিসেব চাইবারও আমার অধিকার আছে!

সুশীল বললে, দেবুদা, ওকে ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন ওকে।

—কেন ছেড়ে দেব? হিসেব দেবে না আমার টাকার, আর ওকে ছেড়ে দিলেই হলো?

গোষ্ঠ মাস্টারমশাইদের দিকে চেয়ে বললে, দেখছেন তো আপনারা, আমাকে তাড়িয়েও দেবেন, আবার যেতেও দেবেন না—এ তো এক মহা জ্বালা।

দেবব্রত বললে, তা তুই হিসেব দিয়ে যাবি তো?

গোষ্ঠ এবার দৃঢ় হয়ে দাঁড়ালো। বললে, না, হিসেব আমি দেব না। যা করতে পারেন করুন।

—জানিস, টাকা তছরুপের দায়ে তোকে পুলিশে দিতে পারি?

—তাই দিন না পুলিশের হাতে, তাহলে তো বেঁচেই যাই। জেলে থাকলে কারোর কোনও দায়-দায়িত্বও অন্ততঃ নিতে হবে না।

সুশীল বললে, গোষ্ঠ, তুমি আর কথা বাড়িও না, থেকে যাও, দেবুদা যা বলেন, তুমি চুপ করে শুনে যাও।

গোষ্ঠ তখনও তার সিদ্ধান্তে অটল। বললে, না, আমি চলে যাবোই, আজ রাত্তিরেই আমি চলে যাবো।

—চলে যাবি মানে ?

— চলে যাবো মানে চলে যাবো !

—না, আমার কাজগুলো সব সেরে দিবি, তবে যেতে দেব তোকে।

—আমার রান্না-বান্না সব শেষ, শুধু থালায় বেড়ে নিয়ে খেতে হবে। তা সেটাও নিজেরা পারবেন না ?

দেবব্রত বললে. না, তোকে থালায় ভাত বেড়ে দিতে হবে, আমি খেতে বসবো, আর তার আগে আমার পুজোর জায়গা করে দিতে হবে। জপ-তপ-আহ্নিক শেষ না করে তো আমি খাবো না, সে-সব কে করবে ? আমি করবো ? আমি নিজের হাতে কখনও ও-সব কাজ করেছি যে আজ করবো।

—দেখছেন তো বাবুরা, এই মানুষটাকে নিয়ে আমি কী যে করি ?

সকলেরই তখন বাড়ি যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছিল। তাই সবাই বললে, তুমি আর কিছু বোল না গোষ্ঠ, চুপ করে থাকো। দেবুদার কোনও কথায় রাগ কোর না।

গোষ্ঠ বললে, আপনাদের দেবুদা কেবল বলছেন, আমি কেন অতো টাকা নষ্ট করে আপনাদের খাবার খাওয়ালুম। তা আপনারাই বলুন, এতদিন পরে বাড়িতে বউদি এসেছেন, তাতে আমার আনন্দ হওয়া কি অন্যায় হয়েছে ? এর আগে আপনারা তো দাদাবাবুর জন্মদিনে কতবার এসেছেন, তখন কি কখনও আপনাদের জলখাবার খাইয়েছি ? বউদি আর খুকুমণি বাড়িতে না এলে কি আজকেও আমি আপনাদের খাওয়াতুম ? না, খাওয়াতুম না ! তা এতেও যদি অন্যায় হয়ে থাকে তো অন্যায় হোক, আমি ঘাট মানছি, আমি এবার থেকে তাহলে সমস্ত টাকা-পয়সার হিসেব রাখবো, এই আপনাদের সামনেই আমি কথা দিচ্ছি, একটা পাই পয়সারও হিসেব রাখবো।

দেবব্রত তখন তার হাত ছেড়ে দিয়ে সকলের দিকে চেয়ে বলতে লাগলো, তোমরা দেখলে তো ! গোষ্ঠ এই রকমই লোক ! ওর সব ভালো, শুধু রেগে গেলে ওর মাথার ঠিক থাকে না !

এমনি করেই দেবব্রত আর মিনতির সংসার চলছিল। কিন্তু আসলে কি এটা তাদের সংসার? না, এই সংসারটার আসল মালিক দেবব্রতও নয়, মিনতিও নয়। আসল মালিক ছিল গোষ্ঠ। সেই ছিল এই সংসারের আসল চালক। সেদিন গোষ্ঠ যথারীতি রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিল।

মিনতি বললে, গোষ্ঠদা একটা কাজ করবে?

—বলুন বউদি, কী কাজ?

—জানি না তুমি শুনে কী বলবে! আমার বলতে বড্ড ভয় করছে।

—আপনি বলুনই না বউদি। ভয় কিসের?

মিনতি বললে, তোমার দাদাবাবু যদি কিছু বলেন, তখন?

—দাদাবাবু আবার কী বলবেন? আপনি তো দেখছেন দাদাবাবু এ-বাড়ির কেউ-ই নন। তিনি কেবল তাঁর ছাত্র আর ইস্কুল নিয়ে থাকেন। তাঁর মাইনেটা আমার হাতে ফেলে দিয়েই তিনি খালাস। বেগুন, আলু, পটল, সরষের তেলের কী দাম তা নিয়ে কি কখনও মাথা ঘামিয়েছেন। না মাথা ঘামাবেন? তাঁর ছাত্ররা মানুষ হলেই তিনি খুশী, আর কোনও দিকে তাঁর নজর নেই।

—এ-রকম কেন হলেন বলো তো তোমার দাদাবাবু?

—কারণটা আমি কী করে জানবো বলুন বউদি?

—তবু তুমি কী আন্দাজ করো? কেন ও-রকম হলেন?

—আমি আন্দাজ কী করে করবো? তবে দেখতাম প্রায়ই উনি আড়ালে কাঁদতেন।

—কাঁদতেন? কী জন্যে কাঁদতেন? কার জন্যে কাঁদতেন? বাবা-মা মারা যাওয়ার জন্যে?

গোষ্ঠ বললে, আমিও কিছু কারণ বুঝতে না পেরে শেষকালে

একদিন জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কী শরীর খারাপ দাদাবাবু? দাদাবাবু আমাকে দেখলেই কান্না থামিয়ে দিতেন। বলতেন, যা যা. তুই চলে যা এখান থেকে, তুই তোর নিজের কাজ করগে যা।

—তারপর?

—তারপর একদিন পাড়ার এক ডাক্তারবাবুকে আমি বাড়িতে ডেকে আনলুম। ডাক্তারবাবুকে বললুম, আমার দাদাবাবু একলা থাকলে প্রায়ই কাঁদেন। আপনি তাঁকে দেখে কিছু ওষুধপত্তোর দিয়ে যান। নিশ্চয়ই তাঁর কোনও অসুখ হয়েছে। নইলে একলা থাকলেই উনি অতো কাঁদেন কেন? তা ডাক্তারবাবু এলেন।

তাঁকে দেখে দাদাবাবু তো অবাক। বললেন, কী হলো ডাক্তারবাবু, আপনি কাকে দেখতে এসেছেন? কার অসুখ হয়েছে এ বাড়িতে?

ডাক্তারবাবু আরো অবাক দাদাবাবুর কথা শুনে। বললেন, কার আবার, গোষ্ঠ বললে আপনার নাকি অসুখ হয়েছে। আপনি নাকি একলা-একলা যন্ত্রণায় কাঁদেন?

—আমি যন্ত্রণায় কাঁদি? গোষ্ঠ বলেছে আপনাকে?

দাদাবাবু তখন আমায় ডেকে বললেন, হ্যাঁ রে, তুই নাকি ডাক্তার-বাবুকে বলেছিস যন্ত্রণার চোটে একলা-একলা কাঁদি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো দেখেছি, আপনি যন্ত্রণায় কাঁদেন। আর আমাকে দেখেই কান্না থামিয়ে দেন, পাছে আমি ডাক্তার ডেকে আনি।

—দূর বেটা, তুই যা এখান থেকে। আমাকে কি পাগল পেয়েছিস নাকি যে, আমি আপন মনে কেবল একলা-একলা কাঁদবো? যা তুই এখান থেকে, আর ডাক্তারবাবুকে ওঁর ফী চার টাকা দিয়ে দে।

ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে বললেন, ব্যাপারটা কী বলুন তো দেবব্রত-বাবু? গোষ্ঠ নিশ্চয়ই আপনাকে কাঁদতে দেখেছে। নইলে মিছিমিছি আমাকে ডাকবে কেন? ব্যাপারটা কী বুঝিয়ে বলুন তো।

দাদাবাবু বললেন, দেখুন ডাক্তারবাবু, আমি কাঁদি না। আমি কেন মিছিমিছি কাঁদতে যাবো। যাঁরা কাঁদেন তাঁরা অন্য লোক। তাঁদের গোষ্ঠও দেখতে পায় না, কোনও মানুষই দেখতে পায় না। কেবল আমিই দেখতে পাই তাঁদের, আমিই তাঁদের কান্না শুনতে পাই।

ডাক্তারবাবু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, কারা কাঁদেন ?

দাদাবাবু বললেন, গোষ্ঠ তো লেখাপড়া জানে না, একেবারে আকাট মুখ্যু। কিন্তু ডাক্তারবাবু, আপনি তো লেখাপড়া করেছেন। বললে আপনি বুঝলেও বুঝতে পারবেন—কাঁদেন কারা জানেন ? কাঁদেন ভগবান।

— ভগবান কাঁদেন মানে ?

দাদাবাবু বললেন, মানুষের যিনি ভগবান, তিনিই কাঁদেন।

—কেন, মানুষের ভগবান কাঁদেন কেন ?

—বারে, কাঁদবেন না ? চার টাকা মণ চালের দাম দেড়শো টাকায় উঠলে মানুষ খাবে কী ? সোনার দাম বাড়লে মানুষের ক্ষতি নেই, কারণ মানুষ তো সোনার ভাত কিংবা সোনার রুটি খায় না, কিন্তু আলু, তেল, কয়লা, কাঠ, এসব জিনিস তো মানুষ যতো গরীবই হোক, তাকে খেতেই হবে। কিন্তু কেন তার দাম এতো হাজার গুণ বাড়বে ? আগে না হয় ইংরেজরা ও সব জিনিস লুঠপাট করে নিজের দেশে নিয়ে যেত, কিন্তু এখন ? এখন কে সেই আগেকার মতোন লুঠপাট করে খাচ্ছে ? তারা কারা ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তারবাবু কী আর বলবেন ? ও-সব কথার উত্তর ব্রিটিশ মেডিকেল ফার্মাকোপিয়ায় লেখা থাকে না।

দাদাবাবু তখনও বলে চলেছিলেন, জানেন ডাক্তারবাবু আমি রাস্তা দিয়ে যাই আর কেরোসিন তেলের দোকানের সামনে মানুষের লাইন দেখে ভগবানের কান্না শুনতে পাই। আবার সিনেমা-ঘরের সামনে দিয়ে যখন যাই তখনও মানুষের লাইন দেখে ভগবানের কান্না শুনতে পাই। আপনি শুনতে পান না সে-কান্না ?

ডাক্তারবাবু বললেন, না তো!

দাদাবাবু সে-উত্তর শুনে মোটেই আশ্চর্য হলেন না।

বললে, শুধু আপনি যে শুনতে পান না তাই নয় ডাক্তারবাবু ইণ্ডিয়ার প্রাইম মিনিস্টার জওহরলাল নেহেরু পর্যন্ত সে-কান্না শুনতে পান না। বল্লভভাই প্যাটেল শুনতে পান না, মোরারজী দেশাই শুনতে পান না, আবুল কালাম আজাদ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, অতুল্য ঘোষ, বিধান

রায়, প্রফুল্ল সেন, তাঁরাও ভগবানের কান্না শুনতে পান না। এ-অবস্থায় আমি কী করি, বলুন? এ-কান্না কী করলে থামবে বলুন তো ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু চুপ করে তাঁর রোগীর কথাগুলো শুনছিলেন, কিন্তু কোনও জবাব দিচ্ছিলেন না। কারণ এ-সব প্রশ্নের উত্তর তাঁর ব্রিটিশ মেডিকেল ফার্মাকোপিয়ায় লেখা নেই।

দাদাবাবু আবার বলতে লাগলেন, আমি কী করি বলুন তো ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু কাজের লোক। একজন পাগল-রোগীর কাছে বেশিক্ষণ বসে থাকলে তাঁর চলবে না। আরো অনেক 'কল্' আছে তাঁর। পাড়ার অনেক রোগী তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে।

গোষ্ঠ ঘরে ঢুকে তাঁর হাতে 'ভিজিট'টা দিতেই তিনি উঠলেন।

তাঁকে চলে যেতে দেখেই দাদাবাবু বলে উঠলেন, আপনি যাচ্ছেন ডাক্তারবাবু?

—হ্যাঁ, যাচ্ছি।

দাদাবাবু বললেন, কিছু ওষুধ দিলেন না? কোনও প্রেস্‌ক্রিপশন্ লিখে দিলেন না?

—কী ওষুধ দেব আপনাকে, বলুন?

দাদাবাবু বললেন, তাহলে আমার কী হবে?

—আপনার কিছুই হয়নি। মিছিমিছি ওই নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন!

দাদাবাবু বললেন, তাহলে আপনি বলতে চান ভগবান কাঁদছে না?

—না না, ও-সব বাজে কথা। আপনি একটু ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করুন, একটু আরাম করে ঘুমোন, আপনার কিছুই হয়নি।

—কিন্তু···

তখন আর বাজে-কথা শোনবার মতো সময় নেই ডাক্তারবাবুর। সময় নেই রোগীর রোগ সারানোর চিকিৎসার জন্যে নয়, সময় নেই টাকা উপায়ের জন্যে। ডাক্তারবাবুর কাছে সময় মানেই টাকা। ডাক্তারবাবুর তাই কেবল মনে হয়-চব্বিশ ঘণ্টায় দিন না হয়ে যদি আটচল্লিশ ঘণ্টায় দিন হোত! যদি বাহাত্তর ঘণ্টায় দিন হতো···

যতো দিন যাচ্ছে, পৃথিবীর মানচিত্র ততো বদলে যাচ্ছে। মানচিত্রের রংও ততো বদলে যাচ্ছে। আজ যে-দেশটার রং লাল, কাল সে-দেশটার রং নীল হয়ে যাচ্ছে। আর দেশগুলোর রং যতো বদলাচ্ছে মানুষও ততো বদলে যাচ্ছে। দেশের মানুষগুলোর রংও ততো বদলে যাচ্ছে।

দেবব্রত সরকার কিন্তু বদলাচ্ছে না।

তার যে খাওয়া, তার যে ব্যবহার, তার যে চাল-চলন, তার যে আদর্শ, সেখানে কোনও রদ-বদল হচ্ছে না একবারও।

গোষ্ঠ দাদাবাবুকে খেতে দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, আর দুটি ভাত দেব দাদাবাবু?

দেবব্রত শুকনো উত্তর দিল—না—

—আর তরকারি নেবেন?

দেবব্রত বললে-না—

গোষ্ঠ তবু পীড়াপীড়ি করে, এ-রকম করে খেলে শরীর তো খারাপ হবেই। এত কম খেলে শরীরটা টিকবে কী করে?

দেবব্রত বললে, শরীর টিকিয়ে রেখে কী হবে রে বোকা। জানিস, এই কলকাতায় দেড় লক্ষ লোক ফুটপাথে জীবন কাটায়, আর ফুটপাথেই মারা যায়। তাদের কথা একবার ভাব।

গোষ্ঠ বলে তা বলে আপনি উপোস করে থাকবেন? আপনি না খেয়ে থাকলে কি তারা বেঁচে উঠবে?

দেবব্রত বললে, দূর পাগল, তুই একটা আস্ত গাধা। এই রকম বুদ্ধি বলেই তোর কিছ্ছু হলো না। তোকে কতো লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করলুম, কতো বই কিনে দিলুম তোকে, যাতে চিরকাল আমার বাড়িতে চাকর হয়ে থাকতে না হয়। কিন্তু তুই তো কিছু শিখলি না, কেবল আমার বাড়িতে ভাত রান্না করেই জীবন কাটিয়ে দিলি—

গোষ্ঠ বললে, তা আমি যদি লেখাপড়া শিখে চাকরি করতুম তো আপনাকে কে রান্না করে দিত ?

দেবব্রত বললে, সে কী ? তুই আমার খাওয়ার কথা ভেবেই লেখা-পড়া শিখলি না নাকি ?

গোষ্ঠ বললে, তা আপনার কথা ভাববো না ?

দেবব্রত বললে, তা কলকাতায় যাদের বাড়িতে গোষ্ঠ নেই তারা কি সবাই উপোস করে আছে নাকি ? নাকি তারা সবাই হোটেলে খায় ?

—তাদের কথা আলাদা, কিন্তু আপনি তো তাদের মতো নন্—

দেবব্রত বললে, আমি তাদের মতো নই তো আমি কী ?

গোষ্ঠ বললে, তা আমি বলবো না, বললে আপনি রেগে যাবেন।

—কেন, আমি সে-কথা শুনলে রেগে যাবো না, তুই বল্ আমি শুনবো !

গোষ্ঠ বললে, তাদের দেখাশোনা করবার লোক আছে, কিংবা বউ-ছেলে-মেয়ে আছে, কিন্তু আপনার কে আছে ?

দেবব্রত বললে, কেন ? আমার বউ নেই ? আমার মেয়ে নেই ? ওই তো তোর বউদি রয়েছে, ঝর্ণা রয়েছে। ঝর্ণা ইস্কুলে যাচ্ছে, লেখাপড়া করছে। তারা আমাকে দেখবে।

গোষ্ঠ বললে, থাক, আপনার সঙ্গে আর বক্-বক্ করতে পারি নে, আমার কাজ আছে, আমি যাই ··

বলে গোষ্ঠ চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু দাদাবাবু তাকে ছাড়লেন না।

বললেন, কোথায় পালাচ্ছিস ? শুনে যা—

গোষ্ঠ দাঁড়িয়ে পড়লো। বলুন, কী বললেন ?

—তুই যে বললি আমার বউ নেই, ছেলে-মেয়ে নেই, তা ওরা কারা ? ওই যে মিনতি আর ঝর্ণা ? ওদের আমি খেতে পরতে দিচ্ছি না ? ওদের আমি লেখাপড়া শেখাচ্ছি না ?

গোষ্ঠ এর জবাবে কী বলবে তা ভাবতে গিয়ে তার ভয় হলো। ভয় হলো এই ভেবে যে যদি তার ঠিক জবাবটা শুনে দাদাবাবু রাগ করেন ?

—কই, জবাব দিচ্ছিস নে যে ? চুপ করে রইলি কেন ? কথার জবাব দে ?

গোষ্ঠ তবুও চুপ করে রইল।

—কথার জবাব দিচ্ছিস নে কেন? দে জবাব?

গোষ্ঠ এবার মরিয়া হয়ে জবাব দিলে, আপনার নিজের যদি বউ থাকে, মেয়ে থাকেই তো আপনি কাঁদেন কেন?

—আমি কাঁদি?

গোষ্ঠ বললে, আপনি কাঁদেন না? আপনি ভাবছেন আমি কিছু বুঝিনে? আমি কিছু লক্ষ্য করিনে?

গোষ্ঠর জবাবটা শুনে দেবব্রত সেখানে বসে বসেই কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইল। তারপর বললে, ওরে গোষ্ঠ, দেশের যে একটা লোক নেই যে কাঁদে। কান্না কি সাধে আসে আমার? আমার ভগবানও যে কাঁদেন রে!

গোষ্ঠ চুপ করে রইল।

দেবব্রত বললে, তোকে এ-সব বলা বৃথা রে গোষ্ঠ। বৃথা। তোর কোনও দোষ নেই। তোকে আমি লেখাপড়া শেখাইনি, তুই তো বুঝবিই না। কিন্তু জওহরলাল নেহেরু তিনি তো লেখাপড়া জানা লোক, বিলেতফেরত। কতো বিদ্যে তার, কতো বুদ্ধি। তারপর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আবুল-কালাম আজাদ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজা-গোপালাচারী, অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল সেন, হুমাউন কবীর। তারা সবাই লেখাপড়া জানা লোক। মানুষের ভগবান যে কতো কাঁদছে, কতো দুঃখে কাঁদছে, তা তারা কেউ শুনতে পাচ্ছে না।

গোষ্ঠ বললে, কেন, ভগবান কাঁদছে কেন?

দেবব্রত বললে, কাঁদবে না? এত কোটি-কোটি মানুষের সর্বনাশ হয়ে গেল। এত কোটি-কোটি মানুষ বিধবা হলো, এত কোটি-কোটি মানুষ বাবা-মা'কে হারালো। কোটি-কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হলো, এর কষ্টের জন্যে কে দায়ী তুই বল।

গোষ্ঠ তবু কোনও জবাব দিলে না। তার কাছে দাদাবাবুর এই চেহারা চেনা।

দেবব্রত খাওয়া তখন হয়ে গিয়েছে। আশে-পাশে তখন কেউ নেই। দোতলার সেই এক চিলতে ঘরটাতে বসেই দেবব্রত [illegible]

একতলা থেকে সেই খাবার এনে তাঁর ঘরে পোঁছে দেয় গোষ্ঠ। যতোক্ষণ দেবব্রত খায়, ততোক্ষণ সে পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। খাওয়ার তদারক করে।

সেদিনও তাই-ই হয়েছিল। হঠাৎ কী-প্রসঙ্গে কী-প্রসঙ্গ উঠে গেল, আর কথার প্রসঙ্গ অন্য দিকে ঘুরে গেল।

দেবব্রত বললে, কী রে, কথার জবাব দিচ্ছিস নে কেন? জবাব দে? বল্ না তাদের যে এই সর্বনাশ হলো তার জন্যে কে দায়ী তুই বল?

গোষ্ঠ চুপ করে রইল বরাবরের মতো।

কিন্তু দেবব্রত তাকে রেহাই দিল না।

বলতে লাগলো, তুই জবাব দিতে পারবি নে, তা আমি জানি। কিন্তু আমার কাছে যে সবাই জবাবদিহি চাইছে।

—কে জবাবদিহি চাইছে?

দেবব্রত বললে, ওরে, কে জবাবদিহি চাইছে না তাই-ই শুধু জিজ্ঞেস কর তুই। ওই বিনয়দা যে জবাবদিহি চাইছে।

—কে বিনয়দা?

দেবব্রত বললে, বিনয়দাকে চিনিস নে তুই? ওই দেখ, ওই ছবিটার দিকে চেয়ে দেখ। ওই বিনয়দা রোজ আমার কাছে জবাবদিহি চায়! ওই বিনয়দা, দীনেশদা বাদলদা সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করে—এই রকমই যদি হবে, তাহলে কেন আমরা ফাঁসির দড়ি গলায় পরলুম?

একটু থেমে দেবব্রত আবার বলতে লাগলো, আর শুধু ওরা? ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকী থেকে আরম্ভ করে চট্টগ্রামের মাস্টারদা সূর্য সেন, ওদিকে ভগৎ সিং, সুকদেব, চন্দ্রশেখর আজাদ, বিসমিল, সবাই আমাকে দিন-রাত বলে-দাও, দাও জবাবদিহি। তোমরা যদি গদি আঁকড়ে বসতেই চেয়েছিল, নিজের স্বার্থটাই দেখতে চেয়েছিলে, তাহলে কেন আমরা জীবন দিলুম, কেন আমরা ফাঁসির দড়িতে ঝুললুম, কেন আমাদের জীবন বলি দিলুম? তোমরা প্রাইম মিনিস্টার, ডেপুটি মিনিস্টার, চিফ্ মিনিস্টার হয়ে আরাম করবে বলে?

তারপর বোধহয় আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু নিচের একতলা থেকে হঠাৎ মিনতির গলায় আওয়াজ এলো, ও গোষ্ঠদা, গোষ্ঠদা—

গোষ্ঠ ওপর থেকেই সাড়া দিলে, যাই বউদি—

তারপর দেবব্রতর দিকে চেয়ে বলে উঠলো, ওই বউদি ডাকছেন, ঝর্ণাকে ইস্কুলে পৌঁছিয়ে দিতে যাবেন, আমি দরজায় খিল বন্ধ করে আসছি—আমি এখুনি আসবো, আপনি যেন উঠে যাবেন না।

দেবব্রত সরকার তখনও খাচ্ছে। মিনতি তার মেয়েকে নিয়ে ইস্কুলে পৌঁছে দেব, তারপর আবার বাড়িতে ফিরে আসবে। তারপর আবার বিকেল হওয়ার আগে মেয়েকে স্কুল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসতে যাবে? এটা কী রকম নিয়ম এখনকার? কই, দেবব্রত সরকারও তো একদিন দৌলতপুরে স্কুলে যেতো, তখন তো কেউ তাকে স্কুলে পৌঁছিয়ে দিতে সঙ্গে যেত না।

শুধু দেবব্রত সরকারই নয়। ততো বড়োলোকই সকলের ছেলেরাই তখন একলা একলা স্কুলে যেত।

শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও একলা-একলা স্কুলে গিয়েছে। কেউ তাদের কোনও বিপদের আশঙ্কা করতো না।

সে সব তো দৌলতপুরের কথা। কিন্তু তখন তো দেবব্রত কলকাতায় কাকার বাড়িতে এসেছে। কলকাতায় এসেও দেখেছে ছেলেরা মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে একলা-একলা। সঙ্গে পাহারা দেওয়ার জন্যে কেউই থাকতো না।

কিন্তু এখন কেন তা হয় না। কেন স্কুলে ছেলে-মেয়েরা একলা যেতে ভয় পায়? একলা গেলে কাকে ভয়? এখন তো ইংরেজরা এ দেশ ছেড়ে চলে গেছে। তারাই তো তখন ছিল দেশের লোকের বড় শত্রু? এখন শত্রু কারা? তাহলে কি দেশের লোকরাই দেশের লোকের শত্রু? এ-রকম কেন হবে? স্বাধীন দেশের লোকরাই কি স্বাধীন দেশের লোকদের শত্রু?

হঠাৎ গোষ্ঠ আবার এসে গেল।

বললে, দরজায় খিল লাগিয়ে দিয়ে এলুম। আর কী চাই বলুন?

দেবব্রত বললে, আর কিছু চাইনা রে। আজকে তোর জ্বালায় অনেক খেয়ে ফেলেছি রে, পেট একেবারে ভরে গেছে।

বলে দেবব্রত উঠে পড়লো।

গোষ্ঠ এঁটো বাসনগুলো তুলে নিয়ে যেতে যেতে বললে, দিন-দিন আপনি খাওয়া এত কমিয়ে দিচ্ছেন কেন বুঝতে পারছি নে। এ তো একেবারে পাখির খাওয়া। এতে আপনার শরীর টিকবে কী করে?

দেবব্রত হাত ধুতে ধুতে বললে, তুই কেবল আমায় বেশি খাইয়ে খাইয়ে মেরে ফেলতে চাস। আমাকে কি তুই বাঁচতে দিবি না?

বলে একটু থেমে আবার বললেন, আর তুই তো খবরের কাগজও পড়বি না, দেশের হালচালেরও খবর রাখবি না। তুই কি জানিস যে আমাদের দেশের শতকরা ষাট ভাগ লোক আধপেটা খেয়ে বেঁচে থাকে!

গোষ্ঠ বললে, সে যারা আধপেটা খেয়ে বেঁচে থাকে তাদের কথা ছাড়ুন। কিন্তু তা বলে আপনি কেন আধপেটা খেতে যাবেন? আপনার কিসের দায়?

দেবব্রত বললে, কী বলছিস তুই? পাগলেরাই শুধু ওই কথা বলে। আমি কি আমাদের দেশের লোক নই? শতকরা ষাট ভাগ লোক যদি আধপেটা খেয়ে থাকে তো সে-অবস্থায় আমার কি ভরপেট খাওয়া উচিত? আমিও তো একজন এ-দেশের লোক রে।

গোষ্ঠ তখন সংসারের অনেক কাজ বাকি। পাগলের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করবার ফুরসৎ তার নেই।

গোষ্ঠ বললে, আমি যাই। আপনার পুরনো কাপড়-জামা সাবান-কাচা করে দিয়েছি, নতুন কাচা পাঞ্জাবি আর ধুতি রেখে দিয়েছি, সেইগুলো পরে নেবেন, ভুলবেন না।

—কই গো, বউদি-মণি কই?

ওই গলা এ-পাড়ার সব বাড়িরই চেনা গলা। ওই গলার শব্দ মানেই আল্‌তা-মাসির বাড়িতে আসা।

—কী গো আল্‌তা-মাসি? দু'দিন আসোনি কেন?

আল্‌তা-মাসি বললে, আমার যজমান দিন-দিন বেড়ে যাচ্ছে গো। এই বুড়ো বয়েসে আর কত দিক সামলাই?

তারপর জিজ্ঞেস করলে, তা বউদি-মণি কোথায়?

গোষ্ঠ বললে, বউদি মেয়ের ইস্কুলে গেছে।

—তা ইস্কুল থেকে আসতে এত দেরি কেন আজ?

—আজকে ঝর্ণা দিদিমণির ইস্কুলে নাচ-গান আছে।

—নাচ-গান? ঝর্ণা আবার নাচে নাকি?

—বউদি যে ঝর্ণাকে নাচের ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে।

—ভালো ভালো, খুব ভালো। আমি তাহলে একটু ঘুরে আসছি।

গোষ্ঠ বললে, কিন্তু বেশি দেরি কোর না। বউদি এখখুনি এসে যাবে। ততোক্ষণ একটু চা দেব? মুড়ি দিয়ে চা খাবে?

আল্‌তা মাসি বললে, তা দাও চা।

গোষ্ঠর চা তৈরি করা শেষ হওয়ার আগেই বউদি মেয়েকে নিয়ে বাড়িতে এসে হাজির হলো।

—যাক, ভালোই হয়েছে। বলে গোষ্ঠ চায়ের কেটলিতে আরো দু'কাপের মাপে জল আর চা ফেলে দিলে। মিনতি ঢুকেই আল্‌তা-মাসিকে দেখে বলে, ওমা, তুমি কতোক্ষণ বসে আছো মাসী?

—বেশীক্ষণ নয়, তা বউদি তোমার মেয়ে নাচ-গান শিখছে বুঝি?

মিনতি তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে পোশাকী শাড়ী বদলে আটপৌরে শাড়ী পরে এল। বললে, আজকে নতুন কোনও খবর আছে মাসী?

আল্‌তা-মাসি রোজই বাড়িতে এসে এ পাড়া ও পাড়া সে পাড়ার বউ-ঝিদের গল্প করে। কবে কোন পাড়ার বউ বিধবা হলো, কোন পাড়ার বউ সিঁথিতে সিঁদূর নিয়ে শ্মশানে গেল, তার কথা বলে।

—তোমার খুব পুণ্য হচ্ছে মাসি। তুমি কতো লোকের আশীর্বাদ পাচ্ছো। দেখবে একদিন আমার মেসোমশা'ই ঠিক ফিরে আসবে।

—তা যদি হয় তো তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক বউদি—সে যে আমাকে সারাজীবন কতো জ্বালিয়েছে তার ঠিক নেই। তবু আমি এয়োতি মেয়েদের আল্‌তা পরানো সিঁদুর লাগানো ছাড়িনি।

—কেন এই রকম এয়োতি মেয়েদের আল্‌তা-সিঁদূর পরিয়ে বেড়াও তুমি মাসি ?

—পরাবো না ? তোমার মেসো কি আমায় কম জ্বালিয়েছে ভাবো ? একদিন আমি তোমার মেসোকে জব্দ করবো তবে ছাড়বো।

—কী করে জব্দ করবে ? মেসোকে পাবে কোথায় ?

—পাবো না ? তোমার মেসো পালাবে কোথায় ? যেখানে পালাবে আমি সেখান থেকে তাকে ধরে টেনে নিয়ে এসে ছাড়বো।

—কী করে টেনে আনবে ?

আল্‌তা-মাসি বললে, এই তোমাদের মতোন এয়োস্ত্রী বউ-ঝি-ঝি'দের আল্‌তা পরিয়ে আর সিঁথিতে সিঁদূর পরিয়ে।

—কতো দিন মেসো তোমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে ?

—সে কি আমি হিসেব রেখেছি বউদি ? এই যে আমাকে একলা ফেলে পালিয়ে যাওয়া, এর আমি শোধ নেব তবে ছাড়বো।

—কী করে শোধ নেবে ?

—আমি আর শোধ নেব কী করে, আমার তো আর অন্য কোনও রাস্তা নেই। তাই এই আল্‌তা-সিঁদূর পরানোর রাস্তা ধরেছি।

আল্‌তা-মাসির গল্প শুনতে বড়ো ভালো লাগতো মিনতির। এরকম মানুষ আগে কখনও দেখেনি মিনতি। শুধু মিনতি কেন, হয়তো পৃথিবীর কোনও মানুষই দেখেনি।

মিনতি জিজ্ঞেস করতো, তার কোনও ফটো আছে তোমার কাছে ?

—আমার বয়ে গেছে তোমার মেসোর ছবি রাখতে। সে কি একটা মানুষ ? মানুষ নয় বউদি, মানুষ নয়।

মিনতি জিজ্ঞেস করতো, কেন ?

—মানুষ হলে কি আমাকে ছেড়ে এতদিন দূরে থাকে ? আমার ছেলেও নেই, মেয়েও নেই, কিছুই নেই। আমার পেট কী করে চলবে তাও তো মানুষটা একবার ভাবলে না ? সে কি মানুষ না জানোয়ার ?

—তুমি মেসোকে জানোয়ার বলছো ?

—তা বলবো না ? মানুষ হলে কেউ কি নিজের বিয়ে করা বউকে এমন অনাথ করে পালিয়ে যায় ?

মিনতি জিজ্ঞেস করতো, তুমি পুলিশে খবর দাওনি ?

—খবর দিইনি আবার। যখন দেখলুম মানুষটা ছ'মাস হলো আসছে না, তখন একজন আমাকে পুলিশে খবর দিতে বললে। তা তাই-ই করলুম। পুলিশের থানায় গিয়ে খবর দিলুম। নাম-ধাম-কুলুজী সব দিলুম। কিন্তু কোথায় কী ? এত বচ্ছর কেটে গেল, এখনও কোনও খবর দিতে পারলে না তারা !

—তারপর ?

—তারপর থেকে আমি এই রাস্তা ধরলুম। এই বাড়ি বাড়ি বউ-ঝি'দের আল্‌তা-সিঁদূর পরানো শুরু করলুম।

— তারপর ? কিছু ফল পেলে ?

—পাগল হয়েছ বউদি ! সে মানুষটা কি অতো সোজা ? আমাকে না জ্বালিয়ে কি সে ছাড়বে ? সে আমার হাড়-মাস ভাজা-ভাজা করে তবে আমাকে রেহাই দেবে !

মিনতি জিজ্ঞেস করলে, তোমাকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কারণটা কী মাসি ? কী দোষ করেছিলে তুমি ?

— আমি আর কী দোষ করবো বউদি, আমি চিরকাল মানুষটাকে সেবা করে এসেছি। মদ খেয়ে বাড়িতে এসে কতো গালাগালি দিত আমাকে, তবু আমি কিচ্ছু বলিনি—জানো। শেষকালে আমি আর থাকতে পারলুম না। একদিন তাকে লাঠিপেটা করলুম।

— তারপর ?

— তারপর আর কী, তারপর মিনসেটা বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। সেই থেকে আজও ফিরে আসে নি সে।

—তারপর ?

আল্‌তা-মাসি বললে, তারপর থেকেই আমি এই কাজ করছি বউমা, বাড়ি-বাড়ি গিয়ে এই এয়োস্তিরী বউ-ঝি আর মায়েদের আলতা আর সিঁদূর পরিয়ে দিন কাটাচ্ছি। দেখি তোমার মেসো এবার না এসে পারে কী করে ?

—তাতে কি দুঃখু ঘুচবে ? মেসো এলে তো তোমার দুঃখ বাড়বে !

—দুঃখু না ঘুচুক, কিন্তু সোয়ামী বলে কথা ! সে যদি ঘরে না থাকে

তো এয়োস্তিরী মানুষের মনে কি সুখ থাকে। বলো বউমা?

মিনতি আর কী বলবে!

—এই যে তুমি, তোমার কথাই ধরো না। তোমার সোয়ামী বাড়িতে আছে, তাই তোমার মনেও সুখ আছে। কিন্তু যদি সোয়ামী বাড়িতে না থাকতো, তাহলে? তাহলে কী হতো ভাবো তো একবার?

মিনতি এ-কথার কোনও জবাব দিলে না। তারপর বললে, আমার মেসো এতদিন পর্যন্ত একটা কোনও খবরও দেয়নি?

—সে আক্কেল কি আছে মিন্‌সের? মিন্‌সের সে-আক্কেলই যদি থাকতো, তাহলে কি আজ আমার এত হেনস্থা?

ততক্ষণে আলতা পরানো শেষ হয়ে গেছে, সিঁথিতে সিঁদুরও লাগানো হয়ে গেছে। আলতার ঝাঁপিটা নিয়ে উঠতে যাচ্ছিল।

মিনতি বললে, চা খেয়ে যাও আলতা-মাসি।

আলতা-মাসি বললে, না বউমা, আজ আর বসবার সময় নেই, এ-পাড়ার ভট্টাচায্যি বাড়ির বউ আবার মরো-মরো। দুপুরে শুনে এসেছি তার এখন-যায় তখন-যায় অবস্থা, ভাগ্যবতী বউ এয়োস্তিরী হয়ে সোয়ামীর পায়ে মাথা রেখে যেতে পারছে, আগের জন্মে নিশ্চয়ই অনেক পুণ্যি করেছিল। শ্মশানে যাবার আগে তাকে আবার পায়ে আলতা পরিয়ে সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিতে বলে রেখেছিল।

মিনতি কথাটা বুঝতে না পেরে বলল, বলে রেখেছিল মানে?

আলতা-মাসি বললে, বহুদিন থেকেই তো ভট্টাচায্যি-বউ অসুখে ভুগছিল। তখন থেকেই আমাকে বলে রেখেছিল, যেন আমি মরার আগে তাকে আলতা-সিঁদুর পরিয়ে দিই।

অন্য দিনের মতো গোষ্ঠ এসে তাকে একটা টাকা দিলে। টাকাটা নিয়ে আলতা-মাসি কপালে ছুঁইয়ে তার ঝাঁপির মধ্যে রেখে দিলে।

মিনতি এ-বাড়িতে আসার পর থেকেই এখানকার সব কিছু দেখে আশ্চর্য হয়ে যেত, এ কী-রকম সংসার! যার সংসার তার সংসার নয় এটা। যেন গোষ্ঠদার সংসার। আর সংসারের মালিক যে-লোকটা সে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কতোক্ষণই বা ঘরে থাকে! দৌলতপুরেও সে

মানুষটাকে অনেক ঘনিষ্ঠ হয়েই সে দেখেছিল। সেখানকার সংসারে থেকেও সে মানুষটা ঠিক সংসারী ছিল না। কিন্তু তখন তো তার শ্বশুর-শাশুড়ী ছিলেন। আরো অনেকেই সংসারে ছিল। কিন্তু এখানে ?

মিনতির মাঝখানের জীবনটা ছিল একটা দুঃস্বপ্নের মতো। এখন তা ভাবতেও তার যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! সে-সব দিনগুলোর কথা কে-ই বা আর মনে রেখেছে! হঠাৎ মাঝরাতে হৈ-হৈ শব্দ করে একদল লোক বাড়িতে চড়াও হলো একদিন। সঙ্গে সঙ্গে কতো আর্ত-কণ্ঠের চিৎকারে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠলো।

—গেল, গেল। সব গেল। শ্বশুরের ঘর থেকে একটা আওয়াজ এলো ওরে মেরে ফেললে, মেরে ফেললে রে—

সঙ্গে সঙ্গে একদল লোকের প্রচণ্ড উল্লাসের চিৎকারে সকলের সব আর্তনাদ চাপা পড়ে গেল।

হঠাৎ মিনতির ঘরের দরজাতেও কারা ধাক্কা দিতে লাগলো। দরজা খোল, দরজা খোল—

মিনতির সমস্ত শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে। সে তার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজার খিলটা চেপে ধরলো। দূর থেকে আওয়াজ আসতে লাগলো, আল্লা হো আকবর, আল্লা হো আকব—

—দরজা খোল, মিনতি দরজা খোল—

দরজায় যতো ধাক্কা লাগে, মিনতি ততো কঠোর হয়ে ওঠে, প্রাণপণে দরজার খিলটা চেপে ধরে থাকে দাঁতে দাঁত চেপে।

সে এক রাত গেছে বটে, চরম দুঃস্বপ্নের রাত।

হঠাৎ আরো জোরে জোরে ধাক্কা আরম্ভ হলো। কারা ধাক্কা দিচ্ছে! কারা চিৎকার করছে, আল্লা হো আকবর, আল্লা হো আকবর—

তখন হঠাৎ মনে হলো, তার নাম ধরে যেন কে ডাকছে।

মিনতি, মিনতি, দরজা খোল, দরজা খোল—আমি সাহাবুদ্দীন।

মিনতিও চেঁচিয়ে উঠলো, তুমি সাহাবুদ্দীন ?

—হ্যাঁ, আমি সাহাবুদ্দীন, তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। দরজা খোল, নইলে তুমি বাঁচবে না।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিক থেকে কাদের কণ্ঠে উল্লাস ফেটে পড়লো,

আল্লা হো আকবর, আল্লা হো আকবর—

তখন ভয়ে ভয়ে, দরজা খুলে দিতেই সাহাবুদ্দীন তাকে দু' হাত দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছে। সাহাবুদ্দীন যত হাঁফাচ্ছে, মিনতিও ততো হাঁফাচ্ছে, কেউ কাউকে ছাড়ছে না, ছাড়বে না।

—কী হয়েছে সাহাবুদ্দীন ?

সাহাবুদ্দীন বললে, আমি শব্দ শুনেই দৌড়ে এসেছি, খুব সাবধান। আমি আছি, কোনও ভয় নেই। দাঙ্গা লেগে গেছে, আমি না থাকলে তোমাকেও ওরা খুন করতো !

—কিসের দাঙ্গা ? কারা খুন করতো আমাকে ? কী বলছো তুমি ?

—হিন্দুদের সব ঘরবাড়ি মুসলমানরা পুড়িয়ে দিয়েছে। তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী, তোমার বাবা-মা'কেও মেরে ফেলেছে ওরা। আমি তোমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি, চলো আমার সঙ্গে।

সে-সব দিন সে-সব ঘটনা এখনও মিনতির চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। একলা থাকলেই সেই সব প্রেত-প্রেতিনী মিনতির পেছনে তাড়া করে। সেই অতো রাতে সাহাবুদ্দীনের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় না পেলে তার কী দশা হতো ! সেদিন সমস্ত রাত সাহাবুদ্দীনও ঘুমোয়নি, মিনতিও ঘুমোয়নি। শুধু সেদিনই নয়, তার পরেও কতো দিন ঘুমোয়নি মিনতিরা। তারপর থেকে যতো দিন কাটে ততোই ভয়, কী হবে তার ? কোথায় যাবে সে ? কোথায় আশ্রয় পাবে সে ! পৃথিবীতে তো তার কেউ নেই। স্বামী থেকেও নেই, বাবা-মা-শ্বশুর-শাশুড়ী, তারা সবাই তো দাঙ্গার পর নিঃশেষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। যা কিছু ছিল, সব তার নিঃশেষে মুছে গেছে। বাপের বাড়ি শ্বশুর বাড়ি সমস্ত বেদখল। তার স্বামীর আশ্রয় নেই, তার শ্বশুর-শাশুড়ী-বাবা-মা'র আশ্রয়ও নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

সেই দৌলতপুরে সাহাবুদ্দীনের বাড়িতেই খবর এলো যে কলকাতা, দিল্লী, পাঞ্জাব, লাহোরেও হিন্দু-মুসলমান-শিখদের মধ্যেও দাঙ্গা বেধে হাজার হাজার লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। ট্রেনে উঠলে ট্রেন থামিয়ে হিন্দুরা মুসলমানদের, মুসলমানরাও হিন্দুদের খুন করছে।

মিনতি সাহাবুদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করলে, এখন আমার কী হবে

—তোমার কিছ্ছু ভয় নেই। আমি নিজের জান দিয়ে তোমাকে বাঁচাবো। তুমি ভয় পেও না।

—কিন্তু আমি যে তোমাদের বাড়িতেই আছি, একথা যদি মুসলমানেরা জানতে পারে?

সাহাবুদ্দীন বললে, কেউ কিছু জানবে না। আর তুমি তো সিঁথির সিঁদুর মুছেও ফেলেছ। কী করে লোকে জানবে যে তুমি হিন্দু? আর আমার বাবা-মা তারাও তো কেউ এখানে নেই, কেউ যদি জানতে পারেই তো আমি বলবো তুমি আমার বিবি, তুমি আমার বউ!

—আমি তোমার বউ?

—হ্যাঁ, প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ও-কথা বলতে দোষ কী? এখানে কেউ তো আর জানতে পারছে না যে, তুমি দেবব্রত সরকারের বিয়ে-করা বউ।

—তোমার বাবা-মা দৌলতপুরে একদিন-না-একদিন আসবেনই, তখন? তখন কী বলবে তুমি তাঁদের?

সাহাবুদ্দীন বললে, আমি তাদেরও বলবো যে আমি তোমাকে সাদি করে এনেছি। তাদেরও বলবো যে তুমি আমার বউ। কে তোমার শাড়ি ব্লাউজ দেখে বুঝতে পারবে যে তুমি হিন্দুর মেয়ে? শুধু কপালে সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর আর পায়ে আলতা না পরলেই হলো! ওইটেই যা হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমান মেয়েদের তফাৎ, আর তো কিছু নয়! সুতরাং তুমি নির্ভয়ে থাকো।

সেই রকম করেই মিনতি প্রাণ বাঁচাবার জন্যে, মুসলমান হয়েই রইলো সেই বাড়িতে, কেউ কোনও কিছু সন্দেহ করতে পারলে না।

কিছুদিন পরে সাহাবুদ্দীনের মা এলো দৌলতপুরে। তখন পুরোদমে পূর্ব-পাকিস্তান হয়ে গেছে দৌলতপুর, ঢাকা, মাণিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

মা বললে, এ কে রে সাহাবুদ্দীন?

—একে আমি বিয়ে করেছি মা, এ আমার বউ মিনতি।

—ওমা, তাই নাকি? কবে বিয়ে করলি? এদের বাড়ি কোথায়?

সাহাবুদ্দীন বললে, এর বাবা-মা-ভাই-বোন সবাইকে হিন্দুরা দাঙ্গার সময় খুন করে ফেলেছিল। এর অবস্থা দেখে একে এখানকার মসজিদে নিয়ে গিয়ে কলমা পড়িয়ে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এসেছি,

তোমাদের কাউকে খবর দিতে পারিনি, সময় ছিল না বলে।

মা বললে, বাঃ, খুব সুন্দর দেখতে বউকে তোর।

সেই থেকে মিনতি রয়ে গেল সাহাবুদ্দীনের বাড়িতে। আর কোনও ভয় রইল না। দৌলতপুরের যতো হিন্দু সবাই সেই দাঙ্গার সময়ে দৌলতপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে গিয়েছিল। সুতরাং তার আসল পরিচয় তখন আর কেউই জানতে পারলে না। শুধু জানলো যে সাহাবুদ্দীনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে যার সঙ্গে, তার বাপ-ভাই-বোন সকলকে দাঙ্গার সময় হিন্দুরা খুন করে ফেলেছে।

সাহাবুদ্দীনকে একদিন মিনতি জিজ্ঞেস করলে, যদি কোন দিন ধরা পড়ি তখন কী হবে? তোমার সঙ্গে তো সত্যি-সত্যি বিয়ে হয়নি!

—চেপে যাও না, এ-রকম না করলে তো তুমি প্রাণে মারা পড়তে!

কথাটা মিথ্যে নয়। কোথায় রইলো তার বাবা-মা-শ্বশুর-শাশুড়ী, আর কোথায় রইলো সেই মাস্টারমশাই মানুষটা। আসলে যার সঙ্গে তার সত্যিকারের বিয়ে হলো, তার সান্নিধ্য পাওয়া দূরের কথা, তার সঙ্গে এক বিছানায় শোওয়ার অধিকারও সে পেলে না। আর যে-লোকটার সঙ্গে তার বিয়ে হলো না, তার সান্নিধ্যই শুধু নয়, তার সঙ্গে একই ঘরের ভেতরে এক বিছানায় শোওয়ার অধিকার পেয়ে বিয়ের অভিনয় করতে হলো।

পৃথিবীর আর কোনও মেয়ের কপালে বিধাতা এমন পরিহাস করেছে কিনা তার পরিচয় বোধহয় কোথাও এমন করে লেখা নেই।

কিন্তু অভিনয় করতে করতেও অনেক সময় অভিনয়টা যদি সত্যি হয়ে যায়, তখন মানুষ কী করবে?

পৃথিবীর মানচিত্রের রং বদলের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের মানচিত্রের রংও কি বদলায়? হয়তো বদলায়। নইলে ঝর্ণাই বা জন্মালো কেন? আর তার মুখের চেহারার সঙ্গে সাহাবুদ্দীনের মুখের চেহারার অমন মিল হলোই বা কেন!

ঝর্ণাকে দেখে সাহাবুদ্দীনের আত্মীয়-পরিজনরা সবাই বলতে লাগলো, ঝর্ণাকে দেখতে ঠিক ওর বাবার মতো হয়েছে!

আর ঝর্ণার জন্মের পর থেকেই সাহাবুদ্দীনের জীবনের চাকা ঘুরে

গল। যে ছিল একদিন দেবব্রত সরকারের অতি প্রিয় ছাত্র সে আজ পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক আকাশের ধ্রুবতারা। সাহাবুদ্দীন না হলে কোথাও কোনও কাজই হয় না। সে পশ্চিম-পাকিস্তানের করাচি বা ইসলামাবাদই হোক, আর পূর্ব-পাকিস্তানের ঢাকাই হোক। স্ত্রী হিসেবে মিনতিকেও সঙ্গে থাকতে হয়। আর শুধু তাই-ই নয়, পাকিস্তানের বাইরে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকাও যেতে হয় বিশেষ কাজে, দেবব্রতর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকলে তার কী আর হতো? রান্নাঘরের চৌহদ্দির মধ্যে আটকে পড়ে থাকতে হতো।

কিন্তু মিনতির ভাগ্য-দেবতা বোধহয় নেপথ্যে হাসছিলেন। তিনি বড়ো নিষ্ঠুর। তাঁর বিধান বড়ো কঠোর। সেখানে কারো হাত নেই।

তাই হঠাৎ একদিন সেই ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটলো।

তারপর সেই যে সে ভেঙে পড়লো তারপর থেকে আজ পর্যন্ত সে আর সুস্থ হয়ে ওঠেনি। কোনও রকমে জীবনটা বয়ে নিয়ে সে চলেছে, কখনও কারো কাছ থেকে কোনও স্নেহ, কোনও প্রীতি, কোনও আদর ভালোবাসা সে পায়নি। এখানে এই কলকাতায় এসে তার স্বামী দেবব্রত সরকারের কাছ থেকেও কোনও ক্ষমা আজ পর্যন্ত সে পায়নি।

শুধু ঝর্ণাই এখন তার একমাত্র ভরসা-স্থল। যে কষ্ট সে নিজে পেয়েছে ঝর্ণাকে যেন সে কষ্ট কোনওদিন সইতে না হয়, এই আশা নিয়েই সে এখন বেঁচে আছে। এই আশা নিয়েই সে বেঁচে থাকবে। যখন বেঁচে থেকে দেখবে যে তার ঝর্ণা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তখনই সে তার ভাগ্য-বিধাতার কাছ থেকে মুক্তি চেয়ে নিয়ে এই পৃথিবী থেকে চির-বিদায় নেবে! তার আগে নয়।

সেদিন মাঝ-রাত্রে দেবব্রতর শোবার ঘরের দরজায় টোকা পড়লো।

দেবব্রত এমনিতেই সারাদিন উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। আর রাত্রে মাত্র তিন-চার ঘণ্টা ঘুমিয়ে ভোর তিনটে সাড়ে তিনটের সময় ওঠে। তখন তার জপ-তপ-ধ্যান যা কিছু সব চলে। বিশ্বের সমস্ত সমস্যা তাকে পীড়িত করে। বিশেষ করে ভাগ হয়ে যাওয়া ইণ্ডিয়ার সমস্যা। এখানকার মানুষ কেন এত স্বার্থপর, কেন এত পরশ্রীকাতর, কেন এত

বিলাসিতা-প্রিয় তা নিয়ে তার মাথা-ব্যথার শেষ নেই। সেই সব ভাবনা নিয়েই সে ঘুমোতে যায়, আর সেই সব ভাবনা নিয়েই সে ঘুম থেকে ওঠে। চারদিকের এত লোভ, এত অর্থ-লোলুপতা, এত অকারণ বিলাসিতা দেখে সে বড় কষ্ট পায়। তাহলে ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়ে দেশ স্বাধীন করে লাভ কী হলো? কাদের জন্যে এই স্বাধীনতা? ক্ষুদিরাম, গোপীনাথ, যতীন দাস, ভগৎ সিং, সুকদেব, চন্দ্রশেখর আজাদ, বিসমিল কি এই স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিয়েছিল?

প্রথম বারে ঘুম ভাঙেনি। আবার টোকা পড়তেই দেবব্রত ভাবলে হয়তো গোষ্ঠ এসেছে কোনও জরুরী কাজে।

কিন্তু গোষ্ঠ তো এমন অবিবেচক নয়। সে তো জানে তার দাদাবাবু সারাদিন গাধার মতো খাটুনি খেটে এই সময়ে একটু বিশ্রাম নেয়। সারাদিনের মধ্যে মাত্র এইটুকু।

জিজ্ঞেস করলে, কে?

মেয়েলী গলার আওয়াজ পেয়ে দেবব্রত একটু অবাক হলো।

আবার জিজ্ঞেস করলে, কে?

ওধার থেকে মেয়েলী গলার জবাব এলো, আমি—

এবার আর কোনও সন্দেহ নেই। দেবব্রত দরজা খুলে দেখলে, যা ভেবেছে সে ঠিক তাই।

—তুমি?

মিনতি বললে, হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আমার ছুটো কথা আছে।

—এই অসময়ে?

মিনতি বললে, কিন্তু এই সময় ছাড়া আর কোন সময়ে আসবো বলো? আর কোনও সময়ে তো তোমাকে একলা পাওয়া যায় না। তুমি তো সব সময়েই ব্যস্ত থাকো।

—চারদিকে এত কাজ যে কথা বলবার সময় পর্যন্ত পাই নে—যা হোক, এখন বলো তোমার কী কথা?

মিনতি বললে, এখানে এই রকম করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েহ কথা হবে?

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে ভালো না লাগে তো ছাদে বসে কথা বলতে পারি—

মিনতি বললে, যদি তোমার ঘরে বসি ?

—আমার ঘরে ?

মিনতি বললে, ঘরে বসতে তোমার আপত্তি আছে ?

—কিন্তু আমার ঘরটা তো শোবার ঘর !

—এখনও তোমার শোবার ঘরে ঢোকবার অধিকার আমার নেই ?

দেবব্রত বললে, তোমাকে তো আমি বিয়ের আগেই সে-কথা বলেছি। এখন আবার নতুন করে সে-কথা তুলছো কেন ?

—কিন্তু তুমি তো অগ্নি-সাক্ষী করে আমাকে বিয়ে করেছ। আমি যে তোমার স্ত্রী এ-কথা তো তুমি অস্বীকার করতে পারো না।

—আবার সেই পুরোন কথা তুমি আরম্ভ করলে—

—সে তো জানি। সে-সব কথা আমার মনে আছে। কিন্তু এখন তো তোমার মাতৃভূমি স্বাধীন হয়ে গেছে।

—এই কথা বলতেই কি এত রাত্তিরে তুমি আমার ঘুম ভাঙালে ?

—না না, আরো অন্য অনেক কথাও আছে। আমাদের দেশ যে স্বাধীন হয়েছে তা তো অস্বীকার করতে পারো না।

—এ-কথার জবাব আমি দেব না, তুমি অন্য কথা বলো।

মিনতি বললে, ভেবেছিলাম, পাকিস্তান থেকে তোমার কাছে এলে তুমি হয়তো আমাকে একটু ভালোবাসবে—

—আমি তোমাকে ভালোবাসছি না ? গোষ্ঠকে তাহলে কেন বলবো, যাতে তোমাদের থাকা-খাওয়া-পরার কোনও কষ্ট না হয়।

মিনতি বললে, সে-সব কষ্ট কিছু হচ্ছে না আমাদের।

—কোনও কষ্ট যদি হয় তো গোষ্ঠকে সব কথা প্রাণ খুলে বলবে। আমাকে বলাও যা তাকে বলাও তাই। গোষ্ঠ আমার খুব বিশ্বাসী লোক। আমি মানে ইস্কুল থেকে যা মাইনে পাই, সমস্ত টাকাটা প্রত্যেক মাসে তার হাতে তুলে দিই—তা তো তুমি জানো।

—জানি। কিন্তু শুধু কি খাওয়া-পরা-থাকা পেলেই মানুষ খুশী হয় ? আর কিছু দরকার হয় না ?

—বলো, আর কী দরকার তোমার ?

মিনতি কোনও উত্তর দিলে না এ-কথার।

— বলো আর কী দরকার তোমার? ঝর্ণার জামা, ফ্রক, জুতো?

মিনতি বললে, না—

—তাহলে তোমার শাড়ী? ব্লাউজ বা জুতো?

মিনতি আবার বললে, না—

—তোমাদের যা-কিছু দরকার সমস্তই গোষ্ঠকে বললে সে যোগাবে। আমি ওকে বলে রেখেছি।

মিনতি এবারও বললে, না, গোষ্ঠদা কোনও অভাবই রাখেনি আমাদের।

—তাহলে?

মিনতি চুপ করে রইলো।

—ঝর্ণা ইস্কুলে কী রকম পড়াশোনা করছে?

মিনতি বললে, ভালো।

—পরীক্ষা কী রকম দিলে?

মিনতি বললে, ভালোই।

—ওকে ভালো করে পড়িও। ও যেন দেশের নারীজাতের একজন রত্ন হয়ে উঠতে পারে। লোকে যেন বলতে পারে যে ওর নারী-জন্ম সার্থক।

মিনতি বললে, আমি কিন্তু সেকথা বলতে আসিনি। আমি বলছিলুম আমার জীবন কি এই রকম ব্যর্থতার মধ্যেই কাটবে?

—তাহলে বলো, তুমি কী বলতে চাও?

মিনতি বললে, আমি তো তোমার বিবাহিতা স্ত্রী?

—তা তো বটেই। আমি কি তা অস্বীকার করেছি কখনও? এখানকার সবাই-ই তো জানে যে তুমি আমার স্ত্রী! সেদিন তো তুমি নিজের চোখেই দেখলে আমাদের স্কুলের মাস্টারমশাইরা সবাই এসে আমাদের তিন জনের গ্রুপ ফটো তুললো। আমার স্ত্রীকে যে-সম্মান শ্রদ্ধা জানানো উচিত তা তারা জানালো।

—সে তো জানালো, কিন্তু সেটা তো আমাদের বাইরের পরিচয় কিন্তু ভেতরে?

— ভেতরে আমরা তাই নই কে বললে?

—সকলের চোখের আড়ালে কি আমরা সত্যিই স্বামী-স্ত্রী ?

—তুমি বড়ো কঠিন প্রশ্ন তুললে আজকে।

—সেই কঠিন প্রশ্ন তোলবার জন্যেই আজ আমি এই অসময়ে তোমার কাছে এসেছি !

—তুমি ভালোই করেছ প্রশ্নটা তুলে। কারণ এখানকার কেউ তো জানে না যে তুমি শুধু আমার একলার স্ত্রী নও, আর একজনেরও স্ত্রী।

—কার কথা বলছো ? সাহাবুদ্দীনের ?

—হ্যাঁ, সাহাবুদ্দীনের সঙ্গেও তো তোমার বিয়ে হয়েছিল ? বলো কথাটা সত্যি কিনা ?

মিনতি বললে, না, সত্যি নয় !

দেবব্রত অবাক হয়ে গেল মিনতির কথা শুনে। বললে, সত্যি নয় ? তুমি বলছো কী ?

মিনতি বললে, না সত্যি নয়। তাহলে শোন কী হয়েছিল আসলে।

বলে, সেদিন দেশ ভাগের সময়ে কী বিপর্যয় ঘটে গিয়েছিল দৌলতপুরে। দাঙ্গার মধ্যে কে হিন্দু কে মুসলমান, এইসব নিয়ে যখন অমানুষিক অত্যাচার-অনাচার চলছে, তখন সাহাবুদ্দীন তাকে কেমন করে প্রাণে বাঁচিয়েছিল, কেমন করে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল, কেমন করে কী অবস্থার মধ্যে তার মা'র কাছে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে মিনতিকে স্ত্রী বলে চালিয়েছিল—তার বিশদ বিবরণ দিল।

দেবব্রত সব কথাগুলো মন দিয়ে শুনলে। তারপর বললে, সাহাবুদ্দীন তো শেষকালে পাকিস্তানের ফরেন মিনিস্টার হয়েছিল, আর তুমিও তো তার স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়িয়েছিলে তো ?

—হ্যাঁ, স্বীকার করছি তা আমি করেছিলুম !

—আর সাহাবুদ্দীন যদি দুর্ঘটনায় মারা না যেতো তাহলে তো তুমি সারাজীবন তার সঙ্গেই কাটাতে ?

মিনতি এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না।

—বলো, জবাব দাও ? সাহাবুদ্দীন মারা না গেলে তো আমার কাছে আসতে না।

—না, আমি স্বীকার করছি তোমার কাছে আসতুম না।

—তাহলে কীসের জন্যে এলে?

—আমার মেয়ে ঝর্ণার পিতৃ-পরিচয়ের জন্যেই আসতে হলো।

—কেন?

মিনতি বললে, তাহলে ঝর্ণা যে আমার অবৈধ সন্তান হয়ে যেত। সাহাবুদ্দীনের সঙ্গে তো আমার মুসলমান মতেও বিয়ে হয়নি। আমাকে প্রাণে বাঁচাবার জন্যেই সে তার সমাজের কাছে আমাকে তার স্ত্রী বলে চালিয়েছিল। নইলে আমি হিন্দুর মেয়ে হয়ে তার রক্ষিতা বলেই যে গণ্য হতাম। তা সে চায়নি। আমার ভালোর জন্যেই সে আমাকে তার বিবাহিতা মুসলমান স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছিল সকলের কাছে।

দেবব্রত কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। বললে, আমি তো তোমার ঝর্ণাকে আমার নিজের মেয়ে বলেই এখানকার সকলকে জানিয়েছি। এর বেশি তুমি আর কী চাও?

মিনতি বললে, আমি এখন চাই তোমার সত্যিকারের স্ত্রী হতে!

—তুমি তো আমার স্ত্রীই। আমি তো মুক্তকণ্ঠে এখানের সবাইকে তাই-ই বলেছি।

মিনতি বললে, অন্য সবাই যাই জানুক, আমি তো সত্যিই তাই নই। নিজের কাছে তো আমি অপরাধী হয়ে রয়েছি। সত্যি কিনা বলো তুমি? আমি কি সত্যিই তোমার সহধর্মিনী?

—ভেতরের কথা যা-ই হোক না কেন, বাইরে তো সবাই জানে যে তুমি আমার সহধর্মিনী!

মিনতি বললে, কিন্তু বাইরে আমি তোমার সহধর্মিনী, আর ভেতরে-ভেতরে আমি তোমার আশ্রিতা, এটা তো ভালো কথা নয়। বাইরে-ভেতরে কি এক হওয়া যায় না?

দেবব্রত বললে, না—

—সত্যিই না?

—কেন সত্যিই নয় তা তো আমি আমাদের বিয়ের আগে তোমাকে সব খুলে বলেছিলুম। আমার শর্তও আমি তোমাকে সমস্ত বিশদ করে বলে দিয়েছিলুম। তা সত্ত্বেও তখন তো এ বিয়েতে তুমি রাজি হয়েছিলে

তাহলে এখন কেন তুমি আবার আমার সহধর্মিনী হতে চাইছো ?

—আমি যে আর এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না গো—

—কিন্তু তুমি সহ্য করতে না পারলে আমি কী করতে পারি ?

মিনতি বললে, কিন্তু এখন তো দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। এখন তো আর শর্ত মানবার দায় নেই !

—কী বলছো তুমি ? দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে ?

মিনতি বললে, দেশ স্বাধীন হয়নি ? ইংরেজরা চলে যায়নি ?

—না দেশ স্বাধীন হয়নি। ইংরেজরা চলে গিয়েছে মানি। কিন্তু এই স্বাধীনতার জন্যে তো আমরা লড়াই করিনি।

মিনতি বলে উঠলো, ও-সব বড়ো বড়ো কথা আমি ভাবিনি কখনও। আমি সামান্য একজন মেয়েমানুষ। আমি আমার নিজের সুখ-সুবিধের কথাই কেবল ভাবি।

—আমিও তো সামান্য লোক। আমি তো শুধু নিজের সুখ সুবিধে নিয়েই ভাবি। কিন্তু তবু কেন আমি ভগবানের কান্না শুনতে পাই ?

—ভগবানের কান্না ?

দেবব্রত বললে, হ্যাঁ মিনতি, বিশ্বাস করো, সে কান্না আমি কেন শুনতে পাই ? জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, আবুল কালাম আজাদ যা শুনতে পায় না !

বলতে বলতে দেবব্রত কেমন একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। তার মুখের কথাগুলোও যেন কেমন ভারি হয়ে উঠেছিল। অন্ধকারের মধ্যে মিনতি সেই চিরকালের চেনা মুখটার দিকে চেয়ে চমকে উঠলো।

বললে, এ কী, তুমি কাঁদছো ?

দেবব্রত তাড়াতাড়ি তার ধুতির খুঁট দিয়ে চোখ মুখ মুছে নিয়ে বলতে লাগলো, কেন যে আমি কাঁদি তা কেউ বুঝতে পারে না, জানো মিনতি, কেউ তা বুঝতে পারে না, সেইটাই তো আমার দুঃখ।

তারপর একটু থেমে বলতে লাগলো, আমি কী করি তা বলতে পারো মিনতি ? দিন-দিন মানুষ সবাই স্বার্থপর হয়ে উঠছে। আগে আমাদের শত্রু ছিল একটা। সে হলো ইংরেজ। ইংরেজরা চলে যেতেই সবাই সকলের শত্রু হয়ে উঠলো। সকলের একটাই লক্ষ্য—লক্ষ্যটা

হলো কী করে একজন আর একজনকে হারিয়ে দিয়ে, একজনকে ঠকিয়ে আরো বেশি টাকা উপায় করবে! ব্যবসাদাররাও হয়েছে তেমনি। তাদের লক্ষ্য কী করে তাদের মালে আরো বেশি ভেজাল দিয়ে আরো বেশি লাভ করবে। জিনিসপত্তরের দাম শুনে আমি আরো হতাশ হয়ে গিয়েছি। ইংরেজ আমলে আমরা তো এর চেয়ে আরো বেশি ভালো ছিলুম। বিদেশী আমলে ১৯৩৮ সালে সোনার ভরি ছিল ৩৮ টাকা। আর এখন? এখন সেই এক ভরি সোনার দাম হয়েছে এক হাজার টাকা। দিন-দিন তো সোনার দাম বেড়েই চলেছে, এর পরে আরো বাড়বে। তখন? · আরো একটা কথা শুনবে মিনতি? এই আমাদের ইস্কুলের ছেলেরা দুপুরবেলায় টিফিনের সময় মদের দোকানে গিয়ে মদ খেয়ে টিফিন করে? এটা তুমি কল্পনা করতে পারবে? বলে দেবব্রত আবার কাঁদতে লাগলো। তারপর কান্না থামিয়ে বললে, আজকে আমি সেইজন্যে তিনজন ছাত্রকে ইস্কুল থেকে বার করে দিয়েছি।

মিনতি এ-কথার কোনও জবাব দিলে না।

দেবব্রত আবার বলতে লাগলো, আজকে সেই তিনজন ছাত্রের গার্জেনরা এসেছিল। আমি সেই তিনজন গার্জেনদের বললাম, ওদের আমি কিছুতেই ইস্কুলে রাখবো না। তা তাঁরা কি বললেন জানো? তাঁরা আমাকে শাসিয়ে গেলেন. বললেন, ইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটিকে বলে তাঁরা আমার চাকরি খাবেন। জানি না আমার শেষ পর্যন্ত · । কালকেই ইস্কুল কমিটির মিটিং হওয়ার কথা। দেখ মিনতি, আমার হাতে প্রমাণ আছে যে, ছেলেরা সত্যি-সত্যিই মদ খেয়েছিল টিফিনের সময়ে। মদের দোকানের মালিকের কাছে আমি নিজে গিয়েছিলুম। তিনি আমাকে নিজে বলেছেন যে, আমাদের স্কুলের ছেলেরা দুপুরে টিফিনের সময়ে নাকি রোজই সেখানে গিয়ে মদ খায়। এখন বলো, আমি কী করবো? মিনতির মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না।

দেবব্রত বললে, এখন তুমিই বলো, এর পরেও ভগবান কাঁদবে না? অথচ সে-কান্না দেশের নেতারা কেউ-ই তো শুনতে পায় না।

মিনতি বললে, মিছিমিছি আমি তোমার ঘুম ভাঙিয়ে, তোমাকে বিরক্ত করে গেলুম। এবার আমি চলি। বলে আর সেখানে দাঁড়ালো

না। সকলের অগোচরে সে সেই সিঁড়ি দিয়ে নিচে চলে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম, তারপর ?

সুপ্রভাত বললে, তার পরের দিনই স্কুল-কমিটির জরুরী মিটিং ডাকা হলো। খুবই জরুরী মিটিং। দেশের গণমান্য মানুষ সেই কমিটির মেম্বার। আর যে তিনজন ছাত্রকে দেবব্রত সরকার স্কুল থেকে রাস্টিকেট করে দিয়েছিলেন, সেই ছাত্রদের গার্জিয়ানরাও পাড়ার প্রতাপশালী মানুষ। একজন কোটিপতি বিজ্‌নেসম্যান। ব্যবসা থেকে তাঁর বছরে কোটি-কোটি টাকা আয় হয়। আর একজন দেশের শিক্ষামন্ত্রীর আপন ভাই। আর তৃতীয় জন হলেন ইণ্ডিয়া গভর্মেন্টের হোম-সেক্রেটারির জ্যাঠামশাই-এর নাতি। তিনজনই সকলের শ্রদ্ধাভাজন মানুষ।

কমিটির মিটিং বসলো বিকেল চারটের সময়। কমিটির সমস্ত মেম্বাররাই হাজির ছিলেন। হেডমাস্টার দেবব্রত সরকার তো হাজির আর হাজির ছিলেন তিনজন ছাত্র আর তিনজন অভিযুক্ত ছাত্রের গণ্যমান্য গার্জিয়ান। সভাপতি দেবব্রত সরকারকে ঘর থেকে বাইরে চলে যেতে বললেন। দেবব্রত তার নিজের ঘরে চলে গেলেন।

স্কুলের নাম "নববিধান চরিত্র গঠন হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল।" এককালে ইংরেজ আমলের এক দেশ-ভক্ত মানুষ এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই স্কুলেরই হেডমাস্টার ছিলেন স্বর্গীয় গোলকেন্দু সরকার। তাঁর স্বর্গবাসের পরে স্কুল-কমিটির নির্দেশেই দেবব্রত সরকারকে হেডমাস্টারের পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

দেবব্রতর আমলেই এই স্কুল থেকে প্রত্যেক বছর পরীক্ষায় প্রথম দশটি স্থানের মধ্যে একজন-না-একজন একটা-না-একটা স্থান দখল করতো। কোনও কোনও বছরে এই স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে কেউ-না-কেউ মোটা টাকার স্কলারশিপ পেতো। এর ফলে এই স্কুলের সুনাম বৃদ্ধি হয়েছিল। ইংরেজ আমলের এই স্কুল থেকে উত্তীর্ণ সর্বভারতীয় পরীক্ষায় পাশ করে অনেক ছাত্র পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

কিন্তু প্রথমে যে-কমিটি ছিল সে-কমিটি কয়েক বছর অন্তর অন্তর বদলে গিয়ে আবার নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে,

মানুষ বদলে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে কমিটির মেম্বাররাও বদলে গেছে।

যিনি স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি চেয়েছিলেন যে, ছেলেদের প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে যেন তাদের চরিত্র-গঠনের শিক্ষাও দেওয়া হয়।

দেবব্রত যখন হেডমাস্টার হলেন, তখন তিনি সে-দিকটার ওপরে নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করলেন। আর সেখানেই বাধলো বিরোধ। প্রথমতঃ সহকর্মী শিক্ষকদের সঙ্গে বিরোধ বাধলো, আর তার পরে স্কুল কমিটির সঙ্গে বিরোধ বাধলো। শিক্ষকদের 'কোচিং-স্কুল' নিয়ে বিরোধ বাধলো, 'টিউটোরিয়াল হোম' খোলা নিয়ে বিরোধ বাধলো।

দেবব্রত নিজের ঘরে বসে এইসব কথাই ভাবছিল। ওদিকে তিন ঘণ্টা ধরে কমিটির মিটিং চললো। শেষকালে সেই মদের দোকানের মালিক ননীলাল সাহাকেও ডাকা হলো। যে-তিনটি ছাত্রকে টিফিনের সময় মদ খাওয়ার অপরাধে রাস্টিকেট করা হয়েছে, সেই তিনটি ছাত্রকে তাঁর সামনে আনা হলো।

জিজ্ঞেস করা হলো—আপনি কি আপনার দোকানে এই তিনটি ছাত্রকে মদ খেতে দেখেছেন?

ননীলালবাবু অনেকক্ষণ দেখেও সনাক্ত করতে পারলেন না। বললেন, আমি আমার ক্যাশ নিয়েই সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকি, খদ্দেরদের দিকে চেয়ে দেখবারও সময় আমার থাকে না।

কমিটির প্রেসিডেন্ট আবার ননীলাল সাহাকে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে আর একবার ভালো করে চেয়ে দেখুন এই তিন জনের দিকে।

ননীলালবাবু আবার চেয়ে দেখলেন।

—চিনতে পারছেন?

ননীলালবাবু বললেন, না!

ব্যাস! এখানেই শেষ হয়ে গেল বিচার। যারা কমিটির মেম্বার নয়, তারাও আশেপাশে দাঁড়িয়ে গুলতানি করছিল। কারণ তাদের কারোর অধিকার নেই ঘরের ভেতরে ঢোকবার। তাই সবাই তাদের হেডমাস্টারকে নিয়েই আলোচনা করছিল।

সুব্রত বলল, জানেন, আমাদের হেডমাস্টারমশাই-এর বউ মিনতি দেবীকে দেখেছেন তো? পাকিস্তানের ফরেন-মিনিস্টার সাহাবুদ্দীন

তাকে নিয়ে নাকি পালিয়ে গিয়েছিল একদিন—

—তাই নাকি? তাই নাকি?

—তারপর সাহাবুদ্দীন সাহেব ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার পরেই আবার সেই বউ হেডমাস্টারমশাই-এর কাছে ফিরে এসেছে।

যারা খবরটা জানতো না তারা পরচর্চার জন্যে একটা নতুন খোরাক পেল। সবাই তখন সুব্রতকে ঘিরে ধরেছে। একদিকে একটা ঘরে কমিটির মিটিং চলছে। সেখানে হেডমাস্টারমশাই-এর নির্দেশের বৈধতা নিয়ে বিচার-সভা বসেছে। তিনজন ছাত্রকে যে তিনি বহিষ্কারের আদেশ দিয়েছেন, তা আইনানুগ হয়েছে না বেআইনী, তাই নিয়ে শিক্ষক আর ছাত্রমহলে রীতিমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। কমিটি-রুমের ভেতরে এবং বাইরে সর্বত্র তারই প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

সেক্রেটারি বললেন, এবার হেডমাস্টারমশাইকে তাহলে ডাকা হোক—। এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি বললেন, ওঁকে ডেকে কী হবে? বহিষ্কারের অর্ডারটা ক্যানসেল করে দিলেই হলো। কারণ ওরা তিনজন যে মদ খেয়েছে, তার তো কোনও প্রমাণ নেই।

সেক্রেটারি বললেন, কিন্তু ওঁকে এখানে ডাকলে ক্ষতি কি? ওঁর হাতে তো কোনও প্রমাণ থাকতে পারে।

এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি বললেন, মদের দোকানের মালিক যখন নিজে বলছেন তিনি ওদের দেখেননি। তাহলেই তো চুকে গেল ল্যাঠা।

সেক্রেটারি বললেন, না, তবু এ-সম্বন্ধে ওঁরও নিজস্ব কিছু বক্তব্য থাকতে পারে, সেটা ওঁকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া ভালো। তার পরে না-হয় ওঁর অর্ডারটা ক্যানসেল্ করা যাবে।

গার্জিয়ানদের তরফে যিনি প্রতিনিধি, রামরতন সান্যাল তাঁর আপত্তি জানিয়ে বললেন, আমি এতক্ষণ চুপ করে ছিলাম। কিন্তু এবার আর চুপ করে থাকতে পারছি না—

সবাই জিজ্ঞেস করলেন, কেন? কেন?

রামরতনবাবু বললেন, এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা যিনি করেছিলেন তিনি শুধু ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যেই এটা করেননি, তিনি চেয়েছিলেন ছেলেদের চরিত্র গঠনও হোক। তা কি হয়েছে? এই দেবব্রত সরকার

কি সেই ধরনের হেডমাস্টার? এঁর নিজের চরিত্রও কি ঠিক। এঁর চরিত্রও কি অনুকরণযোগ্য? তাহলে এঁর বিবাহিতা স্ত্রী কেন এঁকে ত্যাগ করে এঁকে ছেড়ে গিয়ে একজন মুসলমানকে বিয়ে করেছিল? বাড়িতে এঁর যে ঝর্ণা নামে মেয়ে আছে, সে কি এর ঔরসজাত মেয়ে?

কথাগুলো শুনে সবাই হতবাক! সবাই বললে, হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওঁকে এবার ডাকা যাক, দেখি কী বলেন উনি।

তা তাই-ই করা হলো। দেবব্রত সরকারকে ডাকা হলো।

তিনি এবার এলেন! সেক্রেটারি প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা দেবব্রতবাবু আপনি যে তিনটি ছাত্রকে রাস্টিকেট করেছেন, এই স্কুল থেকে বহিষ্কার করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ এরা তিনজনে স্কুলের টিফিনের সময়ে মদের দোকানে গিয়ে মদ খেত। আপনি কি নিজের চোখে তাদের মদ খেতে দেখেছিলেন?

দেবব্রতবাবু বললেন, না—

—তাহলে বিনা প্রমাণে আপনি তাদের বহিষ্কার করেছেন?

দেবব্রতবাবু বললেন, আমি না দেখলেও আমি এমন লোকের কাছ থেকে এ-ঘটনা শুনেছি, যার কথা আমি অবিশ্বাস করতে পারি না।

—কে সে?

—সে আমার বাড়ির কাজের লোক—গোষ্ঠ। তার দেখা মানেই আমার নিজের চোখে দেখা।

—আপনার চাকর? তার কথার ওপর বিশ্বাস করে আপনি তিনটে ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিলেন?

দেবব্রতবাবু বললেন, সে আমার বাড়ির চাকর নয়, আমার ছেলে নেই, তবু সে আমার ছেলের চেয়েও আপন! সে প্রতি সপ্তাহে একদিন করে ওই দুপুরবেলা র‍্যাশন আনতে যায়। সে যতোবার র‍্যাশন আনতে গেছে, ততোবার ওই তিনজনকে মদ খেতে দেখেছে।

—তবু বলব, চাকরের কথায় আপনি তিনজন ছাত্রের জীবন নষ্ট করলেন!

দেবব্রতবাবু বললেন, আমিও প্রথমে গোষ্ঠর কথা বিশ্বাস করিনি। শেষকালে একদিন নিজেই টিফিনের সময়ে বাজারের দিকে গেলুম।

গিয়ে দেখলুম যে গোষ্ঠর কথাই ঠিক। দূর থেকে দেখলুম ওই তিনজন ছাত্র মদের দোকানে ঢুকছে। তারপর মিনিট কুড়ি পরে বেরিয়ে আসতে দেখলুম। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধরে সাবধান করে দিলুম। কিন্তু তাতেও তারা শোধরালো না। শেষকালে অভিভাবকদের স্কুলে ডেকে পাঠালুম। তাঁদের সব কথা বুঝিয়ে বললুম। তাঁদের কথা শুনে বুঝলুম তাঁরা আমার অভিযোগের ওপর কোনও গুরুত্ব দিলেন না। তার ওপর যখন দেখলুম, তাদের দেখাদেখি অন্য দু'একজন ছাত্রও তাদের দলে যোগ দিয়েছে, তখন আর আমার অনুশোচনার অন্ত রইলো না। আমি তাদের রাষ্টিকেট করে দেবার নির্দেশ দিলাম।

সেক্রেটারি বললেন, আপনি কি জানেন যে ওই তিনজন ছাত্রের অভিভাবকরা খুব সম্ভ্রান্ত বংশের লোক ?

—তা হতে পারে। কিন্তু আমি যেটাকে অপরাধ বলে মনে করি সেটা সম্ভ্রান্ত বংশের লোক করলেও সেটা অপরাধই থেকে যায়। তাতে অপরাধের কোনও রকম তারতম্য হয় না।

এবার রামরতনবাবু নিজের ফাইল থেকে একটা ফটোগ্রাফ বার করে দেবব্রতবাবুর সামনে এগিয়ে দিলেন। বললেন, দেখুন তো এটা কার ছবি ? দেবব্রতবাবু ফটোটা দেখেই বললেন, এ তো আমার স্ত্রীর আর আমার মেয়ের ছবি।

—আপনার এই স্ত্রী কি পাকিস্তানের মিনিস্টার সাহাবুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন ? আর আপনার এই মেয়ে ঝর্ণা কি সেই মুসলমানের ঔরসজাত ?

দেবব্রতবাবু কথাটা শুনে এতটুকু বিচলিত হলেন না। মাথা উঁচু করেই বললেন, হ্যাঁ, আপনারা ঠিকই বলেছেন !

রামরতনবাবু বললেন, তাহলে তো আপনার 'নববিধান চরিত্র গঠন হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলের' হেডমাস্টার হওয়ার যোগ্যতা নেই, কারণ আপনার ছাত্রদের চরিত্র গঠনের আগে তো আপনারই চরিত্র গঠন করার চেষ্টা করা উচিত ! আপনাকেই তো এই স্কুল থেকে আগে রাষ্টিকেট করা উচিত।

দেবব্রতবাবু বললেন, আপনারা তাহলে তাই-ই করুন। আমি

তাহলে কাল থেকে আর এ স্কুলে আসবো না। যদি কোনও দিন ভগবানের কান্না থামে তাহলে আসবো। তার আগে নয়।

-- না। আপনাকে আসতে হবে। আমাদের নতুন হেডমাস্টারের হাতে চার্জ হ্যাণ্ড ওভার করে দিতে হবে।

তারপরে কমিটির মিটিং সেদিনকার মতো শেষ হয়ে গেল। কিন্তু নতুন হেডমাস্টার কে হবেন ?

ঠিক হলো সেটা আবার পরের মিটিং-এ ঠিক হবে।

জিজ্ঞেস করলাম, তারপর ?

সুপ্রভাত বললে, তারপর সেদিন গোষ্ঠ আর মিনতি অনেক রাত পর্যন্ত দেবব্রত সরকারের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু দেবব্রতর দেখা নেই। তারপরের দিনও দেবব্রতর দেখা নেই। তারপরের দিনও না। স্কুল থেকে বেরিয়ে কোথায় যে চলে গেল আর কেউ তার খোঁজ পেলে না।

কেউ জানতে পারলো না দেবব্রত কোথায় গেলো। স্কুলের মধ্যে যিনি সিনিয়ার টিচার সেই সুশীলবাবু 'টিউটোরিয়াল হোম' করে বড়লোক হয়েছিলেন, তিনিই তখন থেকে 'নববিধান চরিত্র গঠন হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে'র হেডমাস্টার হলেন। কোথাও তার চেয়ে বেশি সৎ আর বেশি শিক্ষিত লোক আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

বহুকাল আগে একদিন মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন—আমি সেই ভারত গড়তে চাই যে. ভারতে দরিদ্রতম মানুষও মনে করবে যে এটাই তার দেশ, বুঝতে পারবে এ দেশে তারও একটা ভূমিকা আছে ! যে ভারতে অস্পৃশ্যতা বলে কোনও অভিশাপ কখনও থাকবে না আর, থাকবে না মাদকতার বিষ—অর্থাৎ যেখানে মদ নিষিদ্ধ হবে

জিজ্ঞেস করলাম, তারপর ?

সুপ্রভাত বললে, তারপর আর কী ? তখন থেকে এখনও এদেশে যারা অস্পৃশ্য তারা আরো অস্পৃশ্য হয়ে জীবন কাটাচ্ছে, আর যারা মদ খায় তাদের মদ খাওয়ার প্রবণতা এখন আরো বেড়ে চলেছে। তবে

এখন মদকে আর কেউ মদ বলে না। মদকে এখন একটা পোশাকী নাম দিয়ে তার ইজ্জৎ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মদ খাওয়াকে এখন নাম দেওয়া হয়েছে কক্‌টেল পার্টি।

আর সেই কাঁসারী পাড়া রোডের বাড়িটা ?

মিনতি দেবী এখন সে বাড়িটা আরো বড়ো করে দিয়েছে। সেটাতে ঝর্ণা সরকারের নাচের স্কুল হয়েছে একটা। তার নাম দেওয়া হয়েছে "নৃত্য-কলা-কেন্দ্র"। কলকাতার নামী-দামী সব বড়-বড় লোকের বাড়ির মেয়েরা ওই কেন্দ্রে নাচ শিখতে আসে। সেখানে মাসের মধ্যে একবার দু'বার মিনতি দেবী কক্‌টেল পার্টিও দেয়। সে কক্‌টেল পার্টিতে আসে মিনিস্টাররা, স্পীকার, এম-এল-এ, এম-পিরা। অর্থাৎ দেশের যারা মুখোজ্জ্বলকারী মানুষ তারা সবাই এসে নিজেদের ধন্য বলে মনে করে।

কিন্তু আল্‌তা-মাসি তখনও আল্‌তার ঝাঁপি আর সিঁদুর কৌটো নিয়ে আসে। এসে ডাকে, কই গো, বউমা কোথা গেলে ?

আর বউমা এলেই তার দু'পায়ে আল্‌তা পরাতে পরাতে বলে, তুমি দেখে নিও বউমা, তুমি সতী-লক্ষ্মী মেয়ে। আমি বলে যাচ্ছি—একদিন-না-একদিন দাদাবাবু তোমার কাছে ফিরে আসবেই আসবে। আমার আল্‌তা-সিঁদুর পরানো কখনও মিথ্যে হতে পারে না, আজ পর্যন্ত কখনও মিথ্যে হয়নি—একদিন দাদাবাবু ফিরে আসবেই।

আর সেই দেবব্রত সরকার ?

—তারপর থেকে কেউ আর তাকে দেখতে পায়নি। তার ধারণা তার দেশ স্বাধীন হয়নি। ইংরেজরা চলে গেছে বটে, কিন্তু তবু তার দেশ স্বাধীন হয়নি। ইন্দিরা গান্ধী গরিবি হঠাবেন বলে কত চেঁচিয়েছিলেন, কিন্তু তবু গরিবি হটেনি। জওহরলাল নেহরু কালোবাজারিদের ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেবেন বলে বড়ো গলায় কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত একজন কালোবাজারিকেও ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়নি। তাই দেবব্রত সরকারের ভগবান এখনও কাঁদছে—দেবব্রতর কাছে তার দেশ এখনও পরাধীন।

তবে বহুদিন আগে যখন বাড়িটা 'নৃত্য-কলা-কেন্দ্র' করবার জন্যে সারানো হচ্ছিল, তখন দেবব্রত সরকারের ব্যক্তিগত বইপত্র সবকিছু ফেলে দেওয়ার সময়ে একটা বাক্সর ভেতরে কী একটা ভাঁজ করা কাগজ পাওয়া গিয়েছিল। মিনতি পড়ে দেখেছিল তাতে লেখা রয়েছে —'আমি মায়ের কাছে বলি প্রদত্ত। আমি আমার জীবন দেশের জন্যে বলিদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রইলাম। দেশকে স্বাধীন করবার জন্য আমি সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকবো। বন্দেমাতরম্।'

বলে সুপ্রভাত আমার দিকে সে কাগজটা বার করে দেখালে। জিজ্ঞেস করলাম, এটা তোমাকে কে দিলে ?

সুপ্রভাত বললে. গোষ্ঠ। এই কাগজটা ওরা বাজে কাগজের সঙ্গে ফেলেই দিচ্ছিল। কিন্তু ওটা আমি নিজের কাছেই রেখে দিয়েছি। দেবব্রত সরকারকে আজ কেউই আর মনে রাখেনি। তার স্ত্রীও মনে রাখেনি. তার মেয়ে ঝর্ণাও মনে রাখেনি। কিন্তু সেই সাহাবুদ্দিনের ঔরসজাত মেয়ে ঝর্ণাকে 'পদ্মশ্রী' উপাধি দেওয়া উপলক্ষ্যে যে সম্বর্ধনা জানানো হলো, তার কারণ ঝর্ণা দেবীকে সম্বর্ধনা জানালে আমরা ও-বাড়ির কক্‌টেল পার্টিতে মদ খাওয়ার নেমন্তন্ন পাবো, ডিনার খাওয়ার নেমন্তন্ন পাবো। আর সেইসব পার্টিতে যেসব মন্ত্রী যেসব ভি, আই, পি, আসবে, তাদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পাবো। আর সেই সুযোগ পেয়ে আমরা বড়ো বড়ো কাজের জন্যে গভর্মেন্টের কাছ থেকে পারমিট পাবো, লাইসেন্স পাবো, কনট্র্যাক্ট পাবো। আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্রেসটিজ পাবো. ইজ্জৎ পাবো—কারণ তার চেয়ে বড়ো পাওয়া মানুষের জীবনে আর কী আছে, আর কী থাকতে পারে ?

জিজ্ঞেস করলাম, তা তুমি এত ভেতরের কথা জানলে কী করে ?

সুপ্রভাত বললে, জানলুম গোষ্ঠর কাছ থেকে। আমিই যে গোষ্ঠর সেই মামাতো ভাই।

— শেষ —